Terre des hommes
Proteggiamo i bambini insieme

Italian Development Cooperation
Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation

দৃঢ়তা

বৈষম্যের বিপরীতে আলোচনা করি দৃঢ়তার সাথে

জেন্ডার শিক্ষা ম্যানুয়াল

প্রাথমিক এবং মাধ্যমিকে অধ্যয়নরত কিশোরী-কিশোর শিক্ষার্থীদের জন্য

টেরে ডেস হোমস ইতালিয়া
মে ২০১৭

Terre des hommes
Proteggiamo i bambini insieme

Italian Development Cooperation
Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation

দৃঢ়তা

বৈষম্যের বিপরীতে আলোচনা করি দৃঢ়তার সাথে

জেন্ডার শিক্ষা ম্যানুয়াল
প্রাথমিক এবং মাধ্যমিকে অধ্যয়নরত কিশোরী-কিশোর শিক্ষার্থীদের জন্য

প্রকল্পের নাম
'ঢাকার ৫টি বস্তিতে বসবাসরত শিশু ও কিশোরী-কিশোরদের জীবনে সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেন্ডার বৈষম্যের বিপরীতে সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা'

টেরে ডেস হোমস ইতালিয়া
মে ২০১৭

পরিকল্পনা ও রচনা : তোসিবা কাশেম
জেন্ডার এডুকেশন এক্সপার্ট
টেরে ডেস হোমস ইতালিয়া
বাড়ি # ৩/বি, রোড # ৮৪
গুলশান ২, ঢাকা - ১২১২

সম্পাদনা : উজ্জয়িনী হালিম

অনুবাদ : অদিতি কবির

সার্বিক তত্ত্বাবধান : ইয়োলে ভ্যালেন্তিনা লুক্কেজে
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
টেরে ডেস হোমস ইতালিয়া
বাংলাদেশ ডেলিগেশন

প্রচ্ছদ ছবি কৃতিত্ব : সুকান্ত পাল
প্রকল্প সমন্বয়কারী
টেরে ডেস হোমস ইতালিয়া

ডিজাইন ও ইলাস্ট্রেশন : বাঙলা কমিউনিকেশনস্ লিঃ

মুদ্রণ : রূপা প্রিন্টিং প্রেস

প্রকাশনাকাল : মে ২০১৭

এই জেন্ডার শিক্ষা ম্যানুয়ালটি এ্যাজেন্সিয়া ইতালিয়ানা কোঅপারেসসিওনে আল্লো ইসভিলুপ্পো এবং টেরে ডেস হোমস ইতালিয়া এর অর্থায়নে প্রকাশিত হয়েছে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

এ্যাজেন্সিয়া ইতালিয়ানা পার লা কোঅপারেসিওনে আল্লো ইসভিলুপ্পো
রোড সালভাতোরে কনতারিনি, # ২৫,০০১৩৫, রোম, ইতালি
রোড এ্যান্টোনিও কোচ্চি, # ৪, ৫০১৩১, ফ্লোরেন্স, ইতালি
aics.info@esteri.it | + 39 06 32492 303/305
http://www.agenziacooperazione.gov.it/

টেরে ডেস হোমস ইতালিয়া
রোড এম. এম. বইয়ার্ডো, # ৬,২০১২৭,
মিলান, ইতালি
info@tdhitaly.org | + 39 02 28970418
https://terredeshommes.it/

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

কিশোরী-কিশোরদের জন্য জেন্ডার শিক্ষা ম্যানুয়ালটি 'ঢাকার ৫টি বস্তিতে বসবাসরত শিশু ও কিশোরী-কিশোরদের জীবনে সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেন্ডার বৈষম্যের বিপরীতে সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা'- এআইডি ০১০৫৯১/টিডিএইচ/বিজিডি, প্রকল্পটির অধীনে তৈরি করা হয়েছে। ইতালিয়ান ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেশন/পররাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সহায়তা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে এবং টেরে ডেস হোমস (টিডিএইচ) ইতালিয়া-র সহঅর্থায়নে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এই প্রকল্পটির বাস্তবায়ক টিডিএইচ ইতালিয়া, তার দীর্ঘদিনের সহযোগী সংস্থা অপরাজেয় বাংলাদেশ (এবি) এবং এসোসিয়েশন ফর দ্য রিয়েলাইজেশন ফর বেসিক নিডস্ - আরবান। এই ম্যানুয়ালটি ব্যবহার করবেন প্রকল্পের প্রশিক্ষক এবং কাউন্সিলররা যারা ঢাকার ৫টি বস্তি এলাকা যেমন- আজিমপুর, বাউনিয়া-বাঁধ, মোহাম্মদপুর, পল্লবী ও রায়ের বাজারের ৩০টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের (সহযোগী সংস্থার দ্বারা পরিচালিত এবং বাইরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) ৫ম এবং ৭ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য জেন্ডার শিক্ষা সেশন পরিচালনা করবেন।

ম্যানুয়ালটিকে জেন্ডার পরিচয়ের ক্ষেত্রে ক্রমাগত আলোচনা এবং কিশোরী-কিশোরদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনকে এগিয়ে নেবার একটি টুল হিসেবে চিন্তা করা হয়েছে। এখানে ক্ষমতায়ন বোঝাতে পাওলো ফ্রেইরের ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে যা 'সমালোচনামূলক চেতনা'র ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। প্রান্তিক সামাজিক দলগুলো প্রকৃতপক্ষে, বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে বুঝতে পারবে কীভাবে তাদের সামাজিক অবস্থা (দারিদ্র্য এবং জেন্ডার) নিজেদের জন্য অনগ্রসর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এবং কীভাবে একটি ব্যক্তিগত ও যৌথ বিশ্বাসের ক্ষেত্র সৃষ্টি ও একসাথে কাজ করার মাধ্যমে সমান অধিকারমূলক পরিস্থিতি তৈরি করা যায়।

প্রকৃতপক্ষে, যদিও এই ম্যানুয়ালটির জেন্ডার শিক্ষা সেশনগুলো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মাঠকর্মীরা পরিচালনা করবেন। সেশনগুলো আত্ম-প্রতিফলনের জন্য দলীয় কার্যক্রম দিয়ে এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যেখানে কিশোরী-কিশোররা চিন্তা করবে, নিজেদের কাজের সামর্থ্যের ওপর আত্মনির্ভরশীল হবে এবং পরিশেষে সামাজিক পরিচয়ের বিপরীতে সংলাপ বা আলোচনায় তাদের নিজেদের আগ্রহ এবং সম্ভাবনার অধিক প্রতিফলন ঘটানোর জন্য একসাথে কাজ করবে। এছাড়া, প্রকল্প কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে যেন সেশনগুলো পরিচালনা করবার সময় অংশগ্রহণকারীদের কথা থেকে তারা সেসব আচরণ বের করে নিয়ে আসতে পারে যা চিরাচরিত রীতি ও বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। এই তথ্য একটি নতুন আচরণগত রীতি গড়ার ক্ষেত্রে বিতর্কের সম্ভবনার কার্যকবী সূচনা করবে।

এই ম্যানুয়ালটি বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশের একই ধরনের ম্যানুয়ালগুলো পর্যালোচনা করে, এই প্রকল্পের অধীনে উপরোল্লিখিত বস্তিতে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্ বাংলাদেশ (আরআইবি)-এর হয়ে ৫০ জন গণগবেষক পরিচালিত পার্টিসিপেটরি অ্যাকশন রিসার্চ (পিএআর) থেকে প্রাপ্ততথ্য ও টিডিএইচ-এর অভিজ্ঞতার আলোকে প্রস্তুত করা হয়েছে। যেখানে যেখানে সম্ভব হয়েছে তথ্যসূত্র উল্লিখিত হয়েছে। যদি কোনো সূত্র অনুল্লিখিত থাকে তাহলে আমাদেরকে অবহিত করুন।

ধারণাগত কাঠামো থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের লেখক এবং পেশাজীবীরা কত বিস্তৃতভাবে জেন্ডার ও উন্নয়ন নিয়ে কাজ করেছেন। যদিও ম্যানুয়ালটি প্রকল্পের বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণে তৈরি করা হয়েছে, তবে অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থাগুলোও এটি ব্যবহার করতে পারবে, যদি তারা একে ব্যবহারযোগ্য মনে করে।

তোসিবা কাশেম প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করেছেন, সাজিয়েছেন এবং ম্যানুয়ালটি লিখেছেন। তাঁকে অপরিসীম ধন্যবাদ। কারণ তিনি প্রমাণ করেছেন যে প্রবল ইচ্ছা, নিষ্ঠা এবং আত্মবিশ্বাস থাকলে যে কোনো চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করা যায়। কমিউনিটিকে খোলা চোখ এবং মন দিয়ে দেখে ক্রমাগত প্রশ্ন করে উত্তর খুঁজে কাজটি করার জন্য ধন্যবাদ।

উজ্জয়িনী হালিমকে ধন্যবাদ এই ম্যানুয়ালটি সম্পাদনা এবং তার মূল্যবান মন্তব্য ও মতামত দেবার জন্য। আরও ধন্যবাদ জানাই অদিতি কবিরকে যথাযথ অনুবাদ করার জন্য এবং কাজটিকে পেশাগতকর্ম হিসেবে না দেখে সমাজকর্ম হিসেবে দেখার জন্য।

বাঙলা কমিউনিকেশন্‌সকে ধন্যবাদ এই যাত্রায় যুক্ত হয়ে তাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা আমাদেরকে দেবার জন্য।

যেসব কিশোরী-কিশোরদের সাথে আমরা কাজ করি তাদের অনেক ধন্যবাদ। কেননা প্রতিদিন তারা আমাদের দেখিয়ে দেয় যে আমরা তাদেরকে যা শেখাতে চাই তার তুলনায় অনেক বেশি তাদের কাছ থেকে শিখতে পারি।

পরিশেষে অশেষ ধন্যবাদ জানাই ইতালিয়ান ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেশন/পররাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সহায়তা বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে তাঁদের সহৃদয় অবদানের জন্য এবং আমাদের প্রতি আস্থাশীল হবার জন্য।

ইয়োলে ভ্যালেন্তিনা লুক্কেজে
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
টেরে ডেস হোমস ইতালিয়া
বাংলাদেশ ডেলিগেশন

সূচিপত্র

ভূমিকা

১. জেন্ডার কী? সেক্স ও জেন্ডারের মধ্যে পার্থক্য ০১
২. জেন্ডার ধারণাটির গুরুত্ব ০১
২.১ সামাজিকীকরণের নিয়ম হিসেবে জেন্ডার ০১
২.২ পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং ক্ষমতার সম্পর্ক ০২
২.৩ জেন্ডার ও পরিবার ০২
২.৪ উন্নয়নের উপাদান হিসেবে জেন্ডার ০৩
৩. বাংলাদেশে জেন্ডার পরিস্থিতি ০৩
৩.১ বাল্যবিবাহের ব্যাপকতা ০৪
৩.২ নারীর প্রতি সহিংসতা ০৪
৩.৩ কাজ এবং জেন্ডার ০৫
৩.৪ স্বাস্থ্য ও জেন্ডার ০৫
৪. বাংলাদেশের সামাজিকীকরণের পটভূমিতে কিশোরী-কিশোর ০৫
৫. ম্যানুয়ালটির উদ্দেশ্য ০৬
৬. সারসংক্ষেপ ০৭
৭. সহায়কের জন্য নির্দেশনা ০৯

মডিউল ১ নিজের অধিকার সম্পর্কে জানা ১২
অধিবেশন ১.১ নিজেদেরকে জানা ১৩
অধিবেশন ১.২ বেড়ে উঠি ভিন্নভাবে : আমাদের মধ্যে ভিন্নতা ১৬
অধিবেশন ১.৩ বেড়ে উঠি ভিন্নভাবে : আমরা যেভাবে আচরণ করি ১৯
অধিবেশন ১.৪ বেড়ে উঠি ভিন্নভাবে : আমরা কী ভূমিকা পালন করি ২৪
অধিবেশন ১.৫.১ বেড়ে উঠি ভিন্নভাবে : সামাজিকীকরণের মধ্য দিয়ে ২৯
অধিবেশন ১.৫.২ সামাজিকীকরণের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠি ভিন্নভাবে : সামাজিকীকরণের বিভিন্ন প্রতিনিধি ৩৬
অধিবেশন ১.৬ জেন্ডার বৈষম্য, সমতা এবং সাম্য ৩৯
অধিবেশন ১.৭ বড় হবার জন্য শিক্ষা, সবার জন্য একটি অধিকার ৪২
অধিবেশন ১.৮ স্বপ্নের দ্বারপ্রান্তে ৪৬

মডিউল ২ এখন কার পালা : কেন পুনরায় আলোচনা? ৪৯
অধিবেশন ২.১ কে কোন্ কাজ করবে : গৃহকর্মে শ্রমবিভাজন ৫১
অধিবেশন ২.২ জেন্ডার এবং কাজ : প্রচলিত ভিত্তিহীন জনশ্রুতি না কি সত্যি? ৫৭
অধিবেশন ২.৩ জেন্ডার অসমতা এবং কর্মস্থলে জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য ৬১
অধিবেশন ২.৪ অদৃশ্য দেয়াল ভেঙে ফেলা ৬৩

মডিউল ৩ আমার শরীর আমার অধিকার : যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার ৬৭
অধিবেশন ৩.১ নিজেকে জানো : তোমার শরীর এবং মন ৬৯
অধিবেশন ৩.২.১ নিজের শরীরকে জানো : সন্তান জন্মদান ৭২
অধিবেশন ৩.২.২ নিজের শরীরকে জানো : প্রজননের ক্ষমতা ৭৩
অধিবেশন ৩.৩ যৌন অধিকার সম্পর্কে জানা ৮১
অধিবেশন ৩.৪ সুস্থ ও নিরাপদে থাকা ৮৫

মডিউল ৪ সহিংসতা থেকে সম্মানের পথে যাত্রা : ক্ষমতার সম্পর্ক এবং নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতাকে চ্যালেঞ্জ করা ৯১
অধিবেশন ৪.১ ক্ষমতা ও সহিংসতা : যোগসূত্রটি কী? ৯৩
অধিবেশন ৪.২.১ নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা (ভিএডব্লিউ ও জি) ৯৯
অধিবেশন ৪.২.২ নারীর প্রতি সহিংসতা : নারী ও মেয়েদের প্রতি যৌন সহিংসতা ১০৭
অধিবেশন ৪.২.৩ নারীর প্রতি সহিংসতা : নারী ও মেয়েদের প্রতি পারিবারিক সহিংসতা ১১৫
অধিবেশন ৪.৩ আর নয় শিশুকনে - রীতিকে চ্যালেঞ্জ করার এইতো সময় ১১৯
অধিবেশন ৪.৪ নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতার চক্র ১২৫
অধিবেশন ৪.৫ জীবনের যাত্রায় একে-অপরকে সহায়তা করা (উপসংহার) ১২৬

তথ্যনির্দেশ ১২৮

ভূমিকা

১. জেন্ডার কী? সেক্স ও জেন্ডারের মধ্যে পার্থক্য

বাংলা অভিধান অনুযায়ী জেন্ডার ও সেক্সের শাব্দিক অর্থ একই। আর তা হলো - 'লিঙ্গ', যার দ্বারা- 'স্ত্রী বা পুরুষ অবস্থা' বোঝায়। ধারণাগত দিক থেকে জেন্ডার ও সেক্স-এর মধ্যে তফাৎ হচ্ছে, সেক্স-এর সাথে জৈবিক সম্পর্ক রয়েছে আর জেন্ডার হচ্ছে নারী ও পুরুষের সেই পরিচয় যা সমাজ কর্তৃক সামাজিক ও মানসিকভাবে (এবং সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিকভাবে) নির্ধারিত। যখন কোনো মানবশিশু জন্ম নেয়, তখন তার জননেন্দ্রিয়ের ওপর নির্ভর করে পরিচয় পায় সে মেয়ে না ছেলে; একই সময়ে তার জৈবিক পরিচয়ের ভিত্তিতে সামাজিকীকরণ হয় ভিন্নভাবে। যেমন- যদি সে ছেলে হয়, তবে তাকে দেয়া হবে নীল রঙের পোশাক, খেলনা হিসেবে পাবে গাড়ি এবং তাকে উৎসাহিত করা হবে সাহসী ও কঠিন হতে, কেননা বড়রা বলেন, ছেলেরা কাঁদে না। অন্যদিকে যদি শিশুটি মেয়ে হয়, তাহলে তাকে গোলাপি পোশাক পরানো হবে এবং তাকে শেখানো হবে চুপচাপ ও নম্র থাকতে, শেখানো হবে তার ভাবনার মূল জায়গাটি যেন সুন্দর হওয়া আর বাধ্য থাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। প্রত্যেককেই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার জীবনচক্রে সমাজের চাপিয়ে দেয়া এসব পরিচয় মেনে নিতে হয়। এটাই হচ্ছে জেন্ডার- যা নারী বা পুরুষ হবার কারণে এর সাথে জড়িত সামাজিক, আচরণগত এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, প্রত্যাশা এবং রীতিকে বোঝায় (ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ২০১২)। সেক্স হচ্ছে সংস্কৃতি, জাতি এবং শ্রেণি নির্বিশেষে অভিন্ন এবং সময়ের সাথে সাথে এর পরিবর্তন হয় না। অন্যদিকে জেন্ডার খুবই অনমনীয়, যদিও এর প্রকৃতি সমাজ, বর্ণ ও শ্রেণিভেদে নানান রকম হয়।

সেক্স শব্দটি দ্বারা নারী-পুরুষের জৈবিক পার্থক্যকে বোঝায়। জেন্ডার হলো নারী-পুরুষের সামাজিক পরিচয়

সেক্স শব্দটি ব্যবহৃত হয় নারী ও পুরুষের মধ্যকার প্রাকৃতিক বা জৈবিক পার্থক্য বোঝাতে। অন্যদিকে জেন্ডার 'সামাজিকভাবে সৃষ্ট' যা ব্যবহৃত হয় নারীকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে দমন করার কৌশল হিসেবে।

জেন্ডার শুধু নারী ও পুরুষকে বোঝায় না, তাদের বৈশিষ্ট্য, ভূমিকা এবং দায়িত্বকেও বোঝায়। এটি নির্দিষ্ট করে দেয় নারী ও পুরুষের মধ্যকার সম্পর্কের প্রকৃতিকেও এবং সমর্থন দেয় নারীর চাইতে পুরুষের উচ্চতর অবস্থানকে। মানুষ নারী বা পুরুষরূপে জন্মগ্রহণ করে: পুরুষ গর্ভধারণ করায় এবং নারী সন্তানধারণ, জন্মদান এবং শিশুকে স্তন্যপান করায়। এই জৈবিক পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করেই সমাজ নারী ও পুরুষকে ভিন্নভাবে দেখা এবং তাদের জন্য ভিন্নতর আচরণ ও কর্মকাণ্ড তৈরি করে। এগুলোই হলো জেন্ডার ভূমিকা ও পরিচয় এবং ক্ষমতার বণ্টন, সামাজিক অবস্থা, অধিকার, সমাজ ও পরিবারের সম্পদের প্রবেশাধিকার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদির গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক।

২. জেন্ডার ধারণাটির গুরুত্ব

২.১ সামাজিকীকরণের নিয়ম হিসেবে জেন্ডার

প্রতিটি মানুষই তার জীবনচক্রে একটি শিক্ষণ প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যায়। যে প্রক্রিয়ায় মানুষ দৈনিক জীবনযাত্রার নির্দেশনা দেয় এমনসব সামাজিক নিয়ম এবং মূল্যবোধ শেখে, এবং আত্মস্থ করে, তাকে বলে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া। সামাজিকীকরণ মানুষের চিন্তা-ভাবনা, অনুভূতি, কর্মকাণ্ডকে সংজ্ঞায়িত করতে এবং আকৃতি দিতে সহায়তা করে এবং আদর্শ আচার-ব্যবহারের একটা আদল তৈরি করে দেয়। শিশুদের যখন সামাজিকীকরণ হয় তখন তারা শেখে, মানব সমাজের উৎপাদনশীল সদস্য হিসেবে কীভাবে মানিয়ে নিতে এবং কাজ করতে হয়। পরিবার, স্কুল, মিডিয়া এবং সমাজ সামগ্রিকভাবে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এই সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় একটি ছেলে পুরুষ হয়ে ওঠে এবং একটি মেয়ে হয়ে ওঠে নারী, ছোট করে বলতে গেলে, নারী ও পুরুষ বুঝতে পারে 'পৃথিবীতে তাদের স্থান'।

২.২ পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং ক্ষমতার সম্পর্ক

সামাজিক নিয়ম, ভূমিকা এবং প্রত্যাশা সামজিক ব্যবস্থার অন্তর্গত, আর ট্যালকট পারসনস-এর মতে সামাজিক ব্যবস্থা হলো আন্তঃনির্ভরশীল কর্মের প্রক্রিয়া (পারসনস ২০০৫:১৩৮)। এই আন্তঃনির্ভরশীল কর্মকাণ্ড বলতে ব্যক্তি, দল এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্কের ধারা আছে সেটিকে বোঝায়। প্রতিটি সমাজই কোনো না কোনো ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে চলে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে, পুরুষ সমাজের সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা দখল করে থাকে এবং সমাজের নিয়ম, মূল্যবোধ এবং বিশ্বাসের আকার দেয় ও এগুলোকে সংজ্ঞায়িত করে। পিতৃতান্ত্রিকতা শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তা হলো, "পুরুষের আধিপত্য, ক্ষমতার সম্পর্ক যার দ্বারা পুরুষ নারীর ওপর আধিপত্য করে থাকে এবং যে ব্যবস্থায় নারীদের নানান উপায়ে অধস্তন করে রাখা হয়" (সুলতানা ২০১০)। যখন কোনো ব্যক্তি বা দল ক্ষমতার ব্যবহার করে, এর মানে হলো যে তারা সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেই নিজেদের ইচ্ছেমতো যা খুশি করতে পারার মতো অবস্থানে আছে বা ক্ষমতা রাখে। পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজ নারীদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট আচার আচরণ আশা করে এবং এমনসব ভূমিকা ও দায়িত্ব চাপিয়ে দেয় যা নারীকে সমাজে অধস্তন অবস্থানে নিয়ে যায়। পুরুষ সব সময় নারীদের ওপর ক্ষমতার চর্চা করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই ক্ষমতার সম্পর্কে নারীরা বিবেচিত হয় কম ক্ষমতাসম্পন্ন হিসেবে এবং পুরুষদের তুলনায় তাদের সমান অধিকার ও সমান মর্যাদা থাকে না এবং তাদের কাজের ক্ষেত্রও থাকে আলাদা (পুরুষেরা বাইরে এবং নারীরা ঘরে)। এই অসম ক্ষমতার সম্পর্ক নারী ও পুরুষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে এবং পুরুষের আধিপত্য নারীর ওপর বজায় রাখে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে (পরিবার, সমাজ, অর্থনীতি এবং রাজনীতিতে) নারীকে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল করে রাখে, সেই সাথে সকল ধরনের বৈষম্যও নারীর প্রতি সহিংসতার অনুমোদন দেয়।

এই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা ঐতিহাসিকভাবে চলে আসছে এবং শিক্ষা, তথ্য, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক সম্পদ ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে নারীর প্রবেশাধিকারকে সীমাবদ্ধ রেখে জেন্ডারের মধ্যে অসম সম্পর্ককে বজায় রেখেছে।

সমাজের গড়ে তোলা প্রত্যাশাকে পূরণ করতে নারীরাই অনেক সময় জেন্ডার নিয়ম ও গৎবাঁধা ধারণাকে প্রশ্ন করেন না, কেননা ২৩০০ বছর আগে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টোটল মন্তব্য করেছিলেন, মানুষ সামাজিক জীব। যে সমাজ ছাড়া থাকে সে হয় পশু নয় ভগবান (ইওর আর্টিকেল লাইব্রেরি এন. ডি.)।

সামগ্রিকভাবে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলটির বৈশিষ্ট্য পিতৃতান্ত্রিক, যদিও এর ধরন সমাজ, বর্ণ এবং শ্রেণিভেদে আলাদা। বাংলাদেশের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি উদাহরণ যেখানে পুরুষকে পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী হিসেবে এবং নারীকে 'গৃহিণী' ও সেবাদানকারী হিসেবে দেখা হয়।

২.৩ জেন্ডার ও পরিবার

পরিবারে (প্রতিষ্ঠান হিসেবে) পুরুষরা পরিবার, জমি এবং অন্যান্য সম্পত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে, পরিবারের জন্য আয় করে, সিদ্ধান্ত নেয় এবং পরিবারের প্রধানের ভূমিকা পালন করে। যেখানে নারীরা সন্তানধারণ ও লালন করে, তবে তাদের স্বামীর সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করতে হয় কখন কটি সন্তান হবে, এমনকি সন্তানদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বিষয়টিও নির্ধারিত হয় পুরুষের ঠিক করা নিয়মে। যেহেতু তাদের কোনো আয় এবং সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই, নারীর ক্ষমতাও সামান্য আর তাই পুরুষ মনে করে যে, নারীর ওপর ক্ষমতা ব্যবহার করার অধিকার তার আছে। তবে, আয় করা বা অর্থের ক্ষেত্রে নারীর প্রবেশাধিকার জেন্ডার সমতা বা সাম্যের নিশ্চয়তা দেয় না। অনেক কর্মজীবী নারীই পিতৃতান্ত্রিকতার শিকার, যা আসলে একটি মানসিকতা এবং ক্ষমতা কার কাছে থাকবে তা ঠিক করার হাতিয়ার।

পরিবার পুত্র সন্তান চায় সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য, কারণ মেয়েরা ভবিষ্যতে বিয়ে হয়ে গেলে অন্য পরিবারের সদস্য হয়ে যাবে (যেখানে তার মতামত ও অধিকার কম থাকবে)। তাই মেয়েরা শিক্ষা ও পুষ্টির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার কম পায়, যেহেতু পরিবারের জন্য তারা উপার্জন করবে বা তাদের আয় মা-বাবার পরিবারের কোনো কাজে আসবে বলে ভাবা হয় না। নারী ও পুরুষের ক্ষমতার এই অসম সম্পর্ক অন্যান্য গণপ্রতিষ্ঠানে যেমন- শিক্ষা, ধর্ম, অর্থনীতি ও রাজনীতিতেও ছায়া ফেলেছে; ফলে নারীর অবস্থা ও অবস্থান শুধু যে পরিবারে তাই নয়, সমাজেও নাজুক করে তুলেছে।

সাধারণত, নারীরা খায় সবার শেষে; স্বাস্থ্যসেবায় তাদের প্রবেশাধিকার কম এবং নিত্যদিন তারা দীর্ঘসময় ধরে, বিনা পারিশ্রমিকে গৃহস্থালি কাজ করে থাকে যা কাজ হিসেবে এখনও স্বীকৃত নয়। তাদের আয়মূলক কাজ বা ব্যবসা করার সুযোগও কম। যথেষ্ট শিক্ষার সুযোগ থেকেও তারা দূরে থাকে। জীবন বাঁচানোর তাগিদে অনেকে বাধ্য হয় যৌন নিগ্রহমূলক কাজে

জড়িয়ে পড়তে [দ্য ইউনাইটেড নেশনস এনটিটি ফর জেন্ডার ইকুয়ালিটি এন্ড দ্য এমপাওয়ারমেন্ট অফ উওমেন (ইউএন উওমেন) এন. ডি.]।

২.৪ উন্নয়নের উপাদান হিসেবে জেন্ডার

পৃথিবীর জনসংখ্যা ৭.৪ বিলিয়ন এর (পপুলেশন রেফারেন্স ব্যুরো ২০১৬) প্রায় ৫০% নারী। উন্নয়ন সমানুপাতিক হারে হবে না যদি নারীরা সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে লাভবান না হন।

১৯৭০ দশকের শুরুতে বিভিন্ন উন্নয়নতত্ত্বে, বিভিন্ন অ্যাপ্রোচ সমাজে নারীদের অবস্থা নিয়ে বিতর্ক করেছে। বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত বিভিন্ন ঘটনাবলি যেমন- নারীদের ভোটাধিকার ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, যৌন সহিংসতা থেকে রক্ষা পাবার অধিকার, বৈষম্য এবং সমমজুরী প্রাপ্তির প্রেক্ষাপটে নারীবাদী আন্দোলনের ফলে এসব তত্ত্বের উদ্ভব হয়।

১৯৭০ দশকে উন্নয়নে নারী (দ্য উওমেন ইন ডেভেলপমেন্ট- উইড) অ্যাপ্রোচটি নারীদের জীবনমানের উন্নয়নের জন্য তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এবং শ্রমশক্তিতে একীভূত হওয়ার বিষয়টিকে নিশ্চিত করতে সাহায্য করেছিল। তবে, এটি শুধু বাইরের কাজে অর্থাৎ উৎপাদনশীল কাজে নারীর অংশগ্রহণের প্রতি জোর দিয়েছিল। নারী এবং উন্নয়ন (দ্য উওমেন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট - ওয়াড) অ্যাপ্রোচটির আবির্ভাব হয় ১৯৭৫ সালে যার আলোচ্য বিষয় ছিল- নারী সবসময়ই বাইরের ও ব্যক্তিগত দু'টি ক্ষেত্রেই অংশগ্রহণ করেছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রেখেছে। এই অ্যাপ্রোচটি আরও জোর দেয় সমাজকে স্থির রাখতে এবং এর উন্নয়নে নারীরা স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করেছে সেটির ওপর যদিও উন্নয়ন প্রচেষ্টায় নারীকে অন্তর্ভুক্ত করায় সমাজে অসমতার পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোটিকেই মজবুত করতে সাহায্য করা হয়েছে [উইকিপিডিয়া এন. ডি.]।

আগের অ্যাপ্রোচগুলো নারীর জনজীবনের ওপর জোর দিয়েছিল ব্যক্তিগত পরিসরের চ্যালেঞ্জগুলোকে, নারী প্রতিদিন যেগুলোর মুখোমুখি হয় এবং সমাজে বিদ্যমান অসম ক্ষমতার সম্পর্ককে বিবেচনায় না রেখেই। তাই জেন্ডার ধারণাটি ১৯৭০ এবং ১৯৮০-র দশকে আসতে থাকে ধীরে ধীরে। ১৯৭০ দশকের শেষদিকে উদ্ভূত জেন্ডার এবং উন্নয়ন (দ্য জেন্ডার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট- গ্যাড) অ্যাপ্রোচটি জোর দেয় জেন্ডারের মধ্যে বিদ্যমান অসমতার ওপর যা সকল বৈষম্যের ভিত্তি। গ্যাড ঘোষণা করে যে, উন্নয়নের সুফল সমানভাবে পাওয়া সম্ভব নয় যদি সমাজে সমস্ত অসমতা ও অসম ক্ষমতার কাঠামো বজায় থাকে।

এখানে তত্ত্বগুলো থেকে পরিষ্কার চিত্র পেতে একটি বাস্তবসম্মত উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যদি একটি উন্নয়ন প্রকল্পকে ধরা হয় যেটির লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের কোনো একটি গ্রামে শুধু মেয়েদের একটি স্কুল খোলা। যেন মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পায়, যার ফলে ভবিষ্যতে চাকরির বাজারে তাদের প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় তারা অংশ নিতে পারবে। যদিও প্রকল্পের লক্ষ্যটি খুবই যুক্তিপূর্ণ, কিন্তু শুধু স্কুল স্থাপন করেই মেয়েদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে স্কুলের দূরত্ব এবং সেটির সাথে জড়িত যে নিরাপত্তাহীনতা রয়েছে (যৌন হয়রানির শিকার হওয়া), মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর ক্ষেত্রে মা-বাবা বা অভিভাবকের বিশেষ করে পরিবারের পুরুষের অনুমতি থাকা (সিদ্ধান্ত গ্রহণে পুরুষ আধিপত্য/ক্ষমতার অনুশীলন)। ঘরের কাজ করার পর মেয়েদের হাতে খুব কম সময় থাকা (সমাজের চাপিয়ে দেয়া দায়িত্ব ও ভূমিকা), এসবের ওপর মেয়েদের স্কুলে অংশগ্রহণের বিষয়টি নির্ভর করে। সমাজে প্রচলিত নিয়ম-কানুনও মেয়েদের আকাঙ্ক্ষাকে অবচেতনভাবে ঠিক করে দেয় যা অনেক সময় পিতৃতান্ত্রিকতার সাথে যায়। যেমন- কোনো কোনো মেয়ে লেখাপড়ায় আগ্রহী না-ও হতে পারে, কারণ নিজেকে সে ভবিষ্যতে গৃহবধূ ও মাতৃরূপে চিন্তা করে, তাই সে স্কুলে যাওয়ার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে না।

এসব অসম ক্ষমতার সম্পর্ককে দূর করতে এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ফাঁকফোকর পূরণ করতে জেন্ডারের ধারণা গ্রহণ করে এসব অসমতাকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে এবং যে সকল জেন্ডার নিয়ম বা রীতি অসমতাকে টিকিয়ে রাখে সেগুলো নিয়ে ভাবতে হবে ও আলোচনা করতে হবে।

৩. বাংলাদেশে জেন্ডার পরিস্থিতি

নারী ও পুরুষের অনুপাত প্রায় সমান হওয়া সত্ত্বেও [সমগ্র জনসংখ্যায় নারী ৪৯.৪% (কান্ট্রিমিটারস ২০১৭)], জেন্ডার অসমতা বাংলাদেশে প্রবল। সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহ্যগত নানান বিষয় বাংলাদেশে নারীদের কীভাবে দেখা হবে তা বহুলাংশে প্রভাবিত করে। শুধু দারিদ্র্য জেন্ডার অসমতার পেছনে কাজ করে না। প্রকৃতপক্ষে, এই পরিস্থিতি দেশের বা ব্যক্তির অর্থনৈতিক সম্পদপ্রাপ্তি এবং বণ্টনের আলোচনা অথবা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আর মানব উন্নয়নের ধাপ দিয়ে ব্যাখ্যা করা

যাবে না। সাংস্কৃতিক-সামাজিক প্রভাব ও চর্চা, সেইসাথে ধর্মীয় বক্তব্যের অপব্যাখ্যা জেন্ডার অসমতা ও বৈষম্য তৈরি এবং টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। জেন্ডার অসমতা শুধু যে অল্পবয়সী মেয়ে ও নারীর ওপর প্রভাব ফেলে তাই নয়, ছেলে ও পুরুষের ওপরেও ফেলে। একটি অসম সমাজে পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমাজের সর্বস্তরেই ছড়িয়ে পড়ে সমাজে দারিদ্র্য ডেকে আনে এবং নারী-পুরুষ সবাইকে সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে।

২০০৯ সালের মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে অনুযায়ী, বাংলাদেশে ১ বছরের নিচে জনসংখ্যার পুরুষের অনুপাত হচ্ছে প্রতি ১০০ নারীর বিপরীতে ১০৭.৫ এবং ৫ বছরের নিচে ১০৬ (প্রত্যাশিত 'সাধারণ অবস্থা' হলো প্রতি ১০৫ পুরুষের বিপরীতে ১০০ জন নারী জন্মাবে)। এই অনুপাত দেখে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশে পুরুষের অনুপাত প্রত্যাশিত জনসংখ্যার অনুপাতের চেয়ে কিছুটা বেশি। নারী-পুরুষের এই অনুপাত পুরুষাধিপত্যমূলক সমাজে মেয়ের চেয়ে ছেলের প্রাধান্য যে সাংস্কৃতিকভাবে বেশি সেই অসমতাকে আরও প্রতীয়মান করে তোলে [ইউনাইটেড নেশনস চিলড্রেনস ফান্ড (ইউনিসেফ) ২০১১]।

মেয়েরা যখন বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছায়, কিশোরী হয়, জৈবিকভাবে প্রাপ্ত বিশেষ সুবিধা (সন্তান জন্মদান) থাকা সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক ও সামাজিক রীতিগুলোর কারণে পিছিয়ে পড়ে, যা জেন্ডার পার্থক্য তৈরি করে এবং অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে তাদের সীমাবদ্ধতা চলে আসে। যদিও বাংলাদেশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা আনয়নে বিশাল উন্নয়ন ঘটিয়েছে, কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালে, কৈশোর থেকে প্রাপ্তবয়স্কে (বয়স ১০-১৯) উপনীত হবার সময়ে, মেয়েদের স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার বেশি। এই ঝরে পড়ার হারের সাথে মেয়েদের একা চলাফেরায় বিধিনিষেধ, যৌন হয়রানি (যেমন- উত্ত্যক্ত করা), শারীরিক ও মানসিক সহিংসতা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের কম গুরুত্ব দেয়া এ ধরনের সামাজিক রীতিগুলো গভীরভাবে সম্পর্কিত। মা-বাবারা ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের শিক্ষায় কম বিনিয়োগ করে। কেননা ছেলেদের দেখা হয় পরিবারের ভবিষ্যতে উপার্জনকারী হিসেবে। অন্যদিকে মেয়েরা বিয়ের পরে অন্য ঘরে চলে যাবে। তাই মেয়েদের ওপর বিনিয়োগ করলে যেহেতু কিছু পাওয়া যাবে না, তাই মা-বাবারা শিক্ষার চেয়ে যৌতুকের জন্য সঞ্চয় করার প্রতি গুরুত্ব দেয়। পরিবার ও বৃহত্তর সমাজের এমন মনোভাবের কারণে মেয়েদের লেখাপড়া চালিয়ে যাবার সুযোগ হয় না।

৩.১ বাল্যবিবাহের ব্যাপকতা

স্কুল থেকে ঝরে পড়ার সাথে বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত। আইন থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে ব্যাপকহারে বাল্যবিবাহের ঘটনা ঘটে। প্রকৃতপক্ষে, সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ এবং কিশোরী মাতৃত্বের হার সবচেয়ে বেশি। ৫২% মেয়েদের ১৮ বছর পার হবার আগেই বিয়ে হয় (ইউনিসেফ ২০১৬)। তারা শিশু থাকতেই মা হয়। বাল্যবিবাহ, নারীর অপুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা নেবার সুবিধা, ব্যবহারে অজ্ঞানতা ও তথ্যের অভাব মাতৃস্বাস্থ্য খারাপের জন্য দায়ী। বেশিরভাগ নারী দক্ষ সহায়তা ছাড়াই সন্তান জন্ম দেয়। বয়ঃসন্ধিকালে সন্তান জন্মদানের সাথে মাতৃমৃত্যুর সম্পর্ক রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিওএইচও)-এর মতে, ২০১৫ সালে বাংলাদেশে অন্তত ১৭৬ জন নারী (প্রতি ১ লাখ জীবিত জন্মে) সন্তান জন্মদানকালে মারা যায় (ডব্লিওএইচও ও অন্যান্য এন. ডি.)।

মেয়েদের বাল্যবিবাহ দেবার পক্ষে অন্যতম যুক্তি হলো তাদেরকে যৌন হয়রানিকারীদের থেকে রক্ষা করা। এই ক্ষতিকর প্রথা সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হলেও শিশু অধিকার ভঙ্গ করছে। এটা এক ধরনের যৌন সহিংসতা, যেহেতু ছোট মেয়েদের জোর করে বিয়ে এবং যৌন সম্পর্কে বাধ্য করা হয় যার ফলে তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকির মুখে পড়ে এবং লেখাপড়া করে সুন্দর ভবিষ্যৎ পাবার সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়।

বিয়ে হয়ে গেলে, বিশেষ করে কিশোরীরা স্বামীর পরিবারের একটা সম্পত্তি হয়ে যায়, তাদের সাধারণত সম্পত্তিতে কোনো উত্তরাধিকার থাকে না, স্কুলে যাবার কোনো সুযোগ ঘটে না; ফলে তারা নির্ভরশীল এবং ক্ষমতাহীন থেকে যায়।

৩.২ নারীর প্রতি সহিংসতা

পারিবারিক ও সামাজিক পরিসরে ঘটে থাকা সকল ধরনের শারীরিক, যৌন এবং মানসিক সহিংসতা নারীর প্রতি সহিংসতার অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে পড়ে- মারধর, যৌন নির্যাতন, যৌতুক সংক্রান্ত সহিংসতা, নারীকে বৈবাহিক বা বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরে ধর্ষণ, শোষণ, যৌন হয়রানি ও ভয় দেখানো, পাচার করা, জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা এবং রাষ্ট্রের দ্বারা সহিংসতা চালিয়ে যাওয়া।

উল্লেখ্য যে, নারীর প্রতি সহিংসতার কারণগুলোর মধ্যে শিক্ষার অভাব এবং নিম্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থানের জন্য ক্ষমতাহীনতা একটি বড় ভূমিকা পালন করে। তবে সমস্ত বয়স এবং ক্ষেত্রে

নারীর ওপর সহিংসতা অগ্রহণযোগ্য মাত্রার। প্রায় ৮০% বিবাহিতা নারী বলেছেন যে তারা তাদের স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির কারো দ্বারা সহিংসতার শিকার হয়েছেন (দৈনিক প্রথম আলো ২০১৬)।

নারীর প্রতি শারীরিক সহিংসতাগুলো হলো- হত্যা, গুরুতর আঘাত, অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ, যৌন সংক্রমণ, এইচআইভি/এইডস এবং রোগজনিত নাজুক অবস্থা। স্বীকৃতি না থাকলেও সহিংসতার কারণে বিপুলসংখ্যক মাতৃমৃত্যুও ঘটে থাকে, বিশেষ করে অল্পবয়স্ক, অবিবাহিতা, গর্ভবতী মেয়েদের ক্ষেত্রে। জেন্ডারভিত্তিক বা নারীর প্রতি সহিংসতার মানসিক ফল হলো- আত্মহত্যা ও মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা। সহিংসতা এড়াতে কিশোরীরা এমন আচরণ শিখে নেয়, যা তাদের মা-বাবা, স্বামী এবং সঙ্গীর কাছে গ্রহণযোগ্য। নারী উন্নয়নে সহিংসতা একটি বড় বাধা।

৩.৩ কাজ এবং জেন্ডার

বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৩ অনুযায়ী, মাত্র ৩৩.৫% নারী শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ করেছে, যেখানে তাদের তুলনায় পুরুষের হার ৮১.৭% এবং পুরুষের তুলনায় তাদের মজুরিও কম [বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিসটিকস (বিবিএস) ও মিনিস্ট্রি অফ প্ল্যানিং ২০১৫]। পুরুষের মাসিক গড় বেতন ১১,৭৩৩ এবং নারীর ১০,৮১৭ টাকা (দৈনিক প্রথম আলো ২০১৬)। বাংলাদেশের নারীরা পুরুষের চেয়ে গৃহস্থালি কাজ ৩ গুণ বেশি করলেও কোনো আর্থিক লাভ পায় না। একটি জরিপ মোতাবেক- যদি একে আর্থিক মানে রূপান্তর করা হয়, তবে নারীর গৃহকর্মের আর্থিক মূল্যমান দাঁড়ায় ১০ থেকে ১১ কোটি টাকা (দৈনিক প্রথম আলো ২০১৫)। নারীর গৃহস্থালি কাজকে যেহেতু কাজ বলে মনে করা হয় না, তাই কাজগুলো অবৈতনিক এবং অমূল্যায়িত থেকে যায়।

৩.৪ স্বাস্থ্য ও জেন্ডার

বৈষম্যমূলক সামাজিক রীতি, দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসুবিধায় সীমিত সুযোগের সাথে বাল্যবিবাহ, প্রাক-বিয়ে কাউন্সেলিংয়ের অভাব, দ্রুত সন্তানধারণের জন্য চাপ এবং পুষ্টির দুরবস্থা নারীর সামগ্রিক স্বাস্থ্য খারাপ হবার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর- ২ স্থানেই বিপুলসংখ্যক কিশোরী অপুষ্টিতে ভোগে। বাংলাদেশের কিশোরীদের মধ্যে অপুষ্টি আশঙ্কাজনকভাবে বেশি। কিশোরীদের মধ্যে বয়ঃসন্ধিকালীন খর্বাকৃতির হার ৩৬% এবং রক্তশূন্যতার হার ২৫-২৭% (আখতার এবং সন্ধ্যা ২০১৩)। খাদ্য ঘাটতিসহ নানা কারণে তাদের প্রজনন স্বাস্থ্যঝুঁকির মুখে পড়ে এবং এই পরিস্থিতির কারণে অপুষ্ট কিশোরীদের থেকে জন্ম নেয়া শিশুদের স্বাস্থ্যের ওপরও এর প্রভাব পড়ে। প্রকৃতপক্ষে অপুষ্টি নিউমোনিয়া হবার পেছনেও একটি কারণ হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশ সরকার (গভর্মেন্ট অফ বাংলাদেশ-জিওবি) ও ইউনিসেফ পরিচালিত মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে ২০১২-২০১৩ চলাকালে জাতীয়ভাবে ০-৫৯ মাসের ৩.২ শতাংশ শিশুর ২ সপ্তাহ আগে থেকে নিউমোনিয়া আছে বলে সন্দেহ করা হয়েছিল, সেসব শিশুদের মাত্র ৩৫.৮% যথাযথ সেবা নিয়েছিল। মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা বেশি নেয়া হয় (৩৮.৮% এর বিপরীতে ৩১.৯%) [জিওবি, বিবিএস ও ইউনিসেফ ২০১৫]। এই তথ্যের মাধ্যমে মেয়েদেরকে স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে কম সুযোগ দেবার দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়।

যেখানে পুরুষের নারী-বিরোধী পক্ষপাতমূলক চিন্তা দেখা যায়, সেখানে এটি বজায় থাকে নারীর এই কাঠামোটিকে প্রশ্ন করার অক্ষমতার কারণে। এই দুষ্টচক্র ভাঙতে পারে শিক্ষা, সামাজিক রীতি ও অবস্থার পরিবর্তন, একটি সহায়ক রাজনৈতিক ও আইনি পরিবেশ এবং মেয়ে ও নারীদের ক্ষমতায়ন। এজন্য প্রয়োজন তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে সরকারি নীতি পর্যন্ত সকল পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি, জেন্ডার সমতা নিয়ে শিক্ষাদান এবং সমাজের সকল স্তরে সামাজিক রীতিকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার।

৪. বাংলাদেশের সামাজিকীকরণের পটভূমিতে কিশোরী-কিশোর

বাংলাদেশে কিশোরী-কিশোর সমাজে জনসংখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বর্তমানে বাংলাদেশে ১০ থেকে ১৯ বছরের ৩৩ মিলিয়ন কিশোরী-কিশোর আছে, যারা জনসংখ্যার ২০.৫% (দৈনিক প্রথম আলো ২০১৬)। সারা দেশের কিশোরী-কিশোররা স্বাস্থ্য, শিশুশ্রম, জোরপূর্বক বাল্যবিবাহ এবং শিক্ষা নিয়ে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। তার ওপর, বয়ঃসন্ধিকাল জীবনের এমন একটি সময় যখন একজন বড় রকমের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে যায়। এসব পরিবর্তন অনেক সময় কিশোরী-কিশোরদের মনে বিভ্রান্তি ও অসহায়তার সৃষ্টি করে। তবে জেন্ডার অনুযায়ী বয়ঃসন্ধিকালের অভিজ্ঞতা কিশোরী এবং কিশোরদের জন্য ভিন্ন হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা -এর মতে,
১০ থেকে ১৯ বছর বয়সীরা হলো কিশোরী-কিশোর

বয়ঃসন্ধিকালকে জীবনের একটি বিশেষ সময় হিসেবে দেখা হয় না। বরং দেখা হয় শৈশব থেকে হঠাৎ করেই প্রাপ্তবয়স্কে উপনীত হওয়া আর মেয়েরা যখন যৌবনে পৌঁছায়, কিশোরদের চেয়ে তারা যে ভিন্নরীতি বা নিয়মের সামনে পড়ে, তা বেশি লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। কিশোরীদের চলাফেরায় বাধা আসে। কাজ, শিক্ষণ, বিনোদন ও সামাজিকতায় প্রবেশাধিকারে অনেক সীমাবদ্ধতা চলে আসে।

সামাজিকীকরণের প্রেক্ষাপটে, বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরী ও কিশোরদের বড়দের মূল্যবোধ ও সামাজিক নিয়ম এবং রীতিগুলোকে পরোক্ষভাবে গ্রহণ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে জীবনসঙ্গী এবং বিয়ের সাথে জড়িত এমনসব সম্পর্কের ভবিষ্যৎ ভূমিকায় অনুশীলন করতে দেখা যায়। এসময়ে মানসিক পরিবর্তনগুলো মানসিক উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে, যার প্রকাশ ঘটে নিজেকে পুনরায় তৈরি এবং প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে নিজের পরিচয়ের পথকে উন্মুক্ত করার মধ্য দিয়ে।

কিশোরী-কিশোররা বুঝতে চেষ্টা করে যে, তারা কারা এবং কী হতে চায়, তাদের ব্যক্তিগত মূল্যবোধ এবং জীবনের দিশা। ধরে নেয়া হয় যে প্রাপ্তবয়সে পৌঁছানোর এই প্রক্রিয়াটি সামাজিকীকরণ এবং পূর্বনির্ধারিত সামাজিক ভূমিকা মেনে নেয়ার মধ্য দিয়ে ঘটে থাকে।

তাদের 'নিজস্ব'তা গড়ে উঠতে থাকে পরিবার ও সমাজের সাথে মিথক্রিয়ার মাধ্যমে, কিন্তু বাংলাদেশের কিশোরী-কিশোরদের জন্য এমন সুযোগ সীমিত (হক ২০০৭)। মা-বাবা এবং পরিবারের বড় সদস্যরা খুব কমই কিশোরী-কিশোরদের মূল্যায়ন করে এবং তাদের চাহিদাকে স্বীকৃতি দেয়, তাদেরকে কনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে দেখা হয় এবং পরিবারের নিয়ম বা রীতি ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে তাদের মতামতের মূল্য দেয়া হয় না। কিশোরী-কিশোরদের মানসিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে মা-বাবা বা শিক্ষকদের কোনো মনোযোগ নেই।

পাড়া-প্রতিবেশীর বাসায় যাওয়া ছাড়া মেয়েদের সামাজিক কর্মকাণ্ড ঘরের মধ্যেই সীমিত থাকে; সামাজিক রীতি ও নিয়মের কারণে তাদের বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ কম থাকে, তার ওপর বয়সের সাথে সাথে তা কমে আসে। বাংলাদেশে মেয়েদের চলাফেরায় সীমাবদ্ধতা থাকলেও মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের সামাজিক কর্মকাণ্ড বা যোগাযোগ অনেক বেশি।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের কিশোরী-কিশোরদের ওপর সামাজিক নিয়ম বা রীতির প্রভাব নিয়ে গভীরভাবে গবেষণা করেছেন নিকোলেত্তা ডেল ফ্রাঙ্কো, যিনি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন কীভাবে কিশোরী-কিশোরদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। তাঁর বইয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন শিশুদের বেড়ে ওঠা ও নৈতিকতার মাত্রা শেখার প্রক্রিয়াটি বোঝা যায় 'লজ্জার' ধারণাটি দ্বারা। যেহেতু পরিবারের মান-সম্মান বজায় রাখার দায়িত্ব মেয়েদের, সেক্ষেত্রে লজ্জা হচ্ছে তাদের জন্য একটি বিশেষ গুণ এবং মনে করা হয় এটা তাদের জেন্ডার ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তাদেরকে শেখানো হয় নিচুস্বরে কথা বলতে হবে, নম্রতা দেখাতে দৃষ্টি নত রাখতে হবে এবং দৃঢ়তা পরিহার করতে হবে। বড়দের সাথে কথা বলার সময়ে ছেলেদের বশ্যতাপূর্ণ আচরণ করতে হবে, কিন্তু মেয়েদের জন্য এমন আচরণ সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য (ডেল ফ্রাঙ্কো ২০১২:১২৩)।

৫. ম্যানুয়ালটির উদ্দেশ্য

এই ম্যানুয়ালটির উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রচলিত জেন্ডার রীতি, সমাজে নারীদের চিরাচরিত অধস্তন অবস্থান এবং জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে তারা যে সহিংসতার শিকার হয় সে সম্পর্কে কিশোরী-কিশোরদের দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ করা। কিশোরী-কিশোরদের মধ্যে প্রচলিত বৈষম্যমূলক জেন্ডার রীতি ও চর্চা সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য এই ম্যানুয়ালটি একটি বাস্তবসম্মত টুল হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া রীতি নিয়ে আলোচনার জন্য পথ তৈরি করে দেয়া এবং শিক্ষা, কাজ, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যে অধিকারের ক্ষেত্রে মেয়েদের সমান অধিকারের জন্য প্রচার চালানো এবং তাদেরকে সব ধরনের বৈষম্য ও সহিংসতা থেকে মুক্তি দেয়ার লক্ষ্যে এই ম্যানুয়ালটির পরিকল্পনা করা হয়েছে।

বয়ঃসন্ধিকাল জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যখন বেশিরভাগ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতি ও নিয়ম শেখে, তখন সম্মানসূচক ও বৈষম্যহীন জেন্ডার রীতির উদাহরণ কিশোরী-কিশোরদের ইতিবাচকভাবে পরিচয় গঠন করতে এবং ভবিষ্যতে ইতিবাচক জেন্ডার সম্পর্ক গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখতে পারে। তারা বৈষম্যমূলক রীতিকে চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে একটি সমতাভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে তাদের অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে ।

বস্তিতে বসবাসকারী কিশোরী-কিশোররা প্রতিদিন অনেক বেশি স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক সেবা বা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় এবং শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ, পাচার, পতিতাবৃত্তি এবং সবরকম শারীরিক, যৌন ও মানসিক সহিংসতার শিকার হয়। অসম সম্পর্ক ও জেন্ডার বৈষম্যমূলক চর্চার কারণে তারা চরম নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়।

এই ম্যানুয়ালটি ঢাকার ৫টি বস্তিতে বসবাসকারী কিশোরী-কিশোরদেরকে উদ্দেশ্য করে তাদের পরিচয় তৈরি করতে, তাদেরকে অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে, প্রচলিত বৈষম্যমূলক রীতি নিয়ে আলোচনার জন্য তাদের ক্ষমতায়ন ঘটাতে এবং জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে প্রস্তুত করা হয়েছে।

৬. সারসংক্ষেপ

পৃথিবীর অনেক দেশের মতোই বাংলাদেশেও প্রচলিত সামাজিক রীতি নারী ও পুরুষের মধ্যে অসম ক্ষমতার সম্পর্ক তৈরি করেছে। সেই সাথে নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্যকে স্থাপন করেছে, যাকে এককথায় বলা যায়- পিতৃতান্ত্রিকতা। বিভিন্ন উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও কার্যক্রমের সুফল নারীদের পেতে হলে এসব রীতিকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে, কেননা এসব নারীর জীবনের সকল পর্যায়ে ব্যক্তিগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক, অসম ক্ষমতার সম্পর্ক, বৈষম্য এবং সহিংসতাকে বজায় রাখে। বাংলাদেশ এমন একটা সময় পার করছে যখন এর জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ কিশোরী-কিশোর। তারা প্রাপ্তবয়স্ক ও চারপাশ থেকে প্রচলিত সামাজিক নিয়ম-রীতি শেখে এবং জেন্ডার পরিচয় ও জেন্ডার সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজেদের জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণ গড়ে তোলে এবং নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতায় সেগুলোর প্রয়োগ ঘটায়। কীভাবে প্রচলিত রীতিগুলো জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য, অসমতা, অসম ক্ষমতার সম্পর্ক এবং নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তা সম্পর্কে তাদের সচেতন করার এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। এসব রীতি যে প্রকৃতিসৃষ্ট নয় বা স্থির কিছু নয়, তা বুঝবার জন্য আদর্শ সময় এটি। বরং এগুলো সামাজিকভাবে তৈরি হয়েছে এবং সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হয়েছে। তাই এগুলো পরিবর্তন এবং চ্যালেঞ্জ করা যায়। কিশোরী-কিশোরদের অবশ্যই কারণ জানতে হবে যে, সমাজে সমতা ও ন্যায়বিচার আনতে এবং জেন্ডার, জাতি ও সংস্কৃতি নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে সমান ক্ষমতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে কেন এসব রীতিকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে।

এই ম্যানুয়ালটি তৈরি করা হয়েছে বস্তি এলাকায় বসবাসরত কিশোরী-কিশোরদের জন্য, যারা তুলনামূলকভাবে নাজুক পরিস্থিতিতে রয়েছে এবং মৌলিক চাহিদা, সেবা, নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা থেকে অনেক বেশি বঞ্চিত হয়। তবে এই ম্যানুয়ালটি শহর বা গ্রাম- যে কোনো জায়গায় বসবাসরত কিশোরী-কিশোরদের জন্য ব্যবহার করা যাবে।

ম্যানুয়ালটি ৪টি মডিউলে ভাগ করে প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিটি মডিউলে রয়েছে নারী-পুরুষের জীবনে জড়িত প্রচলিত যেসব জেন্ডার রীতি, যেগুলো বৈষম্যের চক্র ও সহিংসতা তৈরি করে এবং নারী ও মেয়েদের একটি অসুবিধাজনক ও (পুরুষের তুলনায়) অধস্তন অবস্থায় নিয়ে যায়, সেসব রীতি সম্পর্কে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে সচেতন করে তুলবে। ম্যানুয়ালটি জেন্ডার রীতিকে চ্যালেঞ্জ বা আলোচনার ক্ষেত্রগুলোকে চিহ্নিত করতেও সাহায্য করবে। জেন্ডার রীতিগুলো নিয়ে আলোচনা করার এই প্রক্রিয়াটি নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে যে কোনো উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্দেশ্য পূরণের পাশাপাশি পিতৃতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করবে।

প্রতিটি অধ্যায় একটি ইতিবাচক ধারণা দিয়ে শেষ হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের মনে আশার সঞ্চার করবে।

এই ম্যানুয়ালে আলোচিত কিছু ধারণা, তত্ত্ব, আদর্শ শিক্ষার্থীদের কাছে সবসময় গ্রহণযোগ্য না-ও হতে পারে। এক্ষেত্রে সঞ্চালক বা সহায়কের দায়িত্ব হবে কোনো কিছু তাদের ওপর চাপিয়ে না দেয়া, এতে তারা একরোখা হয়ে উঠতে পারে।

মডিউল ১
নিজের অধিকার সম্পর্কে জানা

প্রথম মডিউলের পুরোটাই হচ্ছে কীভাবে নারী-পুরুষ জেন্ডার পরিচয় পায় সেক্স অর্থাৎ জৈবিক পরিচয়েরও বাইরে; কীভাবে সমাজ ঠিক করে দেয় নারী ও পুরুষ কী ভূমিকা ও দায়িত্বপালন করবে; কীভাবে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক, কর্মকাণ্ড এবং আচরণ নিয়ে সমাজের প্রত্যাশা রীতি ও নিয়মে রূপান্তরিত হয়। কীভাবে প্রচলিত রীতি ছেলে ও মেয়েদের দৈনিক জীবনকে প্রভাবিত করে, মেয়েদের অধিকারের ওপর প্রভাব ফেলে, মেয়েদের আগামীর স্বপ্ন দেখতে বাধা দেয়, তাদের জীবনের আশা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে ধ্বংস করে। এই মডিউলের শেষে প্রচলিত রীতিকে চ্যালেঞ্জ করা ও অধিকার সম্পর্কে আশা সঞ্চারের একটি ইতিবাচক ধারণা দেয়া হয়েছে।

মডিউল ২
এখন কার পালা : কেন পুনরায় আলোচনা?

নারী ও পুরুষের পালিত ভূমিকা ও দায়িত্ব হচ্ছে সামাজিকভাবে সৃষ্ট রীতির প্রতিফলন, আর এ সমস্তই হচ্ছে এই মডিউলের আলোচ্য বিষয়বস্তু। সামাজিক নিয়ম কিশোরী-কিশোরদের ভবিষ্যৎ জীবন ও কর্মজীবনের চালিকা শক্তি হতে পারে না, বরং ব্যক্তির সক্ষমতা, দক্ষতা ও যোগ্যতা হচ্ছে ভবিষ্যৎ গঠনের পূবশর্ত, এর দ্বারা কারো সমাজে অবস্থান এবং মর্যাদার পরিবর্তন সম্ভব, কিশোরী-কিশোররা এ বিষয়ে বুঝবে এবং সচেতন হবে বলে আশা করা যায়। এই মডিউল জোর দিয়েছে যে সমাজের বৈষম্যমূলক সামাজিক রীতিনীতি পরিবর্তিত হওয়া উচিত যেন মেয়ে বা নারীরা ছেলেদের মতোই তথ্য ও অন্যান্য সুযোগ লাভ করতে পারে, কর্মবাজারে প্রবেশের জন্য যেন প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতা গড়তে পারে, যেখানে জেন্ডার পরিচিতি নয় বরং ব্যক্তির যোগ্যতার যাচাই হবে। মেয়েদের মা বা সেবিকারূপে দেখতে চাওয়ার- সামাজিক প্রত্যাশা যে কাজের কোনো অর্থনৈতিক মূল্য বা স্বীকৃতি নেই, সেই প্রত্যাশাপূরণ করার জন্য নিজেদের পরিচয় বা ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন ভেঙে দেয়া উচিত নয়।

মডিউল ৩
আমার শরীর আমার অধিকার : যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার

সামাজিক রীতির কারণে মেয়েদের স্বাস্থ্য হচ্ছে আরেকটি অবহেলার জায়গা। যেখানে সাধারণ স্বাস্থ্য সেবাই নিশ্চিত নয়, সেখানে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা আজও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয় না, এমনকি স্বীকৃতও নয়। যৌনতা নিয়ে কথা বলা, বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে এই সমাজে নিষিদ্ধ। সমাজ মেয়ে ও নারীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা এবং অধিকারের প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করে, ফলে তারা আরও বড় সহিংসতার হুমকির মুখে পড়ে। যৌনতার সাথে সম্পর্কিত ভুল বা অপব্যাখ্যা এবং সহিংসতা হতে মুক্ত থেকে কিশোরী-কিশোরদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য এই মডিউলে বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনগুলো নিয়ে আলোচনার গুরুত্ব, নিজের যৌনতা সম্পর্কে জানা এবং নারী ও মেয়েদের যৌন বা প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার পূরণ করার ওপরে আলোকপাত করা হয়েছে।

মডিউল ৪
সহিংসতা থেকে সম্মানের দিকে যাত্রা : ক্ষমতার সম্পর্ক এবং নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতাকে চ্যালেঞ্জ করা

সমাজে নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা বা জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা নানারূপে আছে। সামাজিক রীতি, নারী ও পুরুষের মধ্যকার বিদ্যমান ক্ষমতার সম্পর্ক, নারীর অধস্তন এবং অসুবিধাজনক অবস্থান, এসবই পরিশেষে নারী ও মেয়েদেরকে আক্রমণের শিকার বানায়। নারী ও মেয়েরা যেসব সহিংসতা বা নির্যাতনের শিকার হয় তার আক্রমণকারী শুধু যে পুরুষসঙ্গী তা নয়, পরিবারের সদস্য থেকে শুরু করে অপরিচিত ব্যক্তি, এমনকি কখনো রাষ্ট্রও আক্রমণকারীর ভূমিকায় থাকে। এই মডিউলে নারী ও মেয়েদের ওপর সহিংসতা, এর মূল কারণসমূহ, সহিংসতার প্রকারভেদ, ফলাফল এবং সহিংতার চক্র সৃষ্টিকারী এসব রীতিকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষেত্রে সমাজের প্রতিটি সদস্যের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, এই মডিউল কিশোরী-কিশোরদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে। ছেলে ও পুরুষদের, সেই সাথে নারী ও মেয়েদের যে কোনো জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার, অসম ক্ষমতার অবস্থান এবং সম্পর্ককে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করবে। এটি জরুরি কারণ সহিংসতার ফলে শুধু যে নারী ও মেয়েরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা নয়, বরং গোটা সমাজের উন্নয়নই পঙ্গু হয়ে পড়েছে।

৭. সহায়কের জন্য নির্দেশনা :

সহায়কের প্রধান ভূমিকা হলো দক্ষতার সাথে একদল মানুষকে তাদের অভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুঝতে সহায়তা করা এবং কোনো একদিকের তর্কের পক্ষপাতিত্ব না করে এসব লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করা।

সহায়ক বা প্রশিক্ষণদানকারী, এই দিকনির্দেশনাগুলো আপনার জন্য। কোনো কাজ বাস্তবায়নের আগে দয়া করে ভালোভাবে পড়ুন। আপনি একজন অভিজ্ঞ সহায়ক তারপরও, এই ম্যানুয়াল অনুসারে জেন্ডার সেশন পরিকল্পনা করার সময় কিছু বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

একজন ভালো সহায়কের উচিত :

- আগে থেকেই অনুশীলনের মাধ্যমে উপকরণগুলো সম্পর্কে জানা
- সমস্ত উপকরণ এবং স্থান আগে থেকেই ঠিক করা যেন নির্দিষ্ট দিনে সেশন নেবার সময়ে স্থান ঠিক করার জন্য অতিরিক্ত সময় নষ্ট না হয়
- অংশগ্রহণকারীদের একে অপরের সাথে ভালোবোধ করতে সাহায্য করা
- একটি মজার ও কৌতূহলোদ্দীপক শিক্ষণ উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা
- তাদের প্রাণশক্তি বৃদ্ধি করা, যেন তারা তাদের নতুন শেখা জ্ঞানকে কাজে লাগায়
- কৌতূহলোদ্দীপক এবং কাজে লাগবে এমন দলীয় কর্মের আয়োজন করা
- যা শেখা হয়েছে সেগুলোর পর্যালোচনায় বৈচিত্র্য রাখা ও অংশগ্রহণমূলক করা। বিচার বিবেচনার সাথে আলোচনার সেশন পরিচালনা করা এবং আলোচনা এগিয়ে নিতে নির্দেশনামূলক প্রশ্ন করা।

সহায়তার ক্ষেত্রে অবাচিক দক্ষতা

- দলের সবার চোখের দিকে তাকিয়ে যোগাযোগ স্থাপন করা প্রতিটি অংশগ্রহণকারীর প্রতি মনোযোগ দেয়া। কাউকে আলাদাভাবে না দেখা
- ঘরের চারদিকে হাঁটা, ধীরে ও শান্তভাবে কথা বলা
- অংশগ্রহণকারীরা যা বলছে তার প্রতিক্রিয়ায় মাথা নাড়া, হাসা। তাদেরকে বোঝানো যে সহায়ক শুনছেন।

সহায়তার ক্ষেত্রে বাচিক দক্ষতা

- এমনভাবে প্রশ্ন করা যেন উত্তর দিতে ও মুক্ত আলোচনায় অংশ নেবার জন্য অংশগ্রহণকারী উৎসাহী হয়
- মুক্ত প্রশ্ন করা যেমন- 'এ বিষয়ে তুমি কী ভাবছ...?' 'কেন?', 'কীভাবে...?' প্রত্যেকেই অপরকে শুনে এবং অপরের মন্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে শিখতে পারে
- অংশগ্রহণকারীদের একে অপরের প্রশ্নের উত্তর দিতে উৎসাহিত করা
- একটি সেশন শেষে, যখন কোনো অংশগ্রহণকারী কিছু বলবেন তখন এ বিষয়ে অন্যদেরও মতামত জানতে চাওয়া
- অংশগ্রহণকারীদের কথা বলায় উৎসাহ দেয়া। অংশগ্রহণকারীদের সহায়কের চাইতেও বেশি কথা বলা উচিত
- কোনো বিশেষ ধারণা তারা বুঝতে পারছে কিনা তা বুঝতে অংশগ্রহণকারীকে পুনরাবৃত্তি বা তাদের নিজের ভাষায় বিষয়টি উপস্থাপন করতে বলা। সহায়ক অংশগ্রহণকারীর বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোকে এমনভাবে বলবেন যেন তারা বোঝে যে তাদের কথায় জোর দেয়া হচ্ছে এবং সহায়ক তাদের কথা বুঝেছেন
- নিয়মিত আলোচনার সারসংক্ষেপ করা, অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করা সহায়কের সাথে কোনো ব্যাপারে তাদের দ্বিমত আছে কিনা এবং তাদের উপসংহারে আসতে সাহায্য করা।

অধিবেশনের জন্য তৈরি হওয়া

অধিবেশনের আগে, সহায়ক নিশ্চিত হবেন যে সমস্ত উপকরণ যথেষ্ট পরিমাণে আছে এবং অংশগ্রহণকারীদের জন্য যথেষ্ট বসার জায়গা আছে। সব ফ্লিপচার্ট (পোস্টার) লিখে রাখতে হবে এবং হ্যান্ডআউট ও তথ্য আগে থেকেই অনুলিপি করে রাখতে হবে।

যেসব উপকরণ লাগবে

- ফ্লিপচার্ট স্ট্যান্ড
- ফ্লিপ কাগজ
- মাস্কিং টেপ
- পার্মানেন্ট মার্কার
- কাঁচি
- পোস্টার কাগজ
- ভিপ কার্ড
- আর্ট লাইনার/বোর্ড মার্কার

- এই ম্যানুয়ালে উল্লিখিত গল্পের অনুলিপি
- প্রয়োজনীয় আইন ও নীতিমালার অনুলিপি
- লেখার খাতা
- কলম
- বিসিসি উপকরণ (ফ্লিপচার্ট)

সংবেদনশীল বিষয়ের ওপর সেশন পরিচালনা করা

সফলভাবে শিক্ষণের জন্য, বিশেষ করে কোনো আবেগীয়, সংবেদনশীল বা চ্যালেঞ্জের বিষয়ে বলার বা মতবিনিময়ের জন্য একটি নিরাপদ স্থান ঠিক করতে হবে। সহায়ক দলকে বলে নেবেন যে, এখন এমন বিষয়ে আলোচনা করবেন যা তারা আগে কখনো আলোচনা করেনি এবং এটি নিয়ে অস্বস্তিবোধ করাটা দোষের নয়। তিনি এমন একটি নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করবেন যেন অংশগ্রহণকারীরা তাদের মতামত দিতে পারে এবং সময়ের সাথে সাথে ইস্যুটি নিয়ে আলোচনা করতে তারা সহজবোধ করে। তাদের মতামতের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। তাদেরকে বলবেন তারা যেন নতুন ভাবনা প্রয়োগ এবং আচরণ তাদের পরিবার ও বন্ধুদের সাথে করার চেষ্টা করে। কেউ কেউ প্রত্যাশা অনুযায়ী সফল হবে কিন্তু কেউ কেউ হয়তো পারবে না। তারা বলতেই পারে যে, কোন্‌টা কাজে দিয়েছে এবং কোন্‌টা দেয়নি, তাদের এই বিষয়টি বলার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই। এটা বলে দেয়া ভালো যে, এখানে সবাই শিখতে এসেছে এবং ভুল থেকে এমনকি যা প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজে দেয়নি তা থেকেও শেখা সম্ভব।

নিয়ম তৈরি করা

অংশগ্রহণকারী দলকে বলুন যে সবার অংশগ্রহণ, মতবিনিময় এবং সেশনগুলো আনন্দময় করে তোলার জন্য কিছু নিয়ম নির্ধারণ করা হবে। নিয়মের একটা উদাহরণ দিন, তারপর বাকিদের বলুন তারা কী কী নিয়মের কথা ভাবছে সেটা বলতে। নিচের নিয়মগুলো যেন অন্তর্ভুক্ত হয়, তা নিশ্চিত করুন। প্রথম কয়েকটি সেশনে নিয়মের তালিকা দেখুন এবং এমন জায়গায় লাগান যেন তা সকলের দৃষ্টিগোচর হয় এবং প্রয়োজনে প্রয়োগ করা যায়।

নিয়মের উদাহরণ

- যখন কেউ কথা বলবে, তখন অন্যেরা শুনবে কথায় বাধা না দিয়ে
- অংশগ্রহণকারীরা কেউ কাউকে বিচার করবে না তবে দলে আলোচিত নানা বিষয় থেকে শেখার চেষ্টা করবে
- চাইলে কেউ মতামত না-ও দিতে পারে তবে প্রত্যেকে যত বেশি মতামত দেবে দল তত শিখতে পারবে
- যে কোনো প্রশ্ন করা, কারণ এমন হতে পারে যে অনেকে একই বিষয়ে জানতে চায়
- যদি কেউ এমন কোনো কথা বলে যা ব্যক্তিগত ও গোপনীয়, তবে তা দলের মধ্যেই গোপন রাখতে হবে।

নামহীন প্রশ্নের বাক্স

সহায়ক একটি বাক্স রাখতে পারেন যেখানে অংশগ্রহণকারীরা যে কোনো প্রশ্ন, চিন্তা বা মতামত লিখে বাক্সে ফেলতে পারবে, তারা চাইলে তাদের নাম বা পরিচয় না-ও প্রকাশ করতে পারে। এভাবে বিকল্পপন্থা হিসেবে অংশগ্রহণকারীরা কোনো সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে আরও জানতে চাওয়ার নিরাপদ পরিবেশ পাবে। প্রথমদিকে হয়তো সহায়ক সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রশ্ন পাবেন না, কিন্তু যখন তারা দেখবে যে সহায়ক প্রশ্নগুলোর উত্তর খুবই যত্ন সহকারে দিচ্ছে, তখন তারা প্রশ্ন করতে আত্মবিশ্বাসী হবে।

স্ক্র্যাপ বা খেরো খাতা

কোর্সের শুরুতে প্রতিটি অংশগ্রহণকারী একটি করে স্ক্র্যাপ খাতা পাবে। জেন্ডার সেশন থেকে তারা কী শিখছে তা লিখে রাখতে এটা ব্যবহার করবে। সহায়ক নিশ্চিত হবেন যে, প্রতিটি অংশগ্রহণকারী স্ক্র্যাপ খাতা ব্যবহার করছে, কারণ কোর্সের একদম শেষে জেন্ডার সেশনের মূল্যায়ন করার একটি টুল হিসেবে এটি ব্যবহৃত হবে।

[আপনি যদি সহায়তা বিষয়ে আরও জানতে চান, তবে দেখুন ওয়ার্ল্ড ভিশন ইন্টারন্যাশনাল ২০০৪, জেন্ডার ট্রেইনিং টুলকিট (২য় সংস্করণ)]

মডিউল ১

নিজের অধিকার সম্পর্কে জানা

অধিবেশন ১.১ নিজেদেরকে জানা

উদ্দেশ্য

- অংশগ্রহণকারীদের একে-অপরের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া
- পারস্পরিক বিশ্বাস ও সম্মান স্থাপন করা
- ব্যক্তিগত ও সাংস্কৃতিক (আঞ্চলিক) ভিন্নতাকে বের করে আনা

পদ্ধতি

খেলা, আলোচনা

উপকরণ

জেন্ডার সেশনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং প্রত্যাশা লেখাসম্বলিত পোস্টার।

সময়

৪৫ মিনিট

প্রক্রিয়া

- সকল অংশগ্রহণকারীকে স্বাগত জানান, তাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে এই সেশনের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বলুন
- অংশগ্রহণকারীদের ব্যাখ্যা করে বলুন যে, তারা সকলেই একই বা কাছাকাছি বয়সের, যদিও তারা একে-অন্যকে চেনে, তারপরও আনুষ্ঠানিকভাবে সেশন শুরুর আগে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আরেকটু বিশদ পরিচয় এবং আন্তঃক্রিয়া করাটা গুরুত্বপূর্ণ
- অংশগ্রহণকারীদের বলুন তাদের জোড়া তৈরি করতে। জোড়া তৈরি করার জন্য জন্মের মাস, দেশের বাড়ি বা নামের আদ্যাক্ষর ব্যবহার করুন। প্রতিটা জোড়াকে ১০ মিনিট সময় দিন একে-অপরের সাথে কথা বলার জন্য এবং সঙ্গীর নাম, গ্রামের বাড়ি, শখ, পছন্দ-অপছন্দ, লক্ষ্য বা স্বপ্ন, একটি ইতিবাচক আচরণ কিংবা মনোভাব এবং একটি শিক্ষণীয় বিষয় যা সে ছোটবেলা থেকে শিখেছে তা জেনে নেয়ার জন্য। অংশগ্রহণকারীদের আগে নিজের সম্পর্কে বলুন
- ১০ মিনিট পরে প্রতিটি অংশগ্রহণকারী জোড়াকে বলুন দলের অন্যদের সামনে নিজের সঙ্গীর পরিচয় দিতে। এভাবে প্রত্যেকে নিজের সঙ্গীর মাধ্যমে পরিচিত হবে
- জিজ্ঞেস করুন তাদের কেমন লেগেছে যখন তারা নিজেদের কথা অন্যকে বলেছে, তাদের অনুভূতি কেমন ছিল যখন তারা একে-অন্যের শখ সম্পর্কে আলোচনা করেছে, তাদের পছন্দ-অপছন্দ, লক্ষ্য কি একই রকম ছিল নাকি ভিন্ন? এটি তাদের একে-অপরের সাথে ভিন্নতা বুঝতে বা কিশোরী-কিশোরদের মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয় অভিন্ন তা বের করে আনতে সাহায্য করবে এবং তারা এটাও বুঝতে পারবে যে যদিও তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছে, তারপরও তাদের জেন্ডার নির্বিশেষে সবারই লক্ষ্য ও স্বপ্ন আছে। এতে তাদের কাছে যে বার্তা পৌছাবে তা হলো, আমাদের স্বপ্ন ও লক্ষ্য আলাদা হলেও আমাদের প্রত্যেকের জীবনের মূল্যবোধেই তা অন্তর্নিহিত আছে। কারণ মূল্যবোধের সাথে জড়িত উদ্দেশ্য ছাড়া জীবন দিকশূন্য নৌকার মতো। তাই মেয়ে-ছেলে নির্বিশেষে সবারই ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি স্বপ্ন থাকা উচিত যেটা তাকে ভবিষ্যতে নিজস্ব পরিচয় সৃষ্টিতে সাহায্য করবে
- অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা করে সেশন চলাকালীন মেনে চলার জন্য কিছু নিয়ম তৈরি করুন এবং তা দেয়ালে এমন জায়গায় আটকে দিন যেন সবাই দেখতে পারে
- অংশগ্রহণকারীদের কাছে এই জেন্ডার শিক্ষা সেশনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং প্রত্যাশা বর্ণনা করুন

অবশিষ্ট কাজ

- জিজ্ঞেস করুন উদ্দেশ্য নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা
- তাদের মনে করিয়ে দিন যে কোনো প্রশ্ন বা তথ্য জানার থাকলে তা লিখে কক্ষে রাখা নামহীন বাক্সে ফেলতে পারে।

সহায়কের জন্য তথ্য

জেন্ডার সেশনের লক্ষ্য

যথাযথ জ্ঞানের মাধ্যমে জেন্ডার বৈষম্যমূলক চর্চার সৃষ্টিকারী প্রচলিত সামাজিক রীতিগুলোকে পুনরায় আলোচনা ও চ্যালেঞ্জ করার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং সেই সাথে অংশগ্রহণকারীদের নারীর প্রতি সহিংসতার কারণগুলো সম্পর্কে সচেতন করা।

উদ্দেশ্য

- কিশোরী-কিশোরদের অসম জেন্ডার রীতি, এগুলো কীভাবে শেখানো হয় ও বিশেষ করে কীভাবে এগুলো মেয়েদের শিক্ষা, কাজ, স্বাস্থ্য, বিশেষ করে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সমঅধিকার পাবার সুযোগের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং সহিংসতামুক্ত জীবন সম্পর্কে সচেতন করা
- জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য ও অসমতার মূল ক্ষেত্রগুলো ব্যাখা করা
- জেন্ডার অসমতার ইস্যুগুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি এবং পুনরায় আলোচনা করার ক্ষেত্রগুলোকে চিহ্নিত করা।

প্রত্যাশা

জেন্ডার সমতামূলক রীতি ও চর্চার পক্ষে কিশোরদের ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা, কিশোরীদের সমতামূলক ভূমিকাটি বুঝে নেয়া এবং জেন্ডার বৈষম্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা যে কোনো ক্ষতিকর চর্চাকে প্রত্যাখ্যান বা প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে তাদের আরও আত্মবিশ্বাসী করে তোলা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

দ্রষ্টব্য

সমতামূলক ভূমিকা :

এমন ভূমিকা যা কোনো বৈষম্য বা জেন্ডার পরিচয়ের ওপর ভিত্তি করে সৃষ্ট নয়।

ক্ষতিকর চর্চা :

ক্ষতিকর (ঐতিহ্যগত) চর্চা হচ্ছে এমন ধরনের সহিংসতা যা মূলত মেয়ে বা নারীদের প্রতি কোনো জাতি বা সমাজে বহুদিন ধরে চলে আসছে, যেগুলো বিবেচিত হয় বা সহিংসতা সৃষ্টিকারী উপস্থাপন করে সাংস্কৃতিক চর্চার অংশ হিসেবে। সবচেয়ে বেশি যে চর্চাটি হচ্ছে তা হলো জোরপূর্বক বাল্যবিবাহ।

জেন্ডার সেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং প্রত্যাশা বর্ণনা করার সময় সহায়ক পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করবেন যে, সামনের সেশনগুলোতে অংশগ্রহণকারীরা জেন্ডার বিষয়ক আরও অনেক কিছু শিখবে, তাই এখন যেসব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা তাদের কাছে এই মুহূর্তে পরিষ্কার না-ও হতে পারে। সেশনে শেখা, বলা এবং মতবিনিময় করার সময় একে অপরকে সহযোগিতা করা গুরুত্বপূর্ণ। সেশনেগুলোর মধ্য দিয়ে তারা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং প্রত্যাশা ভালোভাবে বুঝতে পারবে।

সহায়ক পরিষ্কার করে দেবেন যে, ছেলেদের কোনোভাবেই ভেবে নেয়া উচিত হবে না যে, জেন্ডার বৈষম্যমূলক চর্চার জন্য ব্যক্তিগতভাবে তারাই দায়ী। পিতৃতান্ত্রিতা, প্রথাগত নিয়মকানুন এবং রীতির চর্চা এমন অসম কাঠামোর জন্য দায়ী।

অধিবেশন ১.২ বেড়ে উঠি ভিন্নভাবে : আমাদের মধ্যে ভিন্নতা

উদ্দেশ্য

- নারী ও পুরুষের মধ্যে ভিন্নতা (আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে) বোঝা, বিশেষ করে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে
- সেক্স এবং জেন্ডারের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে শেখা

পদ্ধতি

দলীয় কাজ, পোস্টার উপস্থাপন ও আলোচনা

উপকরণ

পোস্টার কাগজ, সাইন পেন

সময়

৪৫ মিনিট

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ : নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য

- শুভেচ্ছা বিনিময়ের পরে অংশগ্রহণকারীদের এই প্রশ্নগুলো করুন :
  - আমরা কী? [আমরা মানুষ]
  - আমাদের কী কী ভাগে ভাগ করা যায়? [মেয়ে/নারী আর ছেলে/পুরুষ]
  - মেয়ে আর ছেলেরা কি আলাদা বলে মনে হয়?
  - পার্থক্যগুলো কী কী?
- তাদের উত্তর দিতে উৎসাহ দিন, তাদের- হ্যাঁ, পার্থক্য আছে না বলে, তাদেরই বের করতে দিন যতগুলো পার্থক্য তারা বের করতে পারে। ১০ মিনিট এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করুন।
- অংশগ্রহণকারীদের ২ ভাগ করুন। একটি ছেলে, অন্যটি মেয়েদের। দলীয় কাজটি তাদের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন। তাদের ২ রঙের পোস্টার কাগজ দিন, সাথে বলুন পরবর্তী ১০ মিনিট তাদের কী করতে হবে। প্রত্যেক দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করার জন্য দল থেকে একজনকে নির্বাচন করতে বলুন।
- দু'টি দল যা করবে-
  - পোস্টারে দু'টি কলাম করবে; কলামের শিরোনাম দেবে- মেয়ে/নারী আর ছেলে/পুরুষ
  - মেয়ে আর ছেলের মধ্যকার পার্থক্য লিখবে
  - এসব পার্থক্যের মধ্যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল পার্থক্য লিখতে হবে। তারা যতগুলো পার্থক্য খুঁজে পাবে সবই লিখবে।

[সহায়ক ইঙ্গিত দেবেন যাতে জৈবিক/স্বাভাবিক ও সামাজিক সকল ধরনের পার্থক্য তারা লেখে]

পোস্টার : ১

মেয়ে/নারী	ছেলে/পুরুষ

ধাপ ২ : নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্যের ধরন

- নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে দলীয় উপস্থাপনার পরে সহায়ক সকলকে ঐকমত্যে আনবেন যে মেয়ে/নারী আর ছেলে/পুরুষের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। এসব পার্থক্যের ভেতর কিছু আছে জৈবিক/স্বাভাবিক ও কিছু সামাজিকভাবে তৈরি। এখন কাজ হচ্ছে জৈবিক/স্বাভাবিক ও সামাজিক পার্থক্য আলাদা করা

- একটি পোস্টার কাগজে দু'টি কলাম তৈরি করুন, একটি জৈবিক/স্বাভাবিক ও অন্যটি সামাজিক পার্থক্য। তারপর দলীয় কাজ থেকে একটি করে পার্থক্য বের করে আনুন এবং অংশগ্রহণকারীদের সাহায্যে তাদেরকে যথার্থ কলামে, জৈবিক অথবা সামাজিক কলামে লিখবেন।

পোস্টার : ২

	জৈবিক/স্বাভাবিক	সামাজিক পার্থক্য
নারী		
পুরুষ		

ধাপ ৩ : সেক্স ও জেন্ডারের মধ্যে পার্থক্য

- প্রথম পোস্টারের দিকে ইঙ্গিত করে অংশগ্রহণকারীদের বলুন যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে মাত্র একটাই পার্থক্য রয়েছে, সেটা হলো- 'সেক্স'। প্রকৃতিই এই জৈবিক বা শারীরিক পার্থক্য তৈরি করেছে। যখন কোনো শিশু জন্মায়, তার প্রজনন অঙ্গ দেখে বলা হয় সে ছেলে বা মেয়ে। জৈবিক পার্থক্য বলে দেয় যে, পুরুষরা পুরুষ সেক্সের অন্তর্ভুক্ত এবং নারীরা নারী সেক্সের অন্তর্ভুক্ত। এভাবে নারী-পুরুষ তাদের সেক্সের দিক থেকে আলাদা হয়। এই জননেন্দ্রিয়গুলো থেকে অন্যান্য পার্থক্য তৈরি হয়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো নারী সন্তান জন্ম দেয়, কিন্তু পুরুষ তা পারে না। সন্তান জন্মদান হলো নারীর একটি শক্তি যা পুরুষের নেই। সাধারণত এই জৈবিক পার্থক্যগুলো সর্বজনীন, স্থির, এগুলো জাতি, নৃতাত্ত্বিক বা সাংস্কৃতিকভাবে পরিবর্তন করা যায় না কিংবা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় না

- বাকি যে পার্থক্যগুলো আছে 'সামাজিক পার্থক্য' কলামের মধ্যে সেগুলো সেক্সের ভিত্তিতে সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট। এ ধরনের পার্থক্যগুলো বোঝার ক্ষেত্রে আমরা 'জেন্ডার' শব্দটি ব্যবহার করি। এসব পার্থক্য সময়ের সাথে, জাতি, সংস্কৃতি, বর্ণ, শ্রেণি, ধর্ম নির্বিশেষে পরিবর্তিত হয়

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন যে, আমরা এই সেশনে শিখলাম নারী ও পুরুষের মধ্যে ২ ধরনের পার্থক্য করা হয়; জৈবিক ও সামাজিক, অন্য কথায়- সেক্স ও জেন্ডার। সামাজিক পার্থক্যগুলো সমাজ থেকে সৃষ্টি হয়েছে আর যেহেতু সমাজ পরিবর্তিত হয়, তাই এসব পার্থক্যও পরিবর্তন করা সম্ভব।

যখন সেক্সের পার্থক্যের কথা উঠবে অংশগ্রহণকারীরা তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে জেন্ডার বা হিজড়াদের প্রসঙ্গ আনতে পারে। যদি এই বিষয়টি ওঠে, তাহলে স্বীকার করুন যে, সমাজে প্রতিটি মানুষই নারী বা পুরুষের যৌনাঙ্গ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তবে অনেক সময় এমন হয় যে, কারো জন্ম থেকে যৌনাঙ্গ 'অপূর্ণাঙ্গ' থাকে। আবার অনেক সময় অনেক পুরুষ নারী হতে চায়, তখন তারা যৌনাঙ্গচ্ছেদ করে নিজেদের হিজড়া আখ্যা দেয়।

[এনজেন্ডারহেলথ ২০০৬ ম্যানুয়াল থেকে নেয়া]

অধিবেশন ১.৩ বেড়ে উঠি ভিন্নভাবে : আমরা যেভাবে আচরণ করি

উদ্দেশ্য

- সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত নারী ও পুরুষের জন্য ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বা আচরণগুলোকে দেখা

পদ্ধতি

দলীয় কাজ, মুক্তচিন্তার ঝড়

উপকরণ

দু'টি বড় বাদামি কাগজ, লেবেল বানাবার জন্য দু'রঙা পোস্টার কাগজ, সাইন পেন, পোস্টার ৩

সময়

৪৫ মিনিট

প্রক্রিয়া

- প্রথম ১০ মিনিট আগের দিন যা শেখা হয়েছে তা পুনরালোচনা করে নিন। অংশগ্রহণকারীদের বলতে পারেন পুনরালোচনাটি পরিচালনা করতে
- অংশগ্রহণকারীদের বলুন যে, আজ আমরা আলোচনা করব মেয়ে/নারী আর ছেলে/পুরুষদের কী রকম হওয়া উচিত বলে সমাজ মনে করে। এর জন্য আমাদের দলে কাজ করতে হবে। অংশগ্রহণকারীদের দুটি দলে ভাগ করুন, প্রতিটি দলে মেয়ে ও ছেলে উভয়কেই রাখুন
- প্রতিটি দলকে একটি করে বড় বাদামি কাগজ দিন। দল দু'টিকে বলুন কাগজটা মাটিতে বিছাতে; ২ দল থেকে দু'জন স্বেচ্ছাসেবী – একজন মেয়ে, একজন ছেলেকে বলুন কাগজের ওপর শুয়ে পড়তে এবং প্রতি দল থেকে আরও একজন করে স্বেচ্ছাসেবী ডেকে নিন এবং কাগজের ওপর শুয়ে থাকা দু'টি মানুষের প্রতিকৃতি আঁকতে বলুন
- কিছু অংশগ্রহণকারী যখন আঁকতে থাকবে, দলের বাকিরা চিন্তা করবে এবং একদল লেবেল তৈরি করবে 'আসল পুরুষের' বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কিত শব্দ বা প্রবাদ দিয়ে, অন্য দল লেবেল তৈরি করবে 'আসল নারী'-এর বৈশিষ্ট্য নিয়ে। দু'রঙা পোস্টার কাগজ ব্যবহার করা হবে ভিন্নতা বোঝার জন্য। তাদের ১০ মিনিট সময় দিন কাজটি শেষ করতে
- যখন দল দু'টি লেবেল তৈরির কাজ শেষ করবে, একদল আঁকা একটি প্রতিকৃতিতে 'আসল পুরুষের' বৈশিষ্ট্য বা আচরণ বর্ণনাকারী শব্দ বা প্রবাদ লেখা লেবেল লাগাবে, আরেক দল 'আসল নারীর' বৈশিষ্ট্য বা আচরণসম্বলিত লেবেল সেঁটে দেবে অন্য প্রতিকৃতিতে।

[আসল পুরুষের বর্ণনায় এমন শব্দ বা প্রবাদ আসতে পারে চিন্তাভাবনার মধ্য দিয়ে শক্তিশালী, সাহসী, পরিবারের প্রধান, দায়িত্বশীল, কর্মঠ, রক্ষাকারী, উপার্জনকারী, বুদ্ধিমান, যুক্তিবাদী, আগ্রাসী আর আসল নারীদের ক্ষেত্রে- আবেগপ্রবণ, বিনয়ী, দুর্বল, সংবেদনশীল, লাজুক, নির্ভরশীল, যত্নশীল, ঈর্ষাকাতর, ধৈর্যশীল, ভদ্র, ক্ষমাশীল প্রভৃতি।]

- দুই দল কাজ শেষ করার পর তাদের ধন্যবাদ দিন স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য
- নিচের প্রশ্নগুলো করুন এবং অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ দিন আলোচনায় অংশ নিয়ে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে :

▸ আঁকা প্রতিকৃতি দেখে যৌনাঙ্গ ছাড়া নারী-পুরুষ আলাদা করা যাবে কি?

[উত্তর হবে - না]

▸ আমরা কেন দু'টি প্রতিকৃতিতে ভিন্ন লেবেল লাগালাম?

[সম্ভাব্য উত্তর - আমরা এরকমই জানি বলে]

▸ আমরা কীভাবে জানি যে, এসব লেবেল আসল পুরুষ বা আসল নারীর?

[আমরা ছোটবেলা থেকেই জানি, আমাদের মা-বাবা, পরিবার, বই, স্কুল আমাদের চারপাশের সবাই বলে]

- তাদের বলুন যে যৌনাঙ্গ ছাড়া শুধু প্রতিকৃতি দেখে বলা সম্ভব নয় কে ছেলে বা কে মেয়ে। আমরা এখন চিহ্নিত করতে পারি প্রতিকৃতিতে লাগানো বৈশিষ্ট্যের লেবেল দেখে, যা আমরাই লাগিয়েছি। তাই আমরা বলতে পারি যে, এটা হচ্ছে জেন্ডার যা মেয়ে-ছেলে পৃথক করে। আর সমাজ এসব লেবেল তৈরি করে নারী ও পুরুষের পরিচয় দেবার জন্য
- তাদের বলুন এসো আমরা মেয়ে/নারী আর ছেলে/পুরুষের সমাজ স্বীকৃত আচার-আচরণের মধ্যে আরও কিছু পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করি
- পোস্টার ৩ দেখান এবং তাদের উত্তর দিতে বলুন, প্রতিটি অংশগ্রহণকারী যাতে অংশগ্রহণ করে সেজন্য তাদেরকে প্রশ্ন করুন তোমরা কী মনে কর, কীভাবে, কখন এবং কোথায় এসব পার্থক্য দেখা যায়। পোস্টারে যা আছে তার বাইরেও আরও পার্থক্য বের করতে বলুন।

[লক্ষ্য করবেন কোনো কোনো অংশগ্রহণকারী আপনাকে কিছু আচার-আচরণের ক্ষেত্রে দু'টিতেই টিক চিহ্ন দিতে বলবে। তবে বেশিরভাগই চিরাচরিত উত্তর দেবে]

- **তাদের নিচের প্রশ্নগুলো করুন :**

১. তোমাদের কি মনে হয় এসব বৈশিষ্ট্য জৈবিক পার্থক্যের সাথে জড়িত?

২. যদি কোনো নারী বা পুরুষ সমাজে একজন নারী বা পুরুষের যেভাবে আচরণ করা উচিত সেই প্রত্যাশাকে না মানে তবে কী হয়?

৩. এসব প্রত্যাশিত আচার-আচরণ কি সব সংস্কৃতিতে, সমাজে বা সকল সময়ে এক হয়?

৪. তোমাদের কি মনে হয় এসব ভিন্ন আচার-আচরণ পরিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন? কেন?

৫. তোমাদের কি মনে হয় এসব ভিন্ন আচার-আচরণ পরিবর্তন করা যাবে?

৬. কখন এবং কীভাবে পরিবর্তন করা যাবে?

৭. এসব পরিবর্তিত হলে কি আমাদের কোনো লাভ হবে, হলে কীভাবে?

৮. কোন্ প্রেক্ষাপটে আচরণটি দু'জনের জন্যই (এই প্রশ্নটা করা হবে যদি কেউ দু'টিতেই টিক দেয় কোনো আচার-আচরণের ক্ষেত্রে)

- প্রথমে তাদের কথা শুনুন তারপর ব্যাখ্যা দিন কেন নারী ও পুরুষ সমাজের চাপিয়ে দেয়া বৈশিষ্ট্য এবং আচরণ অনুসরণ করে।

পোস্টার : ৩

আচরণ	মেয়ে/নারী	ছেলে/পুরুষ	উভয়
সিদ্ধান্ত নিতে পারে			
যে কোনো সময়ে কাঁদে			
সবসময়ে ভয়ে থাকে			
পরিস্থিতি শক্ত হাতে সামলায়			
প্যান্ট শার্ট পরে			
গয়না পরে			
পুতুল দিয়ে খেলে			
সূর্য ডুবলে বা অন্ধকার হলে বাসায় ফেরে না			
চাইলেই বাইরে যেতে এবং বন্ধু বানাতে পারে			
জোরে হাসে না			
সৌন্দর্যই একমাত্র চিন্তা			
চুপচাপ থাকে এবং তর্ক করে না			
লাজুক থাকাটা গুণ			
বাইরে কাজ একটা বয়সের পর গিয়ে লেখাপড়া করতে পারে			
বিয়েটাই অগ্রাধিকার পায়			

একদম শেষে সহায়ক নিচের ব্যাখ্যাটি দেবেন

আমরা সমাজে বসবাসকারী মানুষ। আমরা জানি যে, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে 'আসল নারী' ও 'আসল পুরুষ'-এর লেবেল দেই। আমরা আশা করি যে, নারী ও পুরুষ কিছু বেঁধে দেয়া আচার-আচরণ করবে, যেটি সমাজে 'স্বাভাবিক' বলে বিবেচিত হবে। যদি কোনো নারী বা পুরুষের এসব বৈশিষ্ট্য না থাকে বা ভিন্নভাবে আচরণ করে, তাহলে তাকে আর আসল নারী বা পুরুষ বলে মনে করা হয় না। আর সমাজ তাদের সমালোচনা করা শুরু করে, তাদেরকে খারাপ কথা বলে এবং সামাজিক জীব হিসেবে তাদের সম্মান দেয়া হয় না। তাই সমালোচনার শিকার না হবার জন্য এবং 'স্বাভাবিক' মানুষের মতো আচরণ করার জন্য সমাজ যেমন চায় মানুষ তেমন আচরণই করে। প্রতিটি সমাজ নারী বা পুরুষের মধ্যে কিছু পার্থক্য সৃষ্টি করেছে এবং সেগুলো তাদের পরিচয় বলে লেবেল দিয়েছে। তবে এই পার্থক্যগুলো সব সমাজ এবং সংস্কৃতিতে একরকম নয়। এমনকি বাংলাদেশের সমাজের মধ্যেও আমরা বিভিন্নতা দেখতে পাই।

এটি বলা যায় না শুধু মেয়ে বা নারীরাই আবেগপ্রবণ। আমাদের সমাজে অনেক ছেলে ও পুরুষ আছে যারা আবেগপ্রবণ, নম্র, লাজুক, বিনয়ী, আবার কোনো কোনো নারী রূঢ়, কৌশলী এবং আত্মবিশ্বাসী। আমরা যদি কান্নার কথা বলি, ছেলে হোক বা মেয়ে, সব শিশুই জন্মের সময় কাঁদে। শিশুকালে ছেলে বা মেয়ে যে কেউ কাঁদলে তা গ্রহণযোগ্য, কিন্তু তারা যখন বড় হতে থাকে, আমরা মেয়েদের কাঁদতে দেই, যেহেতু তারা মানুষ হিসেবে দুর্বল। অন্যদিকে ছেলেদের বলা হয় কঠিন হতে এবং না কাঁদতে (যেহেতু চিরাচরিত ভাবনা হলো- কান্না দুর্বলতার প্রতীক)। আমরা ভুলে যাই যে কঠিন আর দুর্বলতা মানুষের বৈশিষ্ট্য। মানুষ হিসেবে নারী-পুরুষ উভয়েরই এটি থাকতে পারে তাদের জৈবিক পরিচয়ের ভিন্নতা সত্ত্বেও। মানুষ হিসেবে সবারই আলাদা বৈশিষ্ট্য এবং আচরণ থাকে আর এগুলো শুধু নারী অথবা পুরুষের জন্য নির্ধারিত হতে পারে না। সমাজ 'আসল নারী' ও 'আসল পুরুষ'-এর বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে, যেগুলোর সাথে

জৈবিক বা সেক্সের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই মেয়ে/নারী এবং ছেলে/পুরুষরা সমাজ তাদের কাছে যা প্রত্যাশা করে তা শেখে এবং জেন্ডার পরিচয় ধারণ করে। (সহায়ক অন্য বৈশিষ্ট্য বা আচার-আচরণের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করতে পারেন)।

বাংলাদেশে সমাজ অনেক বছর আগে মেয়েদের ঘরের বাইরে কাজ করাকে গ্রহণ করত না। আজ অনেক মেয়ে/নারী অফিসে, কারখানায় কাজ করছে এবং সন্ধ্যার পরে বাসায় ফিরছে। কেননা সময়, প্রেক্ষাপট এবং অর্থনীতির ধারা বদলে গেছে। আজকাল অনেক মেয়ে এবং নারী কারখানায় কাজ করে (যেমন- তৈরি পোশাক কারখানায়) এবং বিভিন্ন জায়গায় পাড়ি দেয় কাজের জন্য।

তাছাড়া, আজকাল অনেক মেয়ে বাইরের খেলাধুলায় জড়িয়ে পড়ছে। বাংলাদেশে প্রমীলা ক্রিকেট ও ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু হয়েছে কারণ মেয়েদের খেলার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। অবশ্য এসব সারা দেশে এখনও ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি, তবে এটা ঘটছে। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, এসব পার্থক্য স্থির নয় এবং প্রেক্ষাপটের ওপরে ভিত্তি করে সময়ের সাথে সাথে বদলানো যায় (সহায়ক কোনো বিখ্যাত নারী ক্রীড়াবিদের কথা বলবেন যেন সবাই সহজে যোগসূত্র খুঁজে পায়)।

অধিবেশন ১.৪ বেড়ে উঠি ভিন্নভাবে : আমরা কী ভূমিকা পালন করি

উদ্দেশ্য

- নারী ও পুরুষ সমাজ কর্তৃক সংজ্ঞায়িত ও নির্ধারিত যেসব ভূমিকা পালন করে সেগুলো সম্পর্কে সচেতন করা
- এসব ভূমিকা যে স্থির নয় এবং পরিবর্তন করা যায় তা বোঝা

পদ্ধতি

আলোচনা, পোস্টার উপস্থাপনা, ভূমিকাভিনয়

উপকরণ

ভূমিকাভিনয়ের জন্য গল্প, পোস্টার-৪

সময়

৪৫ মিনিট

প্রক্রিয়া

- অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানান এবং জিজ্ঞেস করুন আগের সেশনের শিক্ষণ অনুযায়ী তারা বাড়িতে নারী ও পুরুষদের আচার-আচরণের সাথে মেলে এমন কিছু খুঁজে পেয়েছে কিনা? তাদের অভিজ্ঞতা ও মতামত বলা এবং আলোচনার জন্য কিছুটা সময় দিন। [আপনি হয়তো সবাইকে কথা বলতে দিতে পারবেন না, তবে কয়েকজন অংশগ্রহণকারীকে দিতে পারেন এবং অন্যদের বলবেন যে, সময়ের অভাবে সকলের কথা শোনা সম্ভব হচ্ছে না। সামনের সেশনগুলোতে সবার কথাই শোনা হবে]
- তাদের বলুন যে আজকের আলোচনার মূলে থাকবে জেন্ডার ভূমিকা, প্রতিটি সমাজে নারী ও পুরুষ যেসব ভূমিকা, কাজ ও দায়িত্বপালন করে সে সম্পর্কে। আরও শেখার জন্য তাদের আজকের সেশনে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে
- পোস্টার-৪ উপস্থাপন করুন যেখানে কিছু ভূমিকা/কাজ/দায়িত্বের উল্লেখ আছে যা ঘরে ও বাইরে সংঘটিত হয় এবং অংশগ্রহণকারীদের নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে বলুন :
  - বাড়ির ভেতরে ও বাইরে কে কোন্ কাজ করে?
  - কখন বাড়ির বাইরে এই ভূমিকাগুলো পালন বা কাজগুলো করা হয়?
  - কোন্ কাজগুলো তোমরা 'কাজ' বলে মনে কর আর কোনগুলো নয়?
  - এগুলোকে 'কাজ' না মনে করার কারণ কী?
  - এসব কাজ বা ভূমিকার সাথে কোনো জৈবিক সংযোগ আছে কি?
  - তোমরা বাড়িতে মা/বোন আর বাবা/ভাইদের কী কী কাজ করতে দেখো?
  - তোমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কী কী কাজ কর?

    (মেয়ে-ছেলে সবার কাছ থেকেই উত্তর নিন)
  - কোন্ কোন্ কাজ নারীরা করতে পারে না বলে তোমাদের মনে হয়? আর পুরুষরা কী কী করতে পারে না?

    [তাদের ২০ মিনিট সময় দিন উত্তর দেবার জন্য]

- প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকে জেন্ডার ভূমিকা নিয়ে আলোচনায় অংশ নিতে বলুন এবং সহায়কের জন্য তথ্যের সাহায্য নিয়ে আলোচনায় সহায়তা করুন
- আলোচনা শেষে কয়েকজন মেয়ে ও ছেলেকে ভূমিকাভিনয়ে অংশ নেবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। যারা অংশ নিতে আগ্রহী তাদের ডাকুন
- নাটিকাটির বিষয় সম্পর্কে তাদের বলুন এবং ১০ মিনিট সময় দিন তৈরি হতে। অংশগ্রহণকারীরা দু'ভাগে একটি নাটক করবে পারিবারিক একটি ঘটনার ওপর। প্রথম ভাগে থাকবে সমাজের মেয়ে/নারী এবং ছেলে/পুরুষের প্রতি প্রত্যাশিত ভূমিকার ওপর। দ্বিতীয় ভাগে থাকবে ভূমিকার রদবদল। এর মাঝে অন্যদের বলুন নাচ/গান/খেলা বা অন্য যা কিছু করতে যতক্ষণ দল তৈরি হচ্ছে
- ১০ মিনিট পরে অভিনয় শুরু হলে সবাইকে বলুন মনোযোগ দিয়ে দেখতে
- অভিনয়ের পরে অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন এই অভিনয় থেকে তারা কী বুঝেছে, দু'টি পরিবারে সদস্যদের ভূমিকার কী কী পার্থক্য আছে? ভূমিকাগুলো কি স্থির না পরিবর্তন করা যায়? কীভাবে পরিবার ভূমিকার বদলের ফলে লাভবান হতে পারে?
- তাদের বলুন যে আজকাল আমাদের সমাজে অনেক নারী চিকিৎসক, প্রকৌশলী, ব্যাংকার, খেলোয়াড়, শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চস্থানে রয়েছে। যদি জেন্ডার ভূমিকা স্থির হতো আর সারা পৃথিবীতে তা অপরিবর্তিত থাকত, তাহলে এসব সম্ভব হতো না। ভূমিকার সাথে জৈবিক কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না, বরং আছে ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, দক্ষতা এবং প্রেক্ষাপটের সংযোগ। ভূমিকা স্থির হতে পারে না, বরং আমরা আমাদের চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গি আর আচরণ পরিবর্তন করতে চাই না।
- সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে সেশন শেষ করুন।

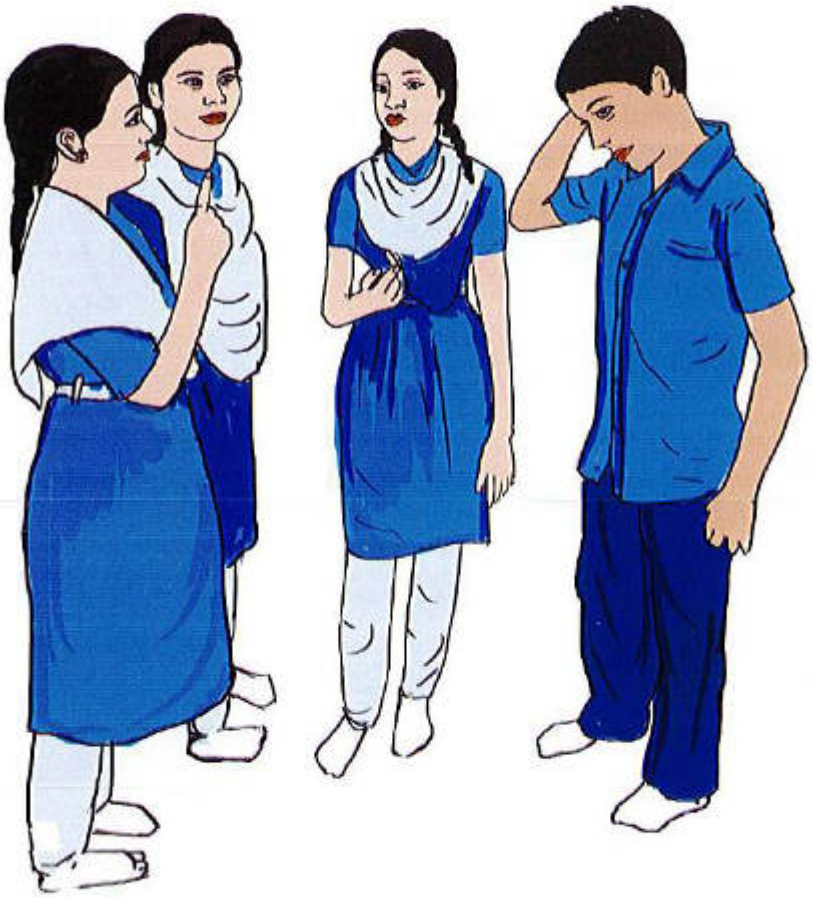

সহায়কের জন্য তথ্য

পোস্টার : ৪

ভূমিকা	ঘরে কে করে		বাইরে কে করে	
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
রান্না				
সন্তানের লেখাপড়া নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ				
কাপড় ও থালাবাটি ধোয়া				
রোগীর সেবা				
হাঁস-মুরগিকে খাবার দেয়া				
মাছ কাটা				
কাপড় সেলাই				
ব্যাংক বা ডাকঘরে যাওয়া				
স্কুলের বেতন দেয়া, বাচ্চাকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া				
মাছ ও তরকারির জন্য বাজারে যাওয়া				
উপার্জনের জন্য কাজে যাওয়া				

ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য দু'টি দৃশ্য :

১. একটি পরিবার। এখানে সদস্য হচ্ছেন- বাবা, মা, দাদী, একটি বড় মেয়ে এবং ছেলে। পরিবারটি ছেলের থেকে চিরাচরিত ভূমিকা আশা করে যে, সে উপার্জন করবে আর ভবিষ্যতে তাদের দেখবে। সে লেখাপড়া করবে এবং সবাই তার ইচ্ছাপূরণ করতে ব্যস্ত, তাকে যত্ন করে, তাকে পানি এগিয়ে দেয়, কাপড় ধুয়ে দেয়, সে কী খেতে চায় জিজ্ঞেস করে। পরিবার চায় বোনটি বাসায় সবসময় ভাইয়ের খেদমত করুক। পরিবারটি মেয়ের শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে রাজি নয়, তারা চায় না যে, সে বাইরে যাক। বরং চায় যে সে তার মা'কে ঘরের কাজ যেমন- ঘর গোছানো, রান্না করা, খাবারের পর ভাইয়ের থালাসহ সব থালা-বাটি ধোয়ায় সাহায্য করুক, মেয়েটির স্কুল থেকে দেয়া বাড়ির কাজের জন্য কোনো সময় নেই, সে তো আর চাকরি করে উপার্জন করবে না। তার ঠিকানা হচ্ছে শ্বশুর বাড়িতে ঘরের কাজ করা। দাদী এই ঐতিহ্যগত চিন্তার প্রতীক এবং তার মেয়ে ও ছেলেদের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ সমাজে জেন্ডার ভূমিকার ক্ষেত্রে রীতি ও প্রত্যাশাকেই বহন করে।

২. এই পরিবারেও একটি ছেলে ও একটি মেয়ে আছে। মা-বাবা দু'জনকেই লেখাপড়া করান কারণ তারা শিক্ষার অনেক মূল্য দেন। সন্তান ছেলে না মেয়ে তাদের কাছে কোনো বিষয় নয়। ভাইয়ের মতোই মেয়েটি বাইরে যেতে পারে, নিজের জীবনধারণ ও ভবিষ্যতে মা-বাবার যত্ন করতে পারে। সে যেই ছেলেটিকে ভালোবাসে, যে তাকে ভালোবাসে ও তার সিদ্ধান্তকে সম্মান করে, তাকে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এই পরিবারটিতে বাড়িতে সবাই সব কাজ করে এবং গৃহস্থালি কাজ ভাগাভাগি করে নেয়। তারা মনে করে যে, যদি কোনো পুরুষ রেস্তোরাঁয় রান্না করতে পারে, তার মানে এটাই স্থির নয় যে পুরুষরা ঘরে রান্না করতে পারবে না বা করা উচিত হবে না। যদি কোনো নারী বাইরে কাজ করে, আয় করে এবং পরিবারের দায়িত্ব নেয় তার স্বামী বা পরিবারের পুরুষ সদস্যের অনুপস্থিতিতে, তবে কেন এই দৃষ্টিভঙ্গিটার পরিবর্তন হবে না যে, নারীরা বাইরে কাজ করতে বা আয় করতে পারবে না?

জেন্ডার ভূমিকা

সমাজে নারী ও পুরুষ যেসব ভূমিকা পালন করে সেগুলোকে জেন্ডার ভূমিকা বলা হয়। সমাজ প্রত্যাশা করে যে নারী ও পুরুষ ভিন্ন ভূমিকা পালন করবে যা সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত ও বর্ণিত।

জেন্ডার ভূমিকার ধরন/বিভাগ

ভূমিকাগুলো তিন ধরনের কাজে বিভক্ত। নারীরা এই তিন ধরনের কাজেই যুক্ত।

উৎপাদনমূলক ভূমিকা

এই ধরনের ভূমিকায় আছে বিক্রি ও ভোগ করার জন্য দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন, যেমন- কৃষিকাজ, মাছ ধরা, বেতনভুক্ত এবং আত্মকর্মসংস্থান। উৎপাদনশীল কাজ তখনই স্বীকৃতি পায় যখন এর থেকে মজুরি আসে বা আয় হয়। নারীদের চাইতেও পুরুষের এই উৎপাদনমূলক কাজকে বেশি মূল্যায়ন করা হয়, কারণ পৃথিবীর অনেক স্থানেই এখনও নারীদের এই কাজগুলো অবৈতনিক এবং অস্বীকৃত।

পুনরুৎপাদনমূলক ভূমিকা

সন্তানধারণ ও পালন, রান্না, ঘর পরিষ্কার, পরিবারের সদস্যদের সেবা, বাজার করা, পানি আনা, লাকড়ি আনা, গৃহের দেখাশোনা করা- এর সবই পুনরুৎপাদনমূলক ভূমিকা যা মানুষের বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত বেশিরভাগ দেশে এসব কাজের কোনো আর্থিক মূল্য নেই। অতএব, সমাজে এসব কাজের স্বীকৃতিও কম এবং আশা করা হয় যে, এই কাজ বা ভূমিকাগুলো শুধু নারী আর মেয়েরাই পালন করবে।

কমিউনিটি/সামাজিক ভূমিকা

আর্থিক লাভ ছাড়া কমিউনিটির উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য যেসব ভূমিকা পালন করা হয় আর সেগুলোকে কমিউনিটি/সামাজিক ভূমিকা বলা হয় যেমন- কমিউনিটিকে রাস্তা বা সেতু নির্মাণে সাহায্য করা, বিয়ে বা জন্ম বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে সহায়তা, আয়োজন করা ও অংশ নেয়া, বিদ্যালয়, ধর্মীয়কেন্দ্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া, নির্বাচনে অংশ নেয়া। আগে শুধু পুরুষরাই এসব ভূমিকা পালন করত। এখন নারীরাও করছে। তবে অনেক সমাজে এগুলো এখনও পুরুষের কাজ হিসেবেই পরিচিত।

- কোনো মানুষ নির্দিষ্ট দায়-দায়িত্ব নিয়ে জন্মায় না। বরং সমাজ আমাদের বলে দেয় ছেলেদের ভূমিকা কী হবে আর মেয়েদের ভূমিকা কী হবে। সেজন্য আমরা শিশুকালে মেয়েদের দেই পুতুল আর হাঁড়িপাতিল এই ভেবে যে, তারা সন্তান লালন-পালন করবে এবং ভবিষ্যতে গৃহস্থালি কাজ করবে। অন্যদিকে ছেলেদের দেয়া হয় গাড়ি/প্লেন/বাস/ট্রাক যেহেতু তারা চালক এবং পাইলট হবে। এই খেলনাগুলো হচ্ছে আমাদের বিশ্বাসের প্রতীক- আমরা সমাজে নারী ও পুরুষকে কোন ভূমিকায় আশা করি। একইভাবে ছেলেদের মতো মেয়েরা শিক্ষায় অগ্রাধিকার পায় না, ছেলেদের চিন্তা করা হয় উপার্জনকারী হিসেবে তাই তার শিক্ষা প্রয়োজন, সংসার চালাতে চাকরি পেতে হবে বলে। এদিকে মেয়েরা বিয়ে করবে, ঘরে থাকবে, তাই তাদের লেখাপড়ার দরকার নেই কারণ তাদের চাকরি করতে হবে না। তাদের দরকার শুধু কীভাবে ভালো বউ হওয়া যায় এবং ঘর সামলানো আর দেখাশোনা করা যায় সে ব্যাপারে সচেতন হওয়া। যেমন- খাবার বানানো, বাচ্চা ও বড়দের যত্ন নেয়া, মা'কে ঘরে সাহায্য করা, শ্বশুরবাড়ির মানুষদের আপ্যায়ন করা ও দেখাশোনা করা ইত্যাদি। তাছাড়া, নারীরা যেহেতু সন্তান ধারণ করে, জন্মদান করে ও স্তন্যপান করায়, তাই গভীরভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, বাচ্চা লালন ও খাওয়ানোই হচ্ছে নারীর একমাত্র দায়িত্ব, সেই সাথে বাড়ির বয়স্ক মানুষদের যত্ন নেয়াও
- নারী ও পুরুষ যেভাবে কাপড় পরে- নারীরা পরে শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ, স্কার্ট ইত্যাদি, যা তাদের চলাফেরায় বাধা দেয় ও সমস্যার সৃষ্টি করে
- সমাজ নারী ও পুরুষের মধ্যকার দায়-দায়িত্ব ও ভূমিকার মধ্যে এই পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। এই পার্থক্য নারী ও পুরুষের ভবিষ্যৎ পেশাকেও প্রভাবিত করে। সমাজের প্রত্যাশাকে অনুসরণ করে নারী ও পুরুষ জৈবিক পরিচয়ের বাইরে সামাজিক পরিচয় পায়

- কোনো কাজ বা ভূমিকা জৈবিকভাবে পূর্ব-নির্ধারিত হওয়া উচিত নয়; তা হওয়া উচিত ব্যক্তির দক্ষতা ও সক্ষমতার ওপর। প্রতিটি মানুষ জন্মায় কিছু গুণ নিয়ে এবং কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই যে, মানুষের গুণ তার জৈবিক পরিচয়ের ওপর নির্ভর করে। আমাদের উচিত ব্যক্তিকে সম্মান করা, মানুষ হিসেবে তার গুণকে, যে জন্মেছে একজন নারীর গর্ভ থেকে

- যদি নারী ও পুরুষ একই বাড়িতে বসবাস করে, একই খাবার খায়, সন্তান জন্ম দেয়, তবে কেন শুধু নারীই বাড়ির দেখাশোনা, রান্না করা এবং বাচ্চার দেখাশোনা করবে? অন্যদিকে, যদি আমরা একমত হই যে, সংসার দেখাশোনার ভার নারী-পুরুষ উভয়ের, তাহলে কেন শুধু পুরুষরা পরিবারের জন্য আয় করবে এবং সিদ্ধান্ত নেবে? নারীও পরিবারের আয়ে অবদান রাখতে পারে এবং দু'জনেরই সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আয় ও ব্যয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত

- নারীরা সন্তানদের স্তন্যপান করায় বলে মনে করা হয় যে, এটাই তাদের একমাত্র দায়িত্ব এবং এটি বাইরের জগতে নারীর অন্যান্য ভূমিকা পালনের সুযোগ কমিয়ে দেয়। তবে, বাচ্চারা বাইরের দুধ ও স্বাভাবিক খাবার খেতে পারে ছয় মাস পরে, তখন বাবা বা পরিবারের কেউ বাচ্চার দেখাশোনা করতে পারে মা'কে কিছুটা সময়ের ছাড় দেবার জন্য। আজকাল আমাদের সমাজে অনেক নারী বাইরে কাজ করছে, বিভিন্ন পেশায় জড়িত হচ্ছে এবং মাতৃত্বকালীন ছুটি ভোগ করছে, যা কর্মজীবী মায়েদের সন্তান হবার পর চাকরি চালিয়ে যাবার জন্য একটি সাধারণ কৌশল হিসেবে কাজ করছে

- বাংলাদেশের নারীরা শুধুই গৃহবধূর ভূমিকা পালন করছে না, তারা আজ আর শুধুই শিক্ষিকার চাকরি করছে না, তারা হিমালয় পর্বতেও উঠছে (নিশাত মজুমদার, ওয়াসফিয়া নাজরিন), তারা বিমান চালক, তারা ট্রেন ও গাড়ি চালায়, তারা ব্যাংকার, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, স্থপতি, বিজ্ঞানী, উকিল এবং তারা উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনার পদে আছেন ব্যবসায়িক এবং কর্পোরেট দপ্তরে, তারা আছে সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে, আছে রাজনীতিতে, আছে নেতৃত্বে- তৃণমূল থেকে সরকারের উর্ধ্বতন পর্যায় পর্যন্ত। তাই এটা আর বলা চলে না যে, শুধু পুরুষ হচ্ছে নেতা আর সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং পরিবার, সমাজ, অর্থনীতি এবং রাজনীতিতে সিদ্ধান্ত নেবার সক্ষমতা শুধু তাদেরই আছে

- শুধু ছেলে বা পুরুষদেরই সিদ্ধান্ত নেবার, সম্পদের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, দক্ষতা এবং অধিকার নেই, মেয়েদেরও এসবের অভিজ্ঞতা থাকা দরকার মানুষ হিসেবে, মেয়ে বা নারী হিসেবে বৈষম্যের শিকার না হয়ে। 'সেক্স'-এ পার্থক্য থাকলেও ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই অধিকার আছে নিজেদের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য সুযোগের ব্যবহার করার, জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়াবার, পছন্দ অনুযায়ী বেছে নেয়া আর কাজ করার ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলার।

অধিবেশন ১.৫.১ বেড়ে উঠি ভিন্নভাবে : সামাজিকীকরণের মধ্য দিয়ে

উদ্দেশ্য

- কীভাবে একটি মেয়ে নারী আর একটি ছেলে পুরুষ হয়ে ওঠে এবং কীভাবে তারা সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ায় জীবনের নানা পর্যায়ে ভূমিকা পালন করে সেটা বোঝা

পদ্ধতি

আলোচনা, মুক্তচিন্তার ঝড়, দলীয় কাজ

উপকরণ

পোস্টার কাগজ, কলম

সময়

৪৫ মিনিট

প্রক্রিয়া

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন দলীয় কাজ করার জন্য ৪টি দলে ভাগ হতে। প্রতিটি দলে মেয়ে-ছেলে মেশানো থাকবে, প্রতিটি দল চিন্তা করে বের করবে যে মানুষ জীবনের কোন ধাপে কীভাবে বুঝতে পারে যে, তারা মেয়ে বা নারী এবং ছেলে বা পুরুষ এবং পোস্টার কাগজে লিখে উপস্থাপন করবে :

  দল ১- শৈশবকাল (বয়ঃসন্ধিকালের আগ পর্যন্ত)

  দল ২- বয়ঃসন্ধিকাল

  দল ৩- প্রাপ্তবয়স্ক হবার শুরুর দিকে

  দল ৪- প্রাপ্তবয়স্ক কাল

  [তাদের বলুন আমরা বাংলাদেশের সমাজকে মাথায় রেখে কাজটি করব]

- সকল দলের কাজ শেষ হয়ে যাবার পরে দলগুলো একজনকে নির্বাচন করবে দলীয় কাজ উপস্থাপনার জন্য, বাকিরা আলোচনার সময় তাকে সাহায্য করবে। প্রতিটি উপস্থাপনার পরে প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকে জিজ্ঞেস করুন কেউ বিশেষ বয়সে বা পর্যায়ে কোনো কিছু যোগ বা পরিবর্তন করতে চায় কিনা

- উপস্থাপনা শেষ হলে পরে অংশগ্রহণকারীদের বলুন যে জন্মের পর থেকে মেয়ে ও ছেলেদের বড় করা হয় পৃথক সামাজিক রীতি অনুসারে। এসব পার্থক্য আরও বড় হয় বেড়ে ওঠার সময়ে যেমনটি তাদের আলোচনা ও দলীয় কাজ উপস্থাপনায় এসেছে। যে প্রক্রিয়ায় বা উপায়ে মেয়ে-ছেলেরা এসব সামাজিক রীতি শেখে ও আত্মস্থ করে এবং সেই অনুযায়ী আচরণ করে তাকে বলা হয় সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায়, একটি মেয়ে নারী হয়ে ওঠে এবং একটি ছেলে পুরুষ। প্রতিটি মানুষকেই এই সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয় তার সমগ্র জীবনচক্রে। [সামাজিকীকরণ এবং মেয়ে ও ছেলেদের জন্য ভিন্ন রীতির ওপর আলোচনাটি চালিয়ে যান সহায়কের জন্য তথ্য এবং অংশগ্রহণকারীদের উপস্থাপনার সাহায্যে]

- আলোচনার পরে অংশগ্রহণকারীদের বলুন তারা এখন জানে যে, কীভাবে মেয়ে-ছেলেরা এসব রীতি আত্মস্থ করে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে। তাদেরকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর জিজ্ঞেস করুন :

- তোমাদের কি মনে হয় এসব রীতি স্থির এবং মেয়ে বা নারী এবং ছেলে বা পুরুষের জন্য ঠিক আছে?
- এসব রীতি কি মেয়ে ও ছেলে এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে?
- এগুলোকে কি চ্যালেঞ্জ করা উচিত? কীভাবে?
- কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আজকাল এসব পার্থক্য কমে আসছে এবং রীতির পরিবর্তন হয়েছে?
- এসব পরিবর্তনের পেছনে কারণ কী কী?

- আলোচনার ইতি টানুন এই বলে যে পরের অধিবেশনে তারা শিখবে এই সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কারা ভূমিকা পালন করে।

সহায়কের জন্য তথ্য

সামাজিকীকরণ- একটি প্রক্রিয়া যা দ্বারা সামাজিক রীতি, ভূমিকা এবং প্রত্যাশাকে শেখা হয় এবং আত্মস্থ করা হয়। শিশুরা ভূমিকা গ্রহণের মাধ্যমে বড়দের থেকে দৃষ্টিভঙ্গি আত্মস্থ করে।

সামাজিক রীতি ও সংস্কৃতি

প্রতিটি সমাজই প্রত্যাশা করে যে, তার সদস্যরা কেমন আচরণ করবে এবং কেমনটি করবে না। রীতি হলো আচরণের নির্দেশাবলি। প্রতিটি সমাজ নিজস্ব আচরণের নিয়ম তৈরি করে এবং কখন এগুলো ভঙ্গ হয় এবং সেজন্য কী করা হবে সেটা ঠিক করে। এসব রীতি স্থির নয়, এসব বিভিন্ন সমাজে, পরিস্থিতি থেকে পরিস্থিতিতে এবং সময় থেকে সময়ে পরিবর্তিত হয়।

যেমন–

আমরা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যে পোশাক পরে যাই বা যে আচরণ করি সেটা বিয়ে বা জন্মদিনের অনুষ্ঠানে পরি না বা একই রকম আচরণ করি না (পরিস্থিতি থেকে পরিস্থিতিতে আলাদা)।

বাংলাদেশে সবাই চায় বিয়ের কনে কাঁদবে এবং লাজুকভাব দেখাবে, কিন্তু পশ্চিমের সমাজে এটি খুবই স্বাভাবিক যে কনে হাসবে এবং অনুষ্ঠানে আনন্দ করবে (সমাজ থেকে সমাজে আলাদা)।

আগে শুধু পুরুষরাই গাড়ি চালাত; কিন্তু আজকাল মেয়েরাও চালক হয় (সময় থেকে সময়ে আলাদা)।

'সংস্কৃতি' হচ্ছে জীবনযাপনের ধারা। কীভাবে কী হবে সংস্কৃতি তা ঠিক করে দেয়। এর মধ্যে রয়েছে, মূল্যবোধ (সমাজ আমাদের বলে কোন্‌টা ঠিক/আকাঙ্ক্ষিত এবং কোন্‌টা সঠিক নয়/অনাকাঙ্ক্ষিত), বিশ্বাস (যেমন- ধর্মবিশ্বাস) এবং বস্তুগত জিনিস। কোনো একটি সামাজিক দলের আচার, আচরণ, কর্মকাণ্ড, খাবার, পোশাক, শিল্প এবং সাহিত্য তাদের সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে। অনেক সময় ক্ষমতাবান দল তাদের ইচ্ছানুযায়ী সংস্কৃতির ব্যাখ্যা দেয়, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সংস্কৃতির পিতৃতান্ত্রিক ব্যাখ্যা এমনভাবে দেয়া হয় যেন পুরুষ নারীর ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

সমগ্র জীবনচক্রে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া : মেয়ে/নারী ও ছেলে/পুরুষের মধ্যে বিভেদ গড়ে তোলা

শৈশবকাল : বিভেদের শুরু

জন্মের পর একটি মেয়ে ও ছেলে শিশু ভিন্নভাবে বেড়ে ওঠে। বাংলাদেশে অনেক পরিবারে যখন ছেলের জন্ম হয় তখন তাকে স্বাগত জানানো হয় আজান, উলুধ্বনি দিয়ে এবং পরিবারের সদস্যরা খুশি হয় ও মিষ্টি বিতরণ করে জন্মের সংবাদে। মেয়ের জন্মানো গ্রহণ করা হয় কোনোরকম খুশি বা আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই। এর প্রধান কারণ হচ্ছে ছেলেরা পরিবারের উত্তরাধিকার হয় এবং মেয়েরা বিয়ের পরে অন্য পরিবারের সদস্য হয়ে যায়।

মেয়ে ও ছেলেদের আলাদা নাম দেয়া হয়, আলাদাভাবে কাপড় পরানো হয়। মেয়ে ও ছেলেদের জন্য আলাদা ঘুমপাড়ানি গানও আছে। ছেলেরা বীর ও রাজাদের গল্প শুনে বড় হয়, যে বড় বড় নগর ও রাজ্য জয় করে। অন্যদিকে মেয়েরা শোনে রূপকথা, যেখানে সুন্দরী রাজকন্যা রাজার মৃত্যুর পরে দুঃখে জীবন পার করে, তাকে রাক্ষস অপহরণ করে, পরে সে সুপুরুষ রাজপুত্রকে বিয়ে করে বা কোনো রাজপুত্র তাকে উদ্ধার করে। শেষপর্যন্ত সে সুখে জীবন কাটায়।

মেয়ে ও ছেলেরা আলাদা খেলনা পায় খেলবার জন্য। গাড়ি, প্লেন, বন্দুক বা পিস্তল, বল, ব্যাট ছেলেদের দেয়া হয় এবং তারা ফুটবল, ক্রিকেট খেলে ঘোরাঘুরি করে, বন্দুক দিয়ে খেলে এবং পুলিশ বা সেনা সাজে শত্রু ধ্বংস করতে। মেয়েরা অন্যদিকে ব্যস্ত থাকে পুতুল নিয়ে খেলায়, ঠিক মায়েরা যেমন করে সন্তানদের যত্ন করে, পুতুলের বিয়ের আনন্দ করে বা মা অথবা পরিবারের নারী সদস্যরা রান্নার সময় যেমনটি করে, সেটা অনুকরণ করে।

যখন ছেলে শিশু ব্যথা পায় বা রাগ করে কিংবা খিদে পায় কিংবা সমস্যায় পড়ে তখন কাঁদতে থাকে, তখন তাকে শেখানো হয় যে, ছেলেরা শক্তিশালী এবং তাদের কাঁদতে নেই, তারা লড়াই করে। কিন্তু যখন একটি মেয়ে শিশু কাঁদে তখন তাকে বলা হয় নিঃশব্দে কাঁদতে, ধৈর্য ধরতে, মুখ বুজে ব্যথা সহ্য করতে এবং যে ব্যথা দেবে তার সাথে লড়াই না করতে।

এভাবে প্রথম থেকেই মেয়েরা জানে যে তাদের ধৈর্যশীল হতে হবে, বাড়ির ভেতরে থাকতে হবে এবং অপেক্ষা করতে হবে পুরুষদের জন্য যারা তাদের জীবন ও বেঁচে থাকার সিদ্ধান্তের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে। অন্যদিকে ছেলেরা সবসময় এই শিক্ষাই পায় যে, তাদের শক্তিশালী হতে হবে অন্যদের বাঁচাতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে সাথে পরিবারের হাল ধরে রাখতে। আসলে মেয়েদেরকে যে গৃহবধূ এবং ছেলেদের উপার্জনকারী হিসেবে ভাবনা থেকেই এগুলো এসেছে।

বয়ঃসন্ধি বা কৈশোরকাল : বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করা

১০ থেকে ১৯ বছর সময় হচ্ছে বয়ঃসন্ধিকাল। এ সময়ে মেয়ে ও ছেলেরা অনেক বড় রকমের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। তারা বড়দের ভূমিকা অনুসরণ করতে থাকে এবং বিদ্যমান সামাজিক রীতি আত্মস্থ করার মধ্য দিয়ে সমাজের প্রত্যাশাকে বহন করতে থাকে।

বয়ঃসন্ধিতে পড়ার সাথে সাথে মেয়েরা অনেক রকম বিধিনিষেধের মুখে পড়ে। তাদের চলাফেরা, বন্ধুত্ব করার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ছেলেদের সাথে, বাধার মুখে পড়ে। তাদের ছেলেদের সাথে বাইরে খেলতে বাধা দেয়া হয়, যদিও সেই ছেলেরা তাদের পরিচিত বা আত্মীয় হোক না কেন। মেয়েদের শেখানো হয় 'ভালো' মেয়ে হতে তারা যেন অপরিচিত ছেলেদের সাথে কথা না বলে, চলাফেরা না করে এবং সময় না কাটায়। কিছু পরিবার আছে যারা মেয়েদের দলগতভাবে ছেলেদের সাথে কথা বলা বা যাবার অনুমতি দেয় না সাথে অন্য মেয়েরা থাকলেও। এর পেছনে কারণ হলো 'আমাদের সমাজে' (বাংলাদেশ), যেসব মেয়েরা ছেলেদের সাথে বন্ধুত্ব করে বা বেড়ায় তারা 'খারাপ' মেয়ে বলে বিবেচিত হয় এবং তাদের পরিবারও অভিযুক্ত হয় তাদেরকে এমন কাজে বাধা না দিয়ে বরং অনুমতি দেবার জন্য। এসব পরিবার অনেক সময় তিরস্কৃত হয় সমাজে কী করা যাবে আর কী করা যাবে না এ সম্পর্কে মেয়েদেরকে না শেখাবার জন্য। ছেলেরাও মেয়েদের সাথে ঘোরা বা কথা বলতে পারে না, তবে তারা মেয়েদের মতো এতটা বিধিনিষেধের সম্মুখীন হয় না এবং তাদের বদনাম হয় না এমন কাজের জন্য। মেয়ে ও ছেলেদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য নয় এবং এমন কাজ বাংলাদেশের গ্রামে একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

এই পর্যায়ে মেয়েদের শেখানো হয় যে তারা যেন সমস্যা, দুঃখ বা সহিংসতার শিকার হলে চুপচাপ থাকে এবং আওয়াজ না তোলে। পরিবারের বড় সদস্যরা যখন তাদের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেয় তখন তাদের সাথে কোনো তর্ক করা চলবে না কারণ পরিবার ভালো বোঝে তাদের জন্য কোনটা ভালো। তারা সবসময় শোনে যে 'ভালো' আর 'শান্ত' মেয়েরা হচ্ছে তারা যাদের ধৈর্য আর সহ্য ক্ষমতা আছে এবং তারাও নিজেদের আচরণ সেভাবে গড়ে তোলে।

ছেলেদের শেখানো হয় সাহসী হতে যেন তারা একা চলাফেরা করতে পারে, নিজেদের অধিকারের জন্য বা যারা তাদের আঘাত করতে চেষ্টা করবে তাদের বিরুদ্ধে লড়তে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বাইরে যাবার সময় ছোট কিশোররা কিশোরী মেয়ে বা বয়স্কা নারীর সাথে যায়। এ থেকে ছেলেদের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে যে, তারা মেয়ে বা নারীদের দেখে রাখতে এবং তাদের চলাফেরায় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে ছেলেদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় মেয়েদের তুলনায়। এর ফলে ছেলেদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগে এবং তারা উৎসাহিত হয় অন্যের সিদ্ধান্তকে বাতিল বা প্রত্যাখ্যান করে দিতে। পাশাপাশি তারা শিখে ফেলে যে, তারা যদি অপরকে তাদের (ছেলেদের) ইচ্ছাপূরণে চাপ দেয় সমাজে তা গৃহীত হবে।

মেয়েদের বাইরে বেশিক্ষণ থাকা বা অন্ধকারের পরে বাড়িতে ফেরার অনুমতি নেই। পরিবার মেয়েদের ওপর এটি চাপিয়ে দেয় এই চিন্তা করে যে, তারা যৌন, শারীরিক বা মানসিক আক্রমণের শিকার হতে পারে। এভাবে মেয়েদের ওপর শারীরিক আক্রমণের দায় তাদের ওপর বর্তায় কারণ সমাজ মনে করে এই সহিংসতা ঘটছে তাদের 'খারাপ আচরণের' জন্যই। যেমন- বাড়িতে দেরি করে ফেরা বা যথাযথভাবে আচরণ না করা। মেয়েদের শেখানো হয় চলাফেরা কমিয়ে, নিজেদের ঢেকে রেখে, চুপচাপ থেকে এবং ছেলেদের সাথে কোনো রকম সম্পর্কে না জড়ানোর মধ্য দিয়ে যথাসম্ভব কম সহিংসতার সম্মুখীন হতে। এ ধরনের চিন্তা মেয়েদের মধ্যে অপরাধবোধ, লজ্জাবোধ, কম আত্মবিশ্বাসের জন্ম দেয়, তাদেরকে হীনমন্য এবং কোনো রকম অপশক্তিকে প্রতিরোধ করতে অক্ষম করে তোলে।

অন্যদিকে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষরা ছোট ছেলেদের বাজারে বা অন্য জায়গায় নিয়ে যায় তার হয়ে সবকিছু জানা শোনা, দরকষাকষি করার জন্য এবং অন্যান্য সামাজিক ও কমিউনিটির সম্পর্ক ঠিক রাখার জন্য। সোজা কথায়, এমন পরিস্থিতিতে ছেলেরা সমাজে নিজেদের উর্ধ্বতন এবং শক্তিশালী ভাবে, যেখানে মেয়েরা সমাজে অধস্তন ও দুর্বল ভাবে এবং নিজেদের অধিকার চাইতে অক্ষম থাকে।

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের ওপর প্রত্যাশা থাকে যে, তারা লেখাপড়ায় মন দেবে যেন ভবিষ্যতে চাকরি করতে পারে এবং পরিবারের ভরণপোষণ করার জন্য আয় করতে পারে। তাদের এদেশের শ্রমশক্তির অংশ হিসেবে বিকশিত করার জন্য সব সুযোগ দেয়া হয়। তাদের 'লক্ষ্য' পূরণ করার জন্য ছেলেরা শিক্ষা, খাবার, পুষ্টি, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া (খেলা, বিতর্ক এবং গান) এসবে অগ্রাধিকার পায়। তারা শিখে যে ভবিষ্যতের উপার্জনকারী হিসেবে তাদের শক্তি ও ক্ষমতা আছে সেসব কাজ করতে পারার এবং এক্ষেত্রে তারা পরিবারের বা প্রতিবেশী পুরুষদের উদারহরণ হিসেবে নেয়। অন্যদিকে নারী সদস্যরা হীনতর এবং তারা পরিবারের ভরণপোষণ করতে বা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না- এমনটা ভাবা হয়। যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিবারের পুরুষ প্রধানের অবর্তমানে, বিশেষ করে মৃত্যু হলে বা ছেড়ে গেলে মা বা পরিবারের নারী সদস্যরা উপার্জনের দায়িত্বপালন করেন। তাই এসব ক্ষেত্রগুলোকে ব্যতিক্রম হিসেবে দেখা হয়। ব্যতিক্রম কোনো নিয়মের ভেতর পড়ে না।

মেয়েরা তাদের ভূমিকাগুলো সম্পর্কে শিখে পরিবারের নারীসদস্য, বৃহত্তর পরিবার বা প্রতিবেশীদের দেখে। তারা তাদের ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবনের জন্য প্রস্তুতি নেয়। তাদের শেখানো হয় ভালো বউ আর শান্ত হতে যে শ্বশুর বাড়ির সবার সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে, রান্না করে, সন্তানধারণ ও লালন করে, স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির বড়দের সেবা করে। একজন 'সুপাত্র' পাওয়া মেয়েদের সৌভাগ্যের প্রতীক, তার জন্য মেয়েদের সমাজের প্রত্যাশা অনুযায়ী ব্যবহার ঠিক করতে হয় এবং যথাযথভাবে আচরণ করতে হয়। ক্রমশ শিক্ষা ও পেশাগত উন্নয়ন তাদের জীবনে অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়, বদলে তারা সৌন্দর্যে এবং কীভাবে পছন্দনীয় কনে হতে পারবে তাতে মন দেয়। অনেক মেয়ে উচ্চতর শিক্ষা নেবার সুযোগ পায় না এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকেই ঝরে পড়ে এবং তাদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। যেসব মেয়ে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ পায় তাদের বাবা বা পরিবারের পুরুষ সদস্যরা ঠিক করে সে কোথায় পড়েবে, কী পড়বে। অনেক সময় মেয়েদের উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা 'ভালো' পাত্র পাবার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, যেহেতু সমাজ চায় যে ছেলেরা অবশ্যই মেয়েদের চাইতে 'যোগ্যতায়' বেশি থাকবে।

বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের পরিসর ছোট হয়ে আসতে থাকে, কিন্তু ছেলেদেরটা বাড়তে থাকে। চলাফেরায় বাধা আর সীমিত মেলামেশা তাদের উন্নয়নের সুযোগের পথ বন্ধ করে দেয়, তাদেরকে ঠেলে দেয় অভ্যন্তরীণ পরিমণ্ডলে এবং সমাজ প্রত্যাশিত নারী পরিচয় ধারণ করতে। অন্যদিকে, ছেলেদের জন্য নব সুযোগ উন্মুক্ত হয়, জীবন চালাতে আয় করার ক্ষমতার বৃদ্ধি এবং বাইরের জগতে অংশ নেবার মধ্য দিয়ে তাদের পুরুষ পরিচয়টি তৈরি হয়, কারণ তারা জানে যে সবসময়ে তাদের পরিবারে মা, বোন, স্ত্রীরা আছে, যারা তাদের সংসার দেখাশোনা করে, সন্তানধারণ ও লালন করে এবং তাদের জন্য রান্না করে ।

প্রাপ্তবয়স্ক হবার শুরুর দিকে : প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন

বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে বেশিরভাগ নারীর এই পর্যায়ে পৌঁছানোর আগেই বিয়ে হয়ে যায়। যদিও অপ্রাপ্ত বয়সের বিয়ে (বাল্যবিবাহ) আইনত অপরাধ, কিন্তু এটি বহুল প্রচলিত। তাই মেয়েরা একজন ভালো স্ত্রী আর ছেলের বউ হবার জন্য বয়ঃসন্ধিকাল থেকে যা শিখেছে তা ব্যবহার করে। তারা শেখে নিজেদের স্বপ্ন আর ইচ্ছাকে পেছনে ফেলে কীভাবে স্বামী-স্ত্রী, মা-সন্তান এবং শ্বশুর-শাশুড়ি এই সম্পর্কগুলোকে রক্ষা করতে হয়। শুধু মা, বোন, স্ত্রী পরিচয় গ্রহণ করে তারা বাইরের জগতে অন্য পরিচয় তৈরির সুযোগকে বাদ দেয়। তারা শেখে একটি বাড়িতে থাকতে গেলে বুদ্ধি নয়, বরং ধৈর্য, সহ্য, বিনয়, নম্রতা, সেবার মনোবৃত্তি অনেক বেশি দরকার। তাই তারা বুদ্ধি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত পরিসরে নানান চিরাচরিত সম্পর্ক বজায় রাখে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। নয়; কারণ এসব কাজের যেহেতু কোনো বেতন নেই তাই কাজ হিসেবে কখনোই মূল্যায়িত হবে না। যদি কোনো নারী লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে এবং চাকরির বাজারে প্রবেশ করতে পারে, আশা করা হয় যে সে সেসব কাজই করবে যা সমাজ নারীদের জৈবিক বৈশিষ্ট্যের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে আগে থেকেই সামাজিক রীতি হিসেবে ঠিক করে রেখেছে যেমন- শিক্ষিকা, সেবিকা ও যত্নকারী/তত্ত্বাবধায়ক।

একজন নারী বুঝতে পারে যে সে একজন পুরুষের চাইতে হীন এবং কম মূল্যায়িত, যখন একটি মেয়ের পরিবারকে বিয়ের অংশ হিসেবে পাত্রের পরিবারকে যৌতুক দিতে হয়। সমাজের অলিখিত নিয়ম হিসেবে যৌতুকের অংক মেয়ের বয়সের সাথে বাড়ে। কম যৌতুক দেবার জন্য পরিবার মেয়েদেরকে অল্প বয়সে বিয়ে দেয়। আরেকটি বিষয় হলো 'সৌন্দর্য'। কেননা মেয়ে যত কম সুন্দর হয়, পাত্রকে তত বেশি যৌতুক দিতে হয়। বয়স ও রূপ মেয়েদের বিয়ের বাজারে বিক্রির মূল্য নির্ধারণ করে আর এগুলো বিবাহিত জীবনের জন্য পূর্বশর্ত। যৌতুক সমাজে বাধ্যবাধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ মেয়েদের তার নিজের পরিবারেই বোঝা মনে করা হয়, যে কিনা সংসারে আয় করতে পারবে না বা তার পরিবারে কোনো অর্থনৈতিক মূল্য যোগ করতে পারবে না। এমনকি কর্মজীবী নারীর আয় বিয়ের আগে সঞ্চিত হয় তার বিয়ের সময় যৌতুক দেবার জন্য। অনেক সময় বিয়েতে মেয়েদের সম্মতিও নেয়া হয় না। এতে আরও বোঝা যায় যে, তার কোনো মতামত থাকতে নেই বা অন্য কথায় তার মতামতের কোনো দাম নেই, এমনকি তা তার সারা জীবনের সুখের সাথে জড়িত হলেও।

নারীর জীবনের প্রতিটি স্তরে- শিক্ষা হোক, পেশাগত জীবন আর মাতৃত্ব সকল ক্ষেত্রে তার আগ্রহ বা সম্মতির কথা কেউ জানতে চায় না। বেশিরভাগ সময় সিদ্ধান্ত নেয় পরিবারের প্রধান, সেটা সাধারণত হয় বাড়ির সবচাইতে প্রবীণ সদস্য, সেটা পুরুষ হতে পারে, আবার নারীও হতে পারে।

পুরুষরা এই পর্যায়ে ভবিষ্যতের নেতৃত্বের ভূমিকার সাথে পরিচিত হতে থাকে। তাকে শিখতে হয় কীভাবে পরিবারের কর্তৃত্বকারী পুরুষ সদস্য হওয়া যায় (বাবা, ভাই, স্বামী) এবং নিজেকে বিভিন্ন পেশায় প্রতিষ্ঠিত করতে যা দেশ গড়ার জন্য বা সমাজের রীতিকে জিইয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন। যেমন- বিচারক, উকিল, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, ধর্মগুরু, ব্যাংকার, অধ্যাপক, শিক্ষক, লেখক, সাংবাদিক, সৈন্য, পাইলট, রাজনৈতিক নেতা, আমলা এবং সরকারি প্রতিনিধি।

জৈবিক বা শারীরিকভাবে নারী সন্তানধারণ করতে পারে, তারপরও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের স্বামী বা শ্বশুর-শাশুড়ির সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয় পরিবার পরিকল্পনার বিষয়ে। এভাবে, তারা তাদের স্বামী বা সঙ্গীকে নিজের শরীরের এবং যৌন ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণ নিতে দেয়। প্রজনন বা মৌলিক স্বাস্থ্যসুবিধা নিতে নারী নির্ভরশীল স্বামী বা পরিবারের অন্য সদস্যদের ওপরে। যদিও সে সন্তানধারণ ও লালন করে, কিন্তু সে সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। তার বয়ঃসন্ধিকালে তাকে যেমন করে বড়দের সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে বলা হয়েছিল, এখন নিজের সন্তানের বেলাতেও তাই হচ্ছে। এছাড়াও, বেশিরভাগ নারী আয় করেন না, তাই কিছু কিনতে বা খরচ করতে হলে তাদের পুরুষের অনুমতি নিতে হয়। এর সাথে যোগ হয় তার চলাফেরার সীমাবদ্ধতা যা সম্মানজনক মানবজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য, যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কাজ, এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনিসংক্রান্ত তথ্য পাবার পথে মূল বাধা হিসেবে কাজ করে।

ছেলেরা কর্তৃত্ব করতে শুরু করে ঘরের বিষয়ে, যেমন সিদ্ধান্ত নেয়া এবং সম্পদের ওপরে নিয়ন্ত্রণ রাখা। এমন কর্তৃত্বপরায়ণ ভূমিকা পালন করতে গিয়ে ছেলেরা মনে করে যে তারা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা যে কোনো কাজে চাপিয়ে দিতে পারবে। এটি শেষপর্যন্ত ছেলেদের নিঃশর্তভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে শেখায় পরিবারের অন্য সদস্যদের, বিশেষ করে নারীদের ওপর। বিনয় ও নম্রতা মেয়েদের জন্য উপযুক্ত ও গ্রহণীয় শব্দ। যদি কোনো পুরুষ স্ত্রীর মতামত নেয় এবং স্ত্রীকে সাহায্য করে তাহলে সে 'মেয়েলি বৈশিষ্ট্যের' অধিকারী এবং সে 'আসল পুরুষ' নয় বলে বিবেচিত হয়। এভাবে, পুরুষ সবসময়ই শেখে কর্তৃত্বপরায়ণ ভূমিকা নিতে এবং নারীদের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে, যেন সমাজের অন্যরা তাকে খারাপ কথা বলতে না পারে।

প্রাপ্তবয়স্ক

নারীদের কাছে প্রত্যাশা করা হয় যে, তারা সম্পদ আর সম্পত্তির মালিকানা নিতে শিখবে না। যদিও সে জীবনের সমস্তটা সময় ব্যয় করে ঘরের ভেতর। ঘর সংসার দেখাশোনা করে, কিন্তু সে কখনই ঘর বা বাড়ির মালিক হতে পারবে না। কোনো বাড়ি তার নিজের নয়; সে বিয়ের আগে তার বাবা বা ভাইয়ের বাড়ি থাকে, বিয়ের পরে স্বামীর বাড়ি এবং যখন সে বুড়ো হয়ে যায়, তখন সে ছেলের বাড়ি থাকে। গ্রামাঞ্চলে মেয়েরা গবাদিপশুর মতো সম্পদের দেখাশোনা করে, তারা কৃষিকাজে বীজ বপন থেকে শুরু করে ফসল কাটা পর্যন্ত কাজ করে। কিন্তু এসব কাজ থেকে আয়ের কোনো অংশ তারা পায় না। এভাবেই বস্তুগত (জমি, পানি, গবাদিপশু) ও অবস্তুগত (সম্মান, উত্তরাধিকার, সুনাম) সম্পদ পুরুষদের নিয়ন্ত্রণে থাকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। এ ধরনের সামাজিক রীতি নারীকে বুঝিয়ে দেয় যে তাদের কোনো যোগ্যতা নেই এবং তারা আয় বা সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

সমাজ সবসময় ধর্ম বা চিরাচরিত প্রথাকে ব্যবহার করে নারীকে বিশ্বাস করাতে এবং মেনে নিতে বাধ্য করে যে পরিবারের সম্পত্তিতে তাদের অধিকার কম বা নেই এবং পুরুষদের অধিকার রয়েছে পরিবারের সমস্ত সম্পত্তি পাবার। তাই নারীরা কোনো রকম প্রশ্ন না করে পুরুষরা যতটুকু সম্পত্তি তাদের দেয় ততটুকুই মেনে নেয়। আশা করা হয় যে, বাবার বাড়িতে মেয়েরা সম্পত্তি ভাইকে দিয়ে যাবে; আর শ্বশুরবাড়িতে স্বামীই সম্পত্তি পাবে। মেয়েরা এগুলোকে চ্যালেঞ্জ করে না কারণ, কৈশোরে বা বয়ঃসন্ধিকালে সে শিখেছে যে পুরুষ ও পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যরা সিদ্ধান্ত দিলে তা চ্যালেঞ্জ করতে নেই কারণ এটা ধর্মে বলা আছে। ফলে, তারাও ধর্মের কথা তোলে না যখন পুরুষ বা দলবেঁধে মানুষ নারী ও শিশুদের ওপর সহিংসতা (যেমন- ধর্ষণ, অ্যাসিড নিক্ষেপ এবং হত্যা) করতে থাকে (যদিও সবাই জানে যে কোনো ধর্মেই সহিংসতার অনুমতি নেই)। নারীরা পরিবার ও সমাজে পুরুষের আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ মেনে নেয় এবং আত্মস্থ করে।

সামাজিক রীতির নামে নারী-পুরুষের জৈবিক পার্থক্যকে ভিত্তি করে অনেক পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুরুষরা মনে করতে শুরু করে যে মেয়েদের যৌক্তিকভাবে কাজ করার ক্ষমতা কম। তাদের নারীর দক্ষতা এবং কোনো কাজ করার যোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ থাকে। পুরুষেরা নারীদের এবং তাদের যোগ্যতার ওপর ভরসা করতে শেখে না এবং তাদের নিজেদের সমমানুষ হিসেবে বিবেচনাও করে না। নারীর প্রতি পুরুষের এই দৃষ্টিভঙ্গি সমাজের সমস্ত স্তরে প্রতিফলিত হয়। বাইরে ও ব্যক্তিগত পরিসরে, পরিবারে ও কাজে এর প্রতিফলন ঘটে। সবচাইতে ভালো উদারহরণ হলো- মেয়েদেরকে ছেলেরা সহকর্মী হিসেবে সমক্ষমতা কিংবা অবস্থানে বিবেচনা করতে চায় না, বরং সবক্ষেত্রে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সমগ্র সমাজে শুধু নারী হিসেবেই বিচার করে।

অধিবেশন ১.৫.২ সামাজিকীকরণের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠি ভিন্নভাবে : সামাজিকীকরণের বিভিন্ন প্রতিনিধি

উদ্দেশ্য

- সামাজিকীকরণের মাধ্যম বা প্রতিনিধি সম্পর্কে জানা

পদ্ধতি

আলোচনা, দলীয় কাজ

উপকরণ

পোস্টার কাগজ, মার্কার, সামাজিকীকরণের প্রতিনিধিগুলোর পরিবর্তিত ভূমিকার ওপর ফ্লিপ শিট

সময়

৪৫ মিনিট

প্রক্রিয়া

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন যে, আগের সেশনে আমরা জেনেছি কীভাবে আমাদের সামাজিকীকরণ হয় সামাজিক রীতির সাথে, যা আমাদের শেখায় কীভাবে নারী-পুরুষ জেন্ডার পরিচয় পায়। আজকে আমরা শিখব কারা এই সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। শেখার জন্য আমাদের মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং সমবেতভাবে আলোচনায় অংশ নিতে হবে। তাদেরকে বলুন জোড়া তৈরি করতে। তারপর প্রত্যেককে একে অন্যজনকে নিচের প্রশ্ন দুটি করতে বলুন এবং তারপর একে অন্যের সাথে তা অলোচনা করতে বলুন। প্রতিটি অংশগ্রহণকারী নিজের মতো করে কথা বলতে এবং অন্যের সাথে অলোচনা করতে পারে।

  ১. প্রথম তুমি কেমন করে বুঝলে যে তুমি মেয়ে বা ছেলে?

  ২. কখন, কোথায় এবং তোমাকে কে এটা বলেছিল?

- তাদের বলুন নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে বিবেচনায় নিয়ে বলতে। পরিষ্কারভাবে বোঝানোর জন্য নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলুন।

  [জীবনের কোনো অভিজ্ঞতা যেমন- এমন কিছু যা তারা মেয়ে বা ছেলে হবার কারণে করতে পারেনি। যেমন- ছেলেরা রান্না করতে চেয়েছে কিন্তু পারেনি; মেয়েরা ফুটবল খেলতে চেয়েছে কিন্তু পারেনি। আর কে তাদের বাধা দিয়েছিল? কে তাদের সচেতন করেছে যে তারা মেয়ে/ছেলে এবং তাদের নির্দিষ্ট ভূমিকায় থাকতে হবে।]

- যখন অংশগ্রহণকারীরা তাদের অভিজ্ঞতার কথা বলতে থাকবে তখন পোস্টার-৫ অনুযায়ী ফ্লিপ কাগজ বা সাদা বোর্ডে তাদের ভাবনাগুলোকে শ্রেণিকরণ করে লিখুন, এই কাজটি করুন সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় কে কীভাবে ভূমিকা পালন করে তা বোঝাবার জন্য

- অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়ে গেলে ব্যাখ্যা করুন কীভাবে পরিবার, স্কুল, গণমাধ্যম এবং কমিউনিটি সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মানুষের সামাজিকীকরণ হয় প্রচলিত রীতির সাথে, তাই তাদেরকে বলা হয় সামাজিকীকরণের মাধ্যম বা প্রতিনিধি।

- এখন সামাজিকীকরণের প্রতিনিধিগুলো কীভাবে রীতি পরিবর্তনের দ্বারা জেন্ডার সমতা আনতে সহায়তা করতে পারে তার ওপর ফ্লিপ শিট দেখান। তাদেরকে বলুন যে পরের সেশনে আমরা শিখব জেন্ডার বৈষম্য, সমতা এবং সাম্য।

সহায়কের জন্য তথ্য

সামাজিকীকরণের প্রতিনিধি

পোস্টার-৫

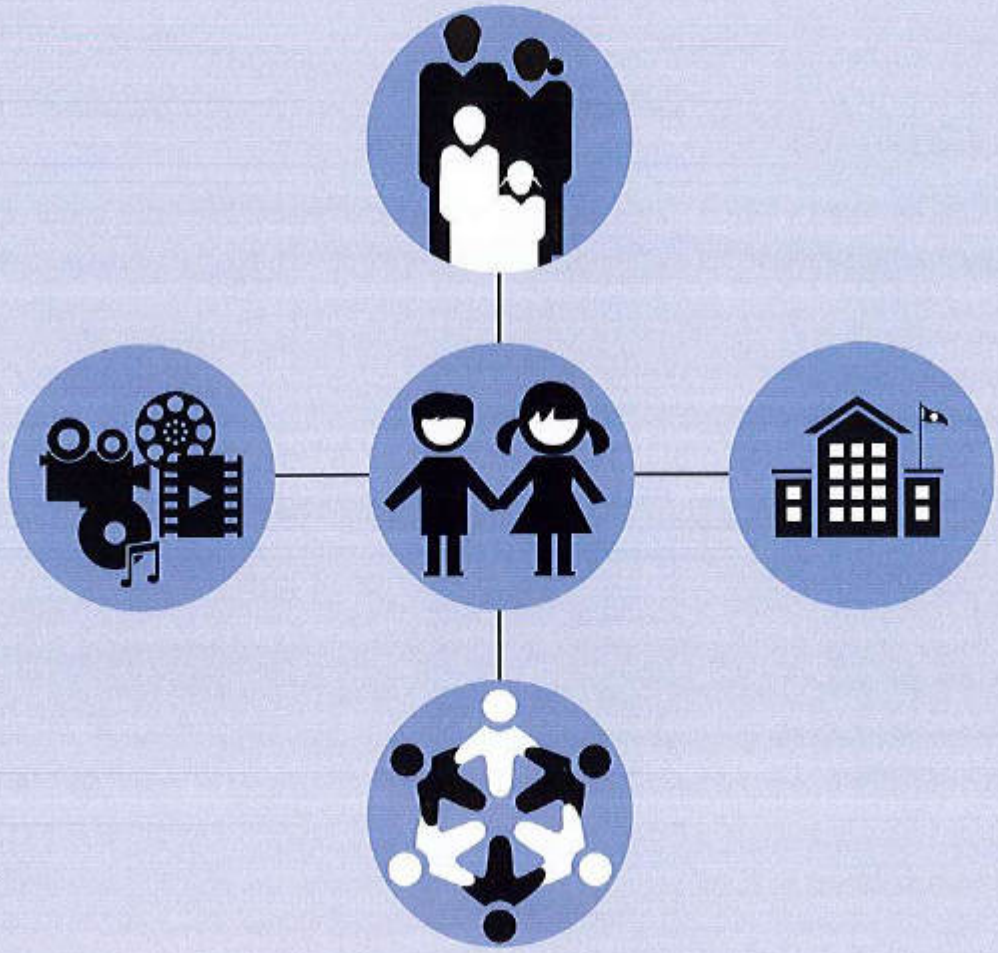

পরিবার

পরিবারের মধ্যে মেয়ে ও ছেলেদের শিশুকালে আলাদাভাবে দেখাশোনা করা হয়। ছেলেদের শক্তিশালী বানাতে অনেক বেশি শারীরিক উদ্দীপনা দেয়া হয়, যেখানে মেয়েদের দেওয়া হয় মৌখিক উদ্দীপনা রাজকন্যার মতো মেয়ে হবার জন্য। ভিন্ন ভিন্ন খেলনা দেওয়া হয় শিশুদের জীবনে তাদের ভূমিকা শেখাতে। আলাদা বৈশিষ্ট্যের ওপর জোর দেওয়া হয় যেমন- সাহসী ছেলে, ভালো ও শান্ত মেয়ে। পরিবার মেয়েদের ঘরের কাজে লাগিয়ে দেয় মা'কে সহায়তা করার জন্য এবং ছেলেদের উৎসাহিত করা হয় বাইরে খেলতে, বাইরে বাজার করতে যেতে। আজকালকার নতুন ধারণা হচ্ছে গোলাপি আর নীল- মেয়েদের জন্য গোলাপি আর ছেলেদের জন্য নীল ঘর, কাপড়, জুতো, এমনকি সাইকেল, পেন্সিলের বাক্স মেয়ে ও ছেলেদের জন্য আলাদা রঙের হয়।

স্কুল

স্কুলে ছেলে আর মেয়েরা পার্থক্য শেখে শব্দের মধ্য দিয়ে যেমন- মানুষ জাতি (এখানে ইংরেজিতে মানুষ আর পুরুষ বুঝাতে একই শব্দ ব্যবহৃত হয়), জেলে, চেয়ারম্যান ইত্যাদি। আলাদাভাবে বসে (মেয়ে ও ছেলেদের আলাদা বসার জায়গা), আলাদা ধরনের দায়িত্ব দেয়া (ছেলেরা শৃঙ্খলা রাখবে আর মেয়েরা ঝাড়ু দেবে, সাজানোর জিনিস কিনবে ছেলেরা আর মেয়েরা সাজাবে), যদি কখনো ছেলে আর মেয়েদের মধ্যে ঝগড়া হয়, তবে শিক্ষক দুই দলকেই তিরস্কার না করে মেয়েদের দোষারোপ করে- 'তোমরা ছেলেদের কাছে যাও কেন' বলে।

কমিউনিটি/সমাজ

প্রতিটি মানুষই কমিউনিটিতে থাকে। কমিউনিটি সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধি এবং রীতি তৈরির মাধ্যমে সেগুলোকে মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়। বাংলাদেশে পুরুষরা পরিবার চালাবে, আর নারীরা সন্তানের দেখাশোনা করবে ও ঘর সামলাবে এই রীতিটি বহুলভাবে গ্রহণীয়।

গণমাধ্যম

গণমাধ্যম টিভি অনুষ্ঠান, সিরিয়াল, খেলা, কার্টুন, সিনেমা, খবর, সংবাদপত্র এবং বইয়ের মাধ্যমে সামাজিক রীতি প্রচার করে।

অধিবেশন ১.৬ জেন্ডার বৈষম্য, সমতা এবং সাম্য

উদ্দেশ্য

- জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য সম্পর্কে জানা এবং নারীর প্রতি বৈষম্যের ক্ষেত্রগুলোকে চিহ্নিত করা
- সমতা কী এবং সাম্য কী করে বৈষম্য দূর করে জেন্ডার সমতা আনতে পারে তা জানা।

পদ্ধতি

আলোচনা

উপকরণ

পোস্টার কাগজ, মার্কার, জেন্ডার বৈষম্যহীন রীতি ও আচরণ এবং সাম্য বোঝাতে বক ও শেয়ালের গল্পের ওপর ফ্লিপ শিট, পোস্টার-৬

সময়

৪৫ মিনিট

প্রক্রিয়া

ধাপ ১

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন যেহেতু শুরু থেকে আমরা জেনে আসছি নারী ও পুরুষকে আলাদা করা হয় শুধু জৈবিক ভিত্তিতেই নয়, সমাজের নির্ধারিত রীতির ভিত্তিতেও। জেন্ডার পরিচয়ের ভিত্তিতে এই সমাজ পুরুষকে অনেক সুযোগ দেয় এবং নারীদের কম অথবা কোনো সুযোগ দেয় না। জেন্ডার বৈষম্য হচ্ছে এমন পরিস্থিতি যখন, মেয়ে/নারীরা ছেলে/পুরুষদের সমান যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও একই কাজ ছেলে/পুরুষদের মতো করার সুযোগ পায় না। এই জেন্ডার বৈষম্যের কারণে মেয়েরা অনেক সময় শিক্ষা ও কর্মজীবনে বেশিদূর যেতে পারে না, দক্ষতা ও মেধা থাকার পরও
- এখন তাদের বলুন বাংলাদেশের সমাজে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ছেলেদের চেয়ে- মেয়েরা কম সুযোগ পায় বা কোন্ সুযোগ পায় না তা খোঁজার চেষ্টা করতে (আপনি চেষ্টা করবেন আলোচনার মাধ্যমে বৈষম্যের ক্ষেত্রগুলো বের করে আনতে এবং আলোচনায় প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকে অন্তর্ভুক্ত করবেন এবং পোস্টার-৬ পূরণ করবেন)।

পোস্টার : ৬

বৈষম্যের ক্ষেত্র	(বেশি) সুযোগ পায় মেয়ে/ছেলে	কম বা কোনো সুযোগ পায় না মেয়ে/ছেলে
শিক্ষা		
খাদ্য ও পুষ্টি		
নির্ধারিত পোশাক		
সিদ্ধান্ত নেওয়া		
মতামত চাওয়া		
বাইরে খেলা/চলাফেরা		
অসুখ হলে চিকিৎসা/স্বাস্থ্যসেবা		
বিয়ে		
বাচ্চা নেওয়া		
পরিবারের সম্পত্তির উত্তরাধিকার		
কাজ বেছে নেবার স্বাধীনতা সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা/পেশা বেছে নেওয়া		

[অংশগ্রহণকারী মেয়েরা যেহেতু স্কুলের শিক্ষার্থী, তাই তারা প্রথমেই বৈষম্যের ক্ষেত্রগুলো হয়তো বের করতে পারবে না, তাই অনুগ্রহ করে আলোচনাকালে অনেক উদাহরণ দিন যেন তারা বুঝতে পারে]

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন যে জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য মেয়ে শিশু, কিশোরী এবং নারীদের জীবনে তাদের প্রতি সহিংসতার সুযোগ করে দিচ্ছে। সামনের সেশনগুলোতে আমরা এই বিষয়ে আরও শিখব। তাই সহিংসতা ও বৈষম্য দূর করতে মা-বাবা, কমিউনিটি, রাষ্ট্র এবং আমাদের এসব বিষয়ে চিরাচরিত চিন্তাভাবনা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। আমাদের এসব চিরাচরিত নিয়ম চ্যালেঞ্জ করতে একটু অন্যভাবে চিন্তা এবং বৈষম্যহীন আচরণ করতে হবে
- ফ্লিপ শিটে দেওয়া এসব বৈষম্যমূলক রীতিগুলোর কোথায় চ্যালেঞ্জ ও পরিবর্তন করা যায় তা দেখান।

ধাপ ২

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন নারী ও মেয়েদের অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে সমস্ত বৈষম্য দূর করতে হবে এবং সমঅধিকার ও সুযোগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে সবার জন্য। জেন্ডার সমতা বলতে বুঝায় নারী ও পুরুষের সমান অবস্থান নিশ্চিত করা যেখানে তারা তাদের মানবাধিকারগুলো প্রয়োগ করার সমান সুযোগ পায় আর নিজেদের পূর্ণ সক্ষমতা বুঝতে পেরে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। এসবের ফলাফল থেকে লাভবান হতে পারে। তাদের উদাহরণ দিয়ে জেন্ডার সমতা বুঝিয়ে দিন।
- ঐতিহাসিকভাবেই মেয়ে ও নারীরা অনেক বৈষম্যের মুখোমুখি হয়ে আসছে এবং ছেলেদের সমান সুযোগ পায়নি, সমান অধিকার পেতে তাদের এগিয়ে আনবার জন্য কিছু কাজ ও পদক্ষেপ নিতে হবে। একে বলে সাম্য, যা হলো জেন্ডার সমতা লাভের প্রক্রিয়ায় একটি ধাপ বা কৌশল।
- বক ও শেয়ালের গল্পের ফ্লিপ শিটটি দেখান আরও ভালো করে সাম্য বোঝার জন্য। অংশগ্রহণকারীদের বলুন তিনটি দলে ভাগ হয়ে তিনটি পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বের করতে কীভাবে সাম্য সমান সুযোগ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আপনি তাদের বিশ্লেষণে সাহায্য করুন

- আলোচনা চালিয়ে যান যে বাংলাদেশে অনেক সম্ভাবনাময়ী মেয়ে এবং নারী রয়েছেন, যদি তাদের সমান সুযোগ দেয়া হয় সমঅধিকার ভোগ করার জন্য তাহলে তাদের সামাজিক অবস্থান পাল্টে যেতে পারে, যা সমগ্র বাংলাদেশের অবস্থা পাল্টে দিতে পারে। মা-বাবা, পরিবার, কমিউনিটি এবং সরকারকে সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য এবং পিছিয়ে থাকা নারীদের জন্য সমান সুযোগ এবং অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করতে হবে। মেয়ে ও নারীদেরও নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং এসব প্রতিষ্ঠা করার জন্য সুযোগ খুঁজতে হবে।

সাম্যের উদাহরণ

বাংলাদেশ সরকার মাধ্যমিক শিক্ষায় নারী শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি কর্মসূচি চালু করেছে যেন মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীরা স্কুলে থাকে এবং তারা যেন শিক্ষার জন্য সমান সুযোগ পায়। যেহেতু বাংলাদেশে অনেক মা-বাবা দারিদ্র্যের কথা বলে তাদের কিশোরী মেয়ের লেখাপড়া বন্ধ করে দেয়।

অধিবেশন ১.৭ বড় হবার জন্য শিক্ষা : সবার জন্য একটি অধিকার

উদ্দেশ্য

- অধিকার এবং কীভাবে এসব অধিকার জেন্ডার সমতায় প্রতিফলন ঘটায় সে সম্পর্কে জানা
- বড় হওয়া ও নিজের উন্নয়নের জন্য শিক্ষার গুরুত্ব বোঝা

পদ্ধতি

আলোচনা, দলীয় কাজ

সময়

৪০ মিনিট

প্রক্রিয়া

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন যে আগের সেশনে আমরা আলোচনা করেছি কীভাবে সমাজ দুই দল মানুষের মধ্যে রেখা টেনে দিয়েছে নারী ও পুরুষ নামে। যদিও মানুষ হিসেবে নারী-পুরুষ উভয়েরই জীবনে সমান অধিকার থাকা উচিত কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীদের পুরুষের সমান অধিকার দেয়া হয় না। একটি পরিপূর্ণ জীবনযাপন করতে গেলে সবাইকে জানতে হবে অধিকার কী এবং এসব অধিকার কীভাবে সুরক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, কেউ যদি নিজের অধিকার সম্পর্কে না জানে তবে তাকে বঞ্চিত করা সহজ
- অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন যে অধিকার কী তা কি তারা জানে? তাদের থেকে উত্তর পাবার পরে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন অধিকার কী এবং বিশেষ করে নারী অধিকার নিয়ে আলোচনা করুন
- আলোচনা করুন যে, আমরা জানি শিক্ষা হচ্ছে একটি মৌলিক অধিকার যা আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আইন এবং সনদ দ্বারা স্বীকৃত। শিক্ষা নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে বড় হওয়া এবং যথার্থ মানুষ হিসেবে নিজের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশে সামাজিক রীতির নামে মেয়েদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হয়
- তাদের জিজ্ঞেস করুন শিক্ষা কীভাবে উন্নয়ন, বড় হওয়া বা সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হতে পারে
- ৪টি দল তৈরি করুন এবং তাদেরকে উত্তর খুঁজতে দিন। [তাদের উপস্থাপনার পরে আলোচনা করুন সহায়কের জন্য তথ্যের সাহায্যে]
- পরিশেষে সব অংশগ্রহণকারীকে একটা বাড়ির কাজ করার জন্য অনুরোধ করুন। বাসায় তারা তাদের পরিবার বা প্রতিবেশী পরিবারের নারী সদস্যদের মধ্যে যারা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে বা কখনও করেনি তাদের জিজ্ঞেস করবে, 'তারা যদি লেখাপড়া চালিয়ে যাবার সুযোগ পেত, তাদের জীবন কেমন হতো? সামাজিক অবস্থার কি কোনো হেরফের হতো? পড়ালেখা না করার কারণ কী? তাদেরকে বলুন তারা যে তথ্যগুলো পাবে তা তাদের স্ক্র্যাপ খাতায় লিখতে এবং পরের সেশনে বলতে'।

সহায়কের জন্য তথ্য

অধিকার কী?

অধিকার হলো আত্ম-উন্নয়নের জন্য সমস্ত চাহিদাপূরণ। অধিকার ছাড়া মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকা কঠিন। এসব চাহিদার আইনগত ভিত্তি থাকতে হয়। বেঁচে থাকা, নিরাপত্তা, সুরক্ষা, সম্মান এবং শারীরিক, মানসিক, বোধশক্তির উন্নয়নের জন্য অধিকার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি মানুষের জন্য।

উদাহরণস্বরূপ: মানুষ হিসেবে আমি রাষ্ট্রের দ্বারা ধর্ম, জাতিসত্তা, বর্ণ/গোত্র, সেক্স বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে আমার জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে যা আমার ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কোনো বৈষম্যের শিকার হবো না। বাংলাদেশের সংবিধান [ধারা ২৮ (১)] মোতাবেক এর আইনগত ভিত্তি রয়েছে। তাই বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে এটি আমার অধিকার। আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের বিভিন্ন দলিলেও এর আইনগত ভিত্তি (যেমন- ইউডিএইচআর, আইসিইএসসিআর, আইসিসিপিআর, সিডও ইত্যাদি) রয়েছে এবং এটি সমগ্র পৃথিবীর মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

প্রতিটি শিশুর শিক্ষার অধিকার আছে। কারণ এটি শিশুর উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যক এবং জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে (ইউএনসিআরসি) স্বীকৃত (ধারা ২৮)। তবে, কোনো শিশু সাইকেল চাইলে এটা তার জন্য অধিকার বলা যাবে না, কারণ এর কোনো আইনগত ভিত্তি নেই। এ অনুরোধ মা-বাবাকে করা যায় এবং তারা তাদের সাধ্যমতো দিতে পারে।

মানবাধিকার কী?

১০ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ একটি সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র (ইউডিএইচআর) গ্রহণ করে। মানবাধিকার হচ্ছে এমন অধিকার যা মানুষের সহজাত, আমাদের জাতীয়তা, বসবাসের স্থান, সেক্স, জাতিগত পরিচয়, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা বা অবস্থান নির্বিশেষে। মানবাধিকার সকলের সমানভাবে, কোনোরূপ বৈষম্য ছাড়াই। এটি মানব ইতিহাসের একটি যুগান্তকারী দলিল। এই প্রথম প্রতিষ্ঠা পায় যে মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো আন্তর্জাতিকভাবে সুরক্ষিত।

সর্বজনীন মানবাধিকার অনেক সময় আইন, বিভিন্ন ধরনের চুক্তি, সাধারণ নীতিমালা এবং প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইনরূপে প্রকাশিত হয় এবং অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনগুলো সরকারকে ব্যক্তি বা দলের মৌলিক স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারকে সুরক্ষিত এবং সমুন্নত রাখতে কোনো নির্দিষ্ট কাজ করতে বাধ্য করে অথবা বিরত রাখে।

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় যেসব মানবাধিকারের কথা বলা আছে তার মধ্যে আছে বৈষম্যহীন এবং শিক্ষার অধিকার যা ধারা ২ ও ২৬-এ উল্লিখিত। মানবাধিকারের প্রেক্ষাপটে দু'টি চুক্তিপত্র মনে রাখবার জন্য জরুরি, তা হলো আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক চুক্তি (আইসিসিপিআর) যা কিনা যুক্তিযুক্ত এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক অধিকার চুক্তি (আইসিইএসসিআর) বর্তমান পটভূমিতে যুক্তিযুক্ত না হলেও জেন্ডার সাম্য ও সমতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আইসিইএসসিআর আলোচনা করে খাদ্য, সম্পদ, সম্পত্তি এবং সুযোগে নারীর অধিকার (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রাধিকার)।

মৌলিক অধিকার

মৌলিক অধিকারের ধারণাটি একটি আইনগত ধারণা হিসেবে পৃথিবীর বেশিরভাগ অংশে এগিয়ে গিয়েছে এই ভেবে যে মানুষের 'মৌলিক' অধিকার রয়েছে। যখন মানবাধিকারগুলো রাষ্ট্রের সংবিধান বা কোনো আইনের দ্বারা সুরক্ষিত থাকে নাগরিকদের জন্য, তখন সেটাকে মৌলিক অধিকার বলে।

কোনো রাষ্ট্রের বা বিশ্বের নাগরিক বা সদস্য হিসেবে সমস্ত মানুষেরই অধিকার আছে বৈষম্যহীনভাবে বেঁচে থাকার এবং এসব অধিকার আইনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সুরক্ষিত। তাছাড়া, বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আইনের চোখে আমরা সবাই সমান এবং তা বাংলাদেশের সংবিধানে নিশ্চিত করা আছে (ধারা ১)।

নারীর অধিকার রক্ষায় সিডও

নারীর অধিকার মানবাধিকার। নারী ও পুরুষ উভয়েই মৌলিক মানবাধিকার ভোগ করতে পারে মানুষ হিসেবে। সারা পৃথিবীতেই নারী তার অধিকার পূরণের ক্ষেত্রে নানানভাবে বৈষম্যের মুখোমুখি হয়। নারীরা সবক্ষেত্রে, সবখানেই পুরুষের তুলনায় সমান সম্মান, অধিকার, স্বাধীনতা, সুযোগ ও জীবন বেছে নেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

জীবনে সকল ক্ষেত্রে সমাজ, অর্থনীতি এবং রাজনীতিতে নারীর প্রতি সবধরনের বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে, নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ 'নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও)' গ্রহণ করে। বাংলাদেশও এই সনদে স্বাক্ষরকারী একটি দেশ।

বাংলাদেশ সনদটির ধারা ২ এবং ১৬.১ (গ) সংরক্ষিত রেখেই সনদটিকে অনুমোদন দিয়েছে। ধারা ২ মোতাবেক রাষ্ট্রগুলো তার জাতীয় আইন ব্যবস্থায় দৃঢ় নীতি গ্রহণ করবে এবং নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক সমস্ত কিছু বিলোপ-এর পদক্ষেপ হিসেবে জাতীয় আইনগত কাঠামোতে বৈষম্যমূলক আইন, নীতি এবং অনুশীলন রদ করবে। ধারা ১৬ (গ)-তে বলা আছে বিয়ে ও তালাকের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের কথা। যেহেতু এই দু'টি ধারা বাংলাদেশের বর্তমান আইন ও অনুশীলনের সাথে সাংঘর্ষিক, তাই বাংলাদেশ এই দুটি ধারাতে সংরক্ষণ উঠিয়ে নেয়নি। আমরা সবাই জানি যে, এখনও অনেক বৈষম্যমূলক আইন, চর্চা ও প্রথা রয়েছে আমাদের সমাজে যেমন- উত্তরাধিকারের আইন, বাল্যবিবাহ এবং যৌতুকপ্রথা।

যদিও বাংলাদেশ সনদটিকে অনুমোদন দিয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত একে জাতীয় আইনে পরিণত করেনি, তাই এই সনদটিকে প্রয়োগ করা কঠিন। অনেক উন্নয়ন সংস্থা এবং নারী অধিকারভিত্তিক সংগঠন এটিকে আইনে পরিণত করতে এবং এর সম্পূর্ণ প্রয়োগ নিয়ে কাজ করে চলেছে।

শিক্ষার গুরুত্ব

শিক্ষা হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র যা দিয়ে আমরা পৃথিবীকে বদলে দিতে পারি।

– নেলসন ম্যান্ডেলা

শিক্ষা একটি মানবাধিকার কারণ এটি মানুষের উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রতিটি মানুষের অধিকার আছে শিক্ষাগ্রহণ করার। শিক্ষা কেন গুরুত্বপূর্ণ তার কারণগুলো হলো-

- শিক্ষার মাধ্যমে একজন মানুষ তার ইচ্ছা ও জীবনের লক্ষ্যপূরণ করতে পারে, একটি সম্মানজনক কাজের মাধ্যমে একটি চমৎকার ভবিষ্যৎ লাভ করতে পারে। কেউ যদি চায় ভালো চাকরি করতে বা পেশাদার হতে, তবে তাকে পড়া চালিয়ে যেতে হবে তার গন্তব্যে পৌঁছাতে।

- শিক্ষা আমাদের আত্মনির্ভরশীল, আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করে, দেয় আত্মসম্মান এবং সাহায্য করে অপরের প্রতি নির্ভরশীল না হতে। যখন কোনো মেয়ে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পায়, এর কারণে সে চাকরি পায়, আয় করে এবং নিজের আয় নিজেই নিয়ন্ত্রণ করে নিজেকে উন্নয়ন করতে পারে, অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল হয় নিজের দায়িত্ব নেবার মতো এবং ভালোটিকে পছন্দের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী হয়। সোজা কথায়, সে সুখী হবার ক্ষমতা পায়।

- শিক্ষার ফলে একজন মানুষ অন্যভাবে চিন্তা করে, নতুন ভাবনা পায় এবং যৌক্তিক ও অযৌক্তিকের মধ্যে প্রভেদ বুঝতে পারে।

- যথার্থ শিক্ষা একজন মানুষকে কুসংস্কারমুক্ত রাখতে সাহায্য করে। শিক্ষার সাহায্যে একজন মানুষ কুসংস্কার ও বৈজ্ঞানিক সত্যের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। একজন শিক্ষিত মানুষ যুক্তি দিয়ে চিন্তা করতে পারে যা একজন শিক্ষাহীনের জন্য দুরূহ। যেমন- বাংলাদেশে যখন একজন নারীর সন্তান হয় না বা বারবার গর্ভপাত ঘটে, তখন মনে করা হয় তাকে জিনে ধরেছে। তাই হাসপাতালে নেবার বদলে তাকে কবিরাজের কাছে নেওয়া হয় যার ফলে তার মৃত্যু হতে পারে বা আজীবনের জন্য বন্ধ্যত্ব এনে দেয়।

- শিক্ষা আমাদের স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে। তাই অনেক সময় আমরা প্রতিরোধের কথা চিন্তা করি এবং নিজেদের সমস্যায় পড়ার হাত থেকে বেঁচে যাই।

- শিক্ষার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন সংস্কৃতি, বিভিন্ন জাতির ইতিহাস থেকে শিখতে পারি এবং কোথাও না গিয়েই বিশ্ব সম্পর্কে জানতে পারি।

- শিক্ষার সাহায্যে আমরা আমাদের অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে পারি। কৃষি, শিক্ষা, বীজ, জৈব সার ব্যবহার ইত্যাদি দিয়ে অনেক কৃষককে ভালোমানের ফসল ফলাতে এবং তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করে।

- শিক্ষার মাধ্যমে আমরা প্রচলিত বৈষম্যমূলক রীতিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারি ধর্ম, আইন এবং নীতি, আমাদের অধিকার এবং লভ্য সেবা সম্পর্কে সঠিকভাবে জেনে। তাছাড়া, আমরা বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ করে প্রচলিত রীতিকে পরিবর্তন করার জন্য প্রচারণা চালাতে পারি এবং সমতার জন্য লড়তে পারি।

- যখন কোনো সমাজের নারী ও পুরুষ সদস্য সবাই শিক্ষিত হবে এবং সমতা অর্জন করবে, তখন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামগ্রিক উন্নয়ন টেকসই হবে।

- জাতিগত বা ধর্মীয় সংখ্যালঘু, বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন, যারা অধিক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকে তাদের শিক্ষার গুরুত্বের ওপরে জোর দিতে হবে, যা তাদের সমতার জন্য সাম্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

অধিবেশন ১.৮ স্বপ্নের দ্বারপ্রান্তে

উদ্দেশ্য

- অংশগ্রহণকারী কিশোরী-কিশোরদের তাদের স্বপ্ন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে চিন্তা করতে সক্ষম করে তোলা
- তাদের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন সম্পর্কে আশাবাদী থাকতে এবং অন্যের স্বপ্নকে সম্মান দিতে উৎসাহী করে তোলা

পদ্ধতি

আলোচনা, ছবি আঁকা

উপকরণ

আর্ট কাগজ, রং পেন্সিল, দড়ি, আঠা

সময়

৪৫ মিনিট

প্রক্রিয়া

ধাপ- ১

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন আগের সেশনের বাড়ির কাজের সারসংক্ষেপ তুলে ধরার জন্য দল তৈরি করতে এবং সবাইকে জানাতে
- বলা হয়ে গেলে সবাইকে মনে করিয়ে দিন যে প্রথম সেশনে পরিচয়পর্বে তারা তাদের স্বপ্নের কথা বলেছিল। এখন সবাইকে বলুন তাদের ভবিষ্যতের স্বপ্নকে একটি কাগজে আঁকতে এবং যতটা সম্ভব রং দিতে
- ছবি আঁকা হয়ে গেলে অংশগ্রহণকারীরা বের করবে কোন উপায়ে তারা তাদের স্বপ্ন সফল করবে। তারা সেটা ছবির পেছনে লিখবে।
- যখন ছবি আঁকা শেষ হয়ে যাবে, সবাইকে অনুগ্রহ করে বলুন তাদের ছবি দেখাতে। একটা দড়ি টানিয়ে দিন সব ছবি ঝুলিয়ে দেখানোর জন্য। কেউ যদি ছবি দেখাতে না চায়, তবে তাকে জোর করবেন না
- সবাইকে তাদের স্বপ্ন নিয়ে বলতে বলুন। বলুন যে, তাদের স্বপ্নটিকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং তা পূরণ করার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতে, যদি তারা পথে কোনো বাধা পায়, তারা যেন বিকল্প পথের কথা ভাবে স্বপ্ন সফল করার জন্য। সবচেয়ে জরুরি হলো হাল ছেড়ে না দেয়া কারণ আমরা মানুষ আর আমাদের স্বপ্ন দেখার, বেছে নেবার ও সম্মানজনক জীবন যাপন করার অধিকার আছে। তাদের বলুন যুক্তিযুক্তভাবে চিন্তা করতে এবং কখনই নীতি বিসর্জন দিয়ে স্বপ্নপূরণ না করতে বা অন্যের স্বপ্ন ভেঙে না দিতে
- বলা হয়ে গেলে যারা বলেছে ও কাজ করেছে তাদের জন্য হাততালি দিন।

ধাপ- ২

- এবার অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন- আশা কী জিনিস তোমরা কি বলতে পারবে? কেউ যদি উত্তর দিতে চায়, তার উত্তরের বিচার করবেন না।
- অংশগ্রহণকারীদের বলুন গোল হয়ে দাঁড়াতে, চোখ বন্ধ করতে, তারপর বলুন যে একটা অবস্থার কথা চিন্তা করতে- যেখানে তারা নদীর পাড়ে দাঁড়ানো, পিছনে বন। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে এবং তাদের অন্ধকার হয়ে যাবার আগেই নদী পার হতে হবে। কোনো নৌকা নেই। তারপরও তাদের নদী পার হতেই হবে যদি বাঁচতে চায়। এখন তারা কী করবে? তারা কী ভাবছে?
- কিছুক্ষণ পরে অংশগ্রহণকারীদের চোখ খুলতে বলুন। তাদেরকে নিচের প্রশ্নগুলো করুন-
  - তোমাদের ক্ষেত্রে যা ঘটছে তোমরা কি তা মেনে নিয়েছ?
  - তোমরা কি একে ভাগ্য বলে মেনে নিয়েছ?
  - তোমরা কি আশ্চর্য কিছু হবে বলে মনে করছ?
  - তোমাদের কাছে কি কোনো বিকল্প আছে?
  - তোমরা কি দৃঢ়ভাবে মনে কর বা বিশ্বাস কর যে - তোমরা নদী পার হতে পারবে?
  - তোমরা কি এই সময়ে পরিবারের কোনো সদস্য বা বন্ধু বা এমন কাউকে মনে করেছ যে তোমাদের বিশ্বাস করাতে পারবে যে তোমরা পারবে?
- ওপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর পাবার পরে তাদের বলুন আমরা যখন বিশ্বাস করি এবং মনে করি আমরা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব, তা যত কঠিনই হোক না কেন, এই অনুভূতিটা আমাদের সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কারো ভেতরের এই দৃঢ় প্রত্যয়কে বলে আশা। আশা এমন একটা অনুভব বা অনুভূতি যা তোমাকে কঠিন পরিস্থিতি এবং অভিজ্ঞতার মুখে তোমাকে সাহায্য করবে। আশাকে দেখা যায় না কিন্তু তুমি একে অনুভব করতে পারবে, আমরা যত শক্তভাবে অনুভব করব, আশা তত শক্ত হবে। আশা হচ্ছে বাতাসের মতো, একটা শক্তি, সবসময়ই আমাদের চারপাশে আছে। বাতাস যেভাবে নৌকাকে সামনে নিয়ে যায়, আশাও তেমনি আমাদের স্বপ্ন দেখতে সাহায্য করে। আশাহীন জীবন হচ্ছে আত্মাহীন শরীরের মতো। আমরা যদি চারদিকে দেখি, অনেক মানুষ পাবো, যারা তাদের জীবনকে পরিবর্তন করেছে আশার সাহায্যে। আমাদের বিশ্বাস করতে হবে অন্য মানুষেরও আশা আছে আর আমরা তাদের উৎসাহ জোগাব আশাকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং আত্মবিশ্বাসী হতে যেন তারা তাদের স্বপ্ন সফল করতে পারে
- পরিশেষে তাদের বলুন আমাদের সমাজে অনেক মেয়ে/নারী আছে যারা অনেক চ্যালেঞ্জ, বৈষম্য, বঞ্চনার মুখোমুখি হয় শিশুকাল থেকে এবং এগুলো তাদের আশা- স্বপ্নকে কবর দিয়ে দেয়। তারা এগুলোকে ভাগ্য আর সমাজের রীতি বলে মেনে নেয়। তারা কোনোদিন তাদের অবস্থা আর প্রচলিত রীতিকে চ্যালেঞ্জ করে না, কারণ তারা জানে না যে, সমাজের বানানো এসব রীতি স্থির, সর্বজনীন এবং অপরিবর্তনীয় নয়। তাই ভাগ্যের ওপর ভরসা না করে তাদের উচিত বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজে নারীদের চিরাচরিত জেন্ডার এবং প্রচলিত ভূমিকাকে চ্যালেঞ্জ করে নিজেদের জীবনকে পরিবর্তন করার আশা রাখা। মা-বাবা, পরিবারের সদস্য, কমিউনিটি (বিশেষ করে ছেলে ও পুরুষ) সকলকে এগিয়ে আসতে হবে মেয়ে/নারীদের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে ও শক্তিশালী রাখতে এবং পরিবর্তন শুরু করতে।

[আলোচ্য বিষয়ের কিছু অংশ এবং সেশনের নামটি 'স্বপ্নের দ্বারপ্রান্তে' নেয়া হয়েছে- সেভ দ্য চিল্ড্রেন ২০১৩ থেকে]।

মডিউল ২

এখন কার পালা : কেন পুনরায় আলোচনা?

অধিবেশন ২.১ কে কোন্ কাজ করে : গৃহকর্মে শ্রমবিভাজন

উদ্দেশ্য

- গৃহকর্মে নারী ও পুরুষের ভূমিকা পরীক্ষা করা ও সচেতনতা গড়ে তোলা
- চিরাচরিত ভূমিকাগুলোকে চ্যালেঞ্জ করার ভিত্তি চিহ্নিত করা

পদ্ধতি

গল্পের বিশ্লেষণ, আলোচনা, দলীয় কাজ

উপকরণ

গৃহকর্মে নারী ও পুরুষের ভূমিকার ওপর ফ্লিপ শিট, গল্পের অনুলিপি, পোস্টার কাগজ, মার্কার

সময়

৪৫ মিনিট

প্রক্রিয়া

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন গত সেশনগুলোতে আমরা জেনেছি- সমাজ মেয়ে/নারী এবং ছেলে/পুরুষকে কেমন ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে, তাদের জন্য রয়েছে আলাদা বৈশিষ্ট্য, ভূমিকা এবং প্রত্যাশা। যা নারী ও মেয়েদের প্রতি বৈষম্যের পথ করে দেয়। আমরা এ-ও বুঝি এই বৈষম্যমূলক রীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে সমান অধিকার ও সুযোগ পেতে হলে। এখন থেকে আমরা চেষ্টা করব চিরাচরিত প্রথা এবং বিদ্যমান সামাজিক রীতিকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষেত্রগুলোকে চিহ্নিত করতে
- আজকের আলোচনা হবে গৃহকর্মে শ্রমবিভাজন নিয়ে। গৃহকর্মে শ্রমবিভাজন হচ্ছে 'ঘরে বা পরিবারে কাজ, ভূমিকা এবং কর্তব্যের বিভাজন'। অধিবেশন ১.৪-এ তোমরা শিখেছ সমাজ কর্তৃক সংজ্ঞায়িত জেন্ডার ভূমিকা। প্রচলিত রীতির কারণে মেয়ে ও নারীদের ঘরে অনেক বেশি কাজ করতে হয় ছেলে ও পুরুষের চাইতে। তাই লেখাপড়া করে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়া, অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত হওয়া এবং অধিকার ও সুযোগ পাওয়া মেয়ে ও নারীদের পক্ষে আরও কঠিন হয়ে যায়
- এখন ৪টি দল তৈরি করুন এবং দু'টি গল্প বিশ্লেষণ করে নারী ও মেয়েদের প্রতিবন্ধকতা ও অসম জেন্ডার সম্পর্কের কারণ চিহ্নিত করতে বলুন। তাদের গল্প পড়তে দিন এবং বিশ্লেষণ এবং প্রশ্নোত্তরের জন্য তৈরি হতে বলুন। বিশ্লেষণ ও আলোচনা করার জন্য দল- ১ ও ৩ পাবে গল্প ১ এবং দল- ২ ও ৪ পাবে গল্প ২।

গল্প ১

মিতুর বয়স ১৩ বছর, সে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। তার দুই ভাই এবং আরও দুই বোন আছে। সে ভাই-বোনেদের মধ্যে তৃতীয়। তার ভাই মিন্টু একটি বেসরকারি স্কুলের নবম শ্রেণিতে পড়ে মানসম্মত লেখাপড়ার জন্য। তার বাবা একটা চায়ের দোকান চালায়। যে বস্তিতে তারা থাকে দোকানটি বাসার ঠিক পাশেই। তিনি পরিবারের জন্য রোজগার করেন। তার মা গৃহিণী। মিতুর মা সেলাই পারে এবং তার একটা পুরনো সেলাই মেশিন আছে। সেটা দিয়েই তিনি পরিবারের সব কাপড় বানায়। অনেক সময় সে প্রতিবেশীদের জন্যও জামা বানায়, বিশেষ করে উৎসবের সময়, কিছু টাকার জন্য। তবে এই কাজের জন্য সে বেশি সময় নিতে পারে না, কারণ সে গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকে আবার অনেক সময় চায়ের দোকান দেখতে হয় যখন তার স্বামী খায় বা ঘুমায়, অসুস্থ থাকে বা বাইরে যায়। অনেক সময় তার মেশিন ঠিকভাবে কাজ করে না এবং একটা জামা বানাতে অনেকক্ষণ সময় লাগে। তার মা অনেকবার স্বামীকে বলেছে মেশিনটা ঠিক করে দিতে, কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন এই বলে যে তার এই সামান্য কাজে পরিবারে কোনো টাকা আসে না। কিন্তু এটা মোটেই সত্যি নয় কারণ তার মা সবসময় অন্যের জামা বানিয়ে যা পায় তা জমিয়ে রাখে এবং অনেক সময় স্বামীকে দেয়। ব্যবসা শুরু করার সময় তার যে দেনা হয়েছিল তা শোধ করতে সে টাকা দিয়েছিল। যখন মিতুর মা তাকে কথাটা মনে করিয়ে দেয়, সে উড়িয়ে দেয় টাকার অংক ছোট বলে। মিতুর দাদী তাদের সাথে থাকে, যে প্রায় ৯০ বছর বয়সের। গৃহকর্ম ছাড়াও মিতুর মা'কে তার দেখাশোনা করতে হয়।

মিতুর বড় বোন সেতুর ৩ বছর আগে বিয়ে হয়ে গেছে যখন সে একটা সরকারি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ত, তার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার আগে। বাল্যবিবাহ দেবার পেছনে পরিবারের যুক্তি ছিল- তার বাবার পক্ষে ৯ জনের সংসার চালানোর মতো যথেষ্ট আয় ছিল না, পরিবারের একটি বাড়ন্ত ছেলে আছে যার লেখাপড়া অনেক বেশি দরকার। তার প্রাইভেট পড়া আর স্কুলের বেতনের জন্য অনেক টাকার দরকার। তাছাড়া মেয়ে বড় হয়ে গেলে আরও বেশি যৌতুক লাগবে। এছাড়াও, যে ছেলেকে সেতুর জন্য ঠিক করা হয়েছে, যদিও সে কিছু করে না আর প্রাথমিক শিক্ষাও শেষ করেনি, কিন্তু সে ধনী পরিবার থেকে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে, তার বাবার একটা কৃষি খামার আছে গ্রামে। পরিবারটি নিজেদের ফসল দিয়ে চলে। এটা মিতুর বাবার জন্য একটা ভালো প্রস্তাব ছিল যেহেতু তাদের জমি নদীগর্ভে চলে গিয়েছিল। গ্রামে তার আর কিছু অবশিষ্ট নেই। মিতুর মা তার স্বামীকে অনেকবার অনুরোধ করেছে মেয়েকে এত অল্প বয়সে বিয়ে না দেবার জন্য, কারণ তাতে সেতুর লেখাপড়া নষ্ট হবে আর তার ঘাড়ে নতুন সংসারের চাপ পড়বে। কিন্তু তিনি কথায় কর্ণপাত করেননি। সেতু তার লেখাপড়া চালিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু লেখাপড়ায় ব্যয় করার মতো সময় সে পায়নি, কারণ শ্বশুর বাড়িতে তাকে অনেক কাজ করতে হয় তারা গৃহস্থ পরিবার বলে। বিয়ের এক বছর পরে সেতুর একটি বাচ্চা হয়েছে আর এখন তাকে বাচ্চাকেও দেখাশোনা করতে হয়।

মিতু ৫ম শ্রেণিতে পড়ার সময় থেকে বিয়ে নিয়ে ভয় পেয়ে আসছিল। সে যে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে কোনো সমস্যায় পড়েনি তা বলা চলে না। তার বাবা দুবার তাকে বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে গত বছর, কিন্তু প্রতিবারই স্কুলের শিক্ষকদের চেষ্টায় তা থামানো গেছে। সে বিনা বেতনে এনজিও স্কুলে পড়ে, তাই তার বাবা অর্থনৈতিক কারণ দেখিয়ে তাকে পড়া ছাড়াতে পারে না। তবে মিতু সারক্ষণ চিন্তা করে ৮ম শ্রেণির পরে কী হবে, যেহেতু তার বর্তমান স্কুলটা ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত। তাছাড়া পড়ার জন্য তার এখন অনেক সময় দরকার এবং এক বছর পরে তার প্রাইভেট পড়ার জন্য টাকা লাগবে জেএসসি (জুনিয়র সার্টিফিকেট পরীক্ষা)-তে পাস করবার জন্য। এরপর তাকে পরিবারের কাছে হাত পাততে হবে। মিতু পড়ায় ঠিকভাবে মন দিতে পারে না কেননা স্কুলের সময়টুকু ছাড়া তাকে তার মা'কে সাহায্য করতে হয়। তাকে পানি আর লাকড়ি আনতে হয়, ছোট ভাই-বোনদের দেখতে হয়, কাপড় ও থালাবাটি ধুতে হয়, ছোট ২ ভাই-বোনকে পড়ায় সাহায্য করতে হয় এবং বড় ভাইয়ের হুকুম তামিল করতে হয়। যেমন- তার খাবার আনা, কাপড় ধোয়া ইত্যাদি। তাকে বাসার সব কাজ করতে হয় কারণ তার মাকে বেশিরভাগ সময় বাবার বদলে তাদের দোকানে বসতে হয় যখন তার বাবা নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে। সে মিন্টুর থেকে

থেকে লেখাপড়ায় কোনো সাহায্য পায় না, সে নিজের লেখাপড়া, প্রাইভেট পড়া আর বন্ধুদের সাথে দেখা করা, খেলাধুলা এবং ভিডিও গেম খেলায় ব্যস্ত থাকে। তার কোনো চিন্তা নেই কারণ সে জানে পরিবার তার জন্য যে কোনো খরচ করতে রাজি। তার বোনদের ভবিষ্যৎকে বলি দিতে পারবে তার লক্ষ্যপূরণ হবার জন্য। অন্যদিকে মিন্টুও অনেক চাপের মধ্যে থাকে যখন তার বাবা তাকে বলে যে লেখাপড়ায় ভালো করতে। কারণ তাকে ভবিষ্যতে পরিবারের উপার্জনকারী হতে হবে, সে ছোট ভাইবোনদের মানুষ করবে, দুই বোনের বিয়ের খরচ জোগাবে আর মা-বাবাকে দেখাশোনা তাকেই করতে হবে। সোজা কথায়, তারা তার ওপরেই নির্ভর করে কেননা সে পরিবারের উত্তরাধিকারী।

- এখন দল-১ ও ৩-কে জিজ্ঞেস করুন নিচের প্রশ্নগুলো এবং তাদেরকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উত্তর দিতে বলুন :

১. পরিবারে উপার্জনকারী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর ভূমিকা কে পালন করছে? বাবার কাজ কী? তিনি কি তার স্ত্রীর মতো গৃহকর্মগুলো করেন? আয় করা বা তার বাবার মতো উপার্জনকারীর ভূমিকা পালন করার ক্ষেত্রে মিতুর মায়ের চ্যালেঞ্জগুলো কী?

২. মেয়েদের লেখাপড়া চালানোর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা কী কী?

৩. নারী ও পুরুষের সম্পর্ক কেমন থাকা উচিত যাতে পরিবারের লাভ হয়?

৪. গল্পটি অনুযায়ী পরিবারের সদস্যদের একে অপরের প্রতি কেমন আচরণ হওয়া উচিত যা উৎসাহিত করতে পারে তাদের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে?

গল্প ২

কাব্য ও কঙ্কার আলাপ হয় ছাত্রজীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাদের প্রেম হয়, লেখাপড়া শেষে তারা দু'জনেই চাকরি পায় এবং চার বছর আগে বিয়ে করে। বিয়ের আগে কঙ্কা কাব্যকে পরিষ্কারভাবে বলেছিল যে, লেখাপড়া শেষে সে চাকরি করবে এবং তা বিয়ের পরও চালিয়ে যাবে। কাব্য তার সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়েছিল। বিয়ের কিছুদিন আগে কাব্য একটা বাসা ভাড়া করে বিয়ের পরে কঙ্কার সাথে থাকার জন্য। তারা ভাড়া বাসার ব্যাপারে একসাথে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল- কোথায় বাসা নেবে, কত ভাড়া হবে, কোন্ বাসাটা সবচাইতে ভালো। বিয়ের পর তারা খুব ভালোভাবে সময় কাটাচ্ছিল, বাসার আসবাবপত্র কিনতে একসাথে খরচ করেছিল, রেস্তোরাঁয় একসাথে খেয়েছিল, একসাথে কেনাকাটা করা ও ছুটিতে খরচ করা এবং আরও অনেক মজা। দু'জনেই একে অপরকে না জিজ্ঞেস করে নিজেদের টাকায় নিজ পরিবারের সদস্যদের উপহার কিনে দিতে পারত।

এক বছর চলে যায়। তারপর কঙ্কা লক্ষ্য করে যে বাসায় ফেরার পথে তাকে শাকসবজি কিনতে হয়, রাতের খাবার আর পরের দিনের দুপুরের খাবার রান্না করতে হয়, ঘর সামলাতে হয়, কাপড় আর থালাবাটি ধুতে হয়, খাবার টেবিলে খাবার দিতে হয়। সে আর কাব্য প্রায় একই সময়ে ঘরে ফেরে, কিন্তু ঘরে ফিরে কাব্য টিভি দেখা শুরু করে বা তার পরিবার ও আত্মীয়দের সাথে ফোনে কথা বলে। সে চা-নাস্তা চায় কঙ্কার কাছে। রাতের খাবার রান্না আর ঘর গোছগাছে ব্যস্ত সেটা দেখার পরও। প্রথমদিকে কঙ্কা খুশি মনেই করত সংসার আর কাব্যর জন্য, কিন্তু

একপর্যায়ে সে ক্লান্তবোধ করতে থাকে। অনেক সময় কাব্যর পরিবারের সদস্যদেরও দেখাশোনা করত কঙ্কা, যখন তারা চিকিৎসার জন্য তাদের বাসায় আসত বা কোনো অতিথি আসত। কাব্য ছুটির জন্য সময় করতে পারত না, বা পারলেও কোথায়, কখন আর কীভাবে যাবে সেটা সে একাই ঠিক করত, যদিও ছুটি কাটানোর টাকা কঙ্কাও দিত।

২ বছর পর তাদের মেয়ে কথা জন্মানোর পরে পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকে। গর্ভকালীন কঙ্কার সব কাজ করতে হয়েছে। অনেক সময় কাব্য খাবার বানাতে বা টেবিল সাজাতে সাহায্য করত কিন্তু অনিচ্ছার সাথে। গর্ভকালীন কঙ্কা তার কাপড়চোপড় লন্ড্রিতে ধুতে দিত কিন্তু কাব্য পরিষ্কার হওয়া নিয়ে খুঁতখুঁত করত। সে হতাশ হতো যে ঠিকমতো সেবা পাচ্ছে না তার গর্ভকালীন অবস্থার জন্য। এসব কারণে কঙ্কার শরীর খারাপ লাগলেও ঘরের কাজ করত। কথার জন্মের পরে কঙ্কার মা কিছুদিন ছিলেন তার আর নতুন শিশুর দেখভাল করার জন্য। তবে মা কিছুদিন পরে চলে যান কারণ তারও নিজের সংসার আছে। কঙ্কা ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি পেয়েছিল মেয়ের জন্মের পরে। এ সময় সে বাচ্চার যত্ন করে এবং ঘর সামাল দেয় একা। একজন পরিচারিকা তাকে কিছুক্ষণের জন্য সাহায্য করত, কিন্তু তা যথেষ্ট ছিল না। সে ভাবত যে কাব্য অফিস থেকে বাসায় ফিরলে সে একটু বিশ্রাম নিতে পারবে, কারণ রাতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারত না বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানো আর কাঁথা বদলানোর জন্য। কিন্তু কাব্য সোজা বলে দেয় যে সে বাচ্চার যত্ন নিতে পারবে না; সে যেটা করতে পারে যে বাচ্চাকে কিছুক্ষণ দোলাতে পারবে তবে বাচ্চার দুধ বানানো বা খাওয়ানো, কাঁথা বদলানো বা সে যখন কাঁদে তখন তাকে থামানো, তার পক্ষে সম্ভব না। যেন কঙ্কা দৈবভাবে এসব শিখেছে বা মায়ের পেট থেকে শিখে এসেছে!

মাতৃত্বকালীন ছুটিশেষে তাকে আবার অফিসে ফিরতে হয়। এ সময়ে একটা কঠিন প্রশ্নের উদয় হয়- অফিসে থাকার সময়ে বাচ্চাকে কে দেখবে? তখন তারা ঠিক করে যে কঙ্কার মায়ের বাসার কাছে বাসা নেবে, কঙ্কার মা কথার দেখাশোনা করতে পারে অফিস চলাকালে। এবার কাব্য বাসার ভাড়া, কত বড় এবং কোথায় হবে কঙ্কাকে কিছু না জিজ্ঞেস করেই ঠিক করে।

এবার কঙ্কার ঘাড়ে আরেকটা কাজ চাপে। তাকে ফেরার পথে বাচ্চাকে তার মা'র বাসা থেকে তুলে আনতে হয়। জন্মের প্রথম বছরেই কথা কয়েকবার অসুস্থ হয়ে পড়ে, কাব্য ঠিক করত কোন ডাক্তারের কাছে যাবে, কখন এবং ক'টার সময়, অথচ কঙ্কাই অফিস থেকে ছুটি নিত বাচ্চাকে দেখার জন্য। এদিকে কাব্য কোনোদিনই ছুটি নেয়নি কারণ তার মনে হয় যে, বাচ্চাকে দেখার দায়িত্ব শুধু মায়ের। তাছাড়া তার মতে, অফিসে অনেক দরকারি কাজ আছে তার, সেগুলো সে বাদ দিতে পারবে না। ঘন ঘন ছুটি নেবার কারণে অফিস থেকে মৌখিকভাবে সতর্কবার্তা পায় কঙ্কা, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে কাজে অবহেলার।

এভাবে প্রায় এক বছর পার হয়; ধীরে ধীরে কঙ্কার মনে হতে থাকে সংসারের সব দায়িত্ব শুধু তার এবং তা তার কাছে বোঝার মতো। কাব্যর দিক থেকে অবহেলা তার উপলব্ধিকে আরও জোরদার করে। অনেক সময়ই সে তার চাকরি ছাড়ার কথা ভাবে, কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক চাকরির বাজার আর চাকরির অভাবের কথা ভেবে সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। কয়েক মাস আগে তার মা মারা যাওয়ায় তার শেষ আশাটিও হারিয়ে গেছে। কঙ্কা কয়েকবার কাব্যর সাথে আলোচনা করেছে বাচ্চাকে কে দেখবে তাই নিয়ে। সে কোনো বিকল্প পথ গ্রহণ করতে চায় না বরং সিদ্ধান্ত দেয় যে কঙ্কাকে চাকরি ছেড়ে দিতে হবে আর বাচ্চার দেখাশোনায় পুরো সময় দিতে হবে। অনেক ঘুমহীন রাত পার করে কঙ্কা শেষে ঠিক করে যে চাকরি ছেড়ে দেবে। এখন কঙ্কা পুরোদস্তুর গৃহবধূ, ঘরের খরচ চালাতে তাকে তার স্বামীর কাছে হাত পাততে হয় এবং নিজের সাধ-আহ্লাদ জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে। যেহেতু একজনই উপার্জন করছে, সংসারের আয় কমেছে আর কাব্যর ওপরে চাপ বেড়েছে, কারণ এখন ঘরের অর্থনৈতিক অবস্থা তার ওপর নির্ভর করছে। কঙ্কার জীবনে খুশি থাকা আর আর আনন্দ করার স্বপ্ন উধাও হয়ে গেছে। তার ভাগ্য এখন স্বামীর হাতে সমর্পিত।

- দল-২ ও ৪-কে নিচের প্রশ্নগুলো করুন এবং সবাইকে বলুন অংশগ্রহণ করতে ও উত্তর দিতে।

১. কোন্ কারণে কাব্য ও কঙ্কার বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকে সুখ ছিল?

২. কেন কঙ্কার দায়িত্বগুলো বোঝা মনে হয়েছিল?

৩. তোমরা কি কাব্য ও কঙ্কার জীবনে বা তাদের সম্পর্কে কোনো অসমতা দেখতে পাও? অসমতাগুলো কী কী?

৪. তোমরা কি এমন কোনো কাজ বা ভূমিকা দেখতে পাও যা কাব্য কঙ্কার সাথে করতে পারত?

৫. চাকরি ছেড়ে দেয়াটা কি কঙ্কার ঠিক সিদ্ধান্ত ছিল? সিদ্ধান্তটিতে কি পরিবারের কোনো লাভ হলো?

৬. আর কোনো বিকল্প পথ বা উপায় কি ছিল যা কঙ্কাকে চাকরি না ছাড়তে সাহায্য করতে পারত?

- দলগুলোকে বলুন গল্পগুলোর বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ফ্লিপ কাগজে দুটি উপস্থাপনা তৈরি করতে, একটি হলো ছেলেরা কী ভূমিকা পালন করতে বা মেয়েদের প্রতি কী ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটাতে পারে সত্যিকার অর্থে সমতা আনতে, আর অন্যটা হলো মেয়েরা কীভাবে তাদের আশা ও স্বপ্নকে জলাঞ্জলি না দিয়ে আর নিজেদের ভাগ্যের হাতে বা তারা যে অবস্থায় আছে সেটার ওপরে ছেড়ে না দিয়ে স্বপ্নটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। দলীয় কাজ হয়ে গেলে প্রতিটি দল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে

- দলীয় উপস্থাপনা শেষে তাদেরকে ব্যাখ্যা করুন যে এই কাজের মাধ্যমে তোমরা বুঝতে পেরেছ নির্ধারিত জেন্ডার ভূমিকার ফল কী হয়। এটি নারী ও পুরুষ উভয়ের ওপরই অনেক চাপ সৃষ্টি করে। নির্ধারিত জেন্ডার ভূমিকা নারী ও পুরুষ উভয়ের ওপরই নানান বিধিনিষেধ আরোপ করে তাদের স্বাধীনতাকে কমিয়ে দেয়। যদিও সমাজ জেন্ডার ভূমিকা নির্ধারণ করে দিয়েছে, কিন্তু এগুলোকে প্রশ্ন করা যাবে। গৃহকর্মে নারী-পুরুষ উভয়েই যে একই ভূমিকা পালন করতে পারে, তার ওপর ফ্লিপ শিটটি দেখান

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন যে আজকের আলোচনার ওপর তাদের 'বাড়ির কাজ' করতে হবে। ছেলেরা পরিবারে গৃহকর্মে অংশ নেবে এবং তাদের স্ক্র্যাপ খাতায় লিখে রাখবে কাজগুলো করতে গিয়ে তাদের কেমন লাগল। মেয়েরা করবে ভিন্ন কাজ যা তারা পরিবারে সাধারণত করে না। মেয়েরাও স্ক্র্যাপ খাতায় লিখে রাখবে তাদের অনুভূতির কথা

- তারা যদি কোনো বিরোধিতার সম্মুখীন হয় পরিবারের কোনো সদস্যের কাছ থেকে যখন তারা জেন্ডারের চিরাচরিত ভূমিকার বাইরে কাজ করতে যাবে, বা যদি তারা অন্য কোনো ভূমিকা পালন করতে কিংবা অন্য কোনো কাজ করতে ভীত বা অনিশ্চিত থাকে তবে তারা সেসবও লিখে রাখবে।

সহায়কের জন্য তথ্য

প্রতিটি মানুষই তার পরিবারের সদস্য। পরিবারের সদস্যদের উচিত সুখ, দুঃখ, যন্ত্রণা ভাগ করে নেয়া এবং একে অপরের আশাকে সম্মান করা। নারী ও পুরুষের কোনো স্থির ভূমিকা থাকা উচিত নয় সন্তান জন্ম দেয়া ছাড়া। কেউ যদি তার পরিবারকে ভালোবাসে, তবে পরিবারের সবাইকে তার সহায়তা করা উচিত। সব সিদ্ধান্ত পারস্পরিক সমঝোতা, বিবেচনা, সবার সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করে নেয়া উচিত। যে কোনো সিদ্ধান্ত নিলে সেটা পরিবারের সব সদস্যের জন্য সুবিধাজনক বা সবার জন্য ন্যায্য হওয়া উচিত। সবচাইতে ছোট সদস্যেরও মতামতকে অগ্রাহ্য বা ছোট করে দেখা উচিত নয়। একটা কথা মনে রাখতে হবে- ছোটরা বড়দের থেকে শেখে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, অল্প বয়সীরা বড়দের কাছ থেকে শেখে। আমাদের সবসময়ই মনে রাখতে হবে সবারই সমান অধিকার রয়েছে স্বাধীনতা এবং সুযোগ উপভোগ করার। পরিবারে সমতা স্থাপন করা উচিত বৃহত্তর সমাজে সমতা পাবার জন্য।

নির্ধারিত জেন্ডার ভূমিকা অন্যায্য। আজকাল অনেক মানুষ বুঝতে পেরেছে যে নির্ধারিত ভূমিকার পরিবর্তন হওয়া উচিত। আজকাল যখন অনেক বেশি নারী ঘরের বাইরে কাজ করছে, তখন স্বামী, ভাই বা ছেলেসহ পরিবারের সদস্যরা যদি গৃহকর্ম ভাগ করে নেয় সেটা ভালো হয়। তাহলে নারীর আর গৃহকর্মকে বোঝা মনে হবে না। সমাজের মানুষ বলতে পারে: 'একটা ছেলে বা পুরুষ কী করে গৃহকর্ম করবে? এটা তো মেয়েদের কাজ... একজন মা যেভাবে মমতা আর ভালোবাসা দিতে পারবে বাচ্চাকে, একজন বাবা তা পারবে না। মা যেভাবে বাচ্চাকে পরিষ্কার রাখতে পারবে, বাবা পারবে না'। আমরা কি কখনো এমন কথার উত্তরে বলেছি যে, একটি শিশু তার মা-বাবা দু'জনেরই। যদি মা তার শিশুকে ভালোবাসতে পারে, তাহলে একজন বাবা কেন পারবে না? নারীরা কি শিশুর লালন মায়ের পেট থেকে বা জন্ম থেকেই শেখে? নারী ও মেয়েরা তাদের জীবনের শুরু থেকেই শেখে যে তারা মমতাময়ী, নরম, কোমল হৃদয়ের এবং তারা সন্তানধারণ করবে; তাই স্বয়ংক্রিয়ভাবে শিশু লালন এবং যত্ন তাদের কাছে চলে যায় (অনুগ্রহ করে সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ার আলোচনার কথা উল্লেখ করুন)। ছেলে ও পুরুষদেরও অভ্যাস নারীকে এসব কাজ করতে দেখার। যদি কোনো ছেলেকে বাচ্চার যত্ন করতে হয়, তাহলে তাকে নিজেকেই তা শিখে নিতে হবে। এই সমাজই মানুষের জৈবিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রমবিভাজন করে।

বর্তমান যুগে অনেক মেয়ে লেখাপড়া করছে এবং আয় করছে। যদি তাদের আয় করা এবং পরিবারে অবদান রাখার সুযোগ দেয়া হয়, তাহলে পরিবারের জন্য আয় করা শুধু পুরুষের কাজ থাকবে না।

জেন্ডার ভূমিকা সমাজের তৈরি করা। কিন্তু যদি এই ভূমিকা অন্যায্য মনে হয় সমাজের পক্ষে, তাহলে আমাদের উচিত চিন্তা করা, এগুলোকে প্রশ্ন এবং পরিবর্তন করা। পরিবর্তনের প্রক্রিয়া অবশ্য আগেই শুরু হয়ে গেছে। আমরা অনেক স্বামীকে দেখি যে স্ত্রীর সাথে গৃহকর্ম ভাগ করে নেয়, সন্তানকে দেখে, পরিবারে কোনো অনভিপ্রেত সমস্যা দেখা দিলে অফিস থেকে ছুটি নেয়। অনেক নানা/দাদা নাতি-নাতনিদেরকে স্কুলে আনা-নেওয়া করে, যেন মেয়ে বা পুত্রবধূরা তাদের কাজ করে যেতে পারে। অনেক পুরুষ এখন শিশুকে কর্মস্থলে নিয়ে আসে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে, যদি বাসায় বাচ্চাকে দেখার কেউ না থাকে; নারী-পুরুষ উভয়ই পরিবারের আয়ে অবদান রাখে, সম্পত্তি কিনতে যৌথভাবে সঞ্চয় ব্যয় করে, ছুটি বা সন্তানের ভবিষ্যৎ শিক্ষাজীবনের পরিকল্পনা করে, তাদের সেক্স যা-ই হোক না কেন। আজকাল অনেক মা-বাবা তাদের কর্মজীবী মেয়ের বাসায় থাকে তাদের সাহায্য করার জন্য। আমাদের উচিত এই পরিবর্তনকে এগিয়ে নেয়া এবং পরিবার ও সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠা করা।

- অংশগ্রহণকারীদের বাড়ির কাজের ক্ষেত্রে এমন হতে পারে যে ছেলেরা গৃহকর্ম করতে গেলে তার মা/দাদী থামিয়ে দিতে পারে, কিন্তু যখন কোনো মেয়ে দোকানে যাবে বা রান্নাঘরের কাজে সাহায্য না করে পড়তে বসবে, তখন পরিবারের মানুষের বাধা আরও বেশি আসবে।

- মেয়ে ও ছেলেদের জিজ্ঞেস করতে পারেন যে, গৃহকর্মের মধ্যে তারা কোন্‌টা বেশি করতে পছন্দ করে এবং তারা আসলে কী করে। বেশিরভাগ মেয়েই হয়তো বলবে গৃহকর্মসংক্রান্ত কিছু (তাদেরকে করতে বাধ্য করা হয়) কিন্তু তারা পড়তে চায়; ছেলেরা হয়তো বলবে তারা মা-বাবার প্রত্যাশাকে বোঝা মনে করে।

অধিবেশন ২.২ জেন্ডার এবং কাজ : প্রচলিত ভিত্তিহীন জনশ্রুতি না কি সত্যি? কাজের ক্ষেত্রে জেন্ডার সম্পর্কিত প্রচলিত ভিত্তিহীন জনশ্রুতি ভেঙে দেয়া

উদ্দেশ্য

- সামাজিকভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া নারী ও পুরুষের জন্য কাজ বা পেশা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা
- ব্যক্তির পেশা তার পছন্দ, দক্ষতা, যোগ্যতা এবং সুযোগের ওপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত, জেন্ডার পরিচয়ে নয়, এই বিষয়ে জানা

পদ্ধতি

খেলা, আলোচনা, মুক্তচিন্তার ঝড়

উপকরণ

নারী ও পুরুষ যে একই পেশার হতে পারে তার ওপর ফ্লিপ শিট, কাঠামো বানানোর জন্য এক গোছা ছোট লাঠি, মাস্কিং টেপ, ময়দার মণ্ড (যেটা সহজে পাওয়া যাবে), পোস্টার/ফ্লিপ কাগজ এবং মার্কার, পোস্টার-৭

সময়

৪৫ মিনিট

প্রক্রিয়া

- শুরুতে অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন তাদেরকে যে 'বাড়ির কাজ' দেয়া হয়েছিল আগের সেশনে সে সম্পর্কে। কয়েকজন অংশগ্রহণকারীকে (সমসংখ্যক মেয়ে ও ছেলে) বলুন তাদের 'বাড়ির কাজ' এবং অনুভূতি নিয়ে বলতে [আগের সেশনগুলোতে যারা বলেনি, তাদেরকে অগ্রাধিকার দিন]। অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ দিন 'বাড়ির কাজ'টি করার জন্য।

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন আমাদের সমাজে আমরা মনে করি যে, কোনো কোনো কাজ বা পেশা শুধুই ছেলেদের জন্য, সেগুলো মেয়েদের জন্য উপযোগী নয়। আমরা অনেক সময় মেয়েদের অবহেলা করে তাদের বলি যে- 'এগুলো তোমার কাজ নয়, ছেলেদের কাজ'। এখন অংশগ্রহণকারীদের পোস্টার-৭ দেখিয়ে অনুরোধ করুন পোস্টারটির খালি অংশ পূরণ করতে। তাদের বলুন যে যখনই আপনি নিচের পেশা এবং জিনিসগুলোর নাম একটি একটি করে বলবেন সাথে সাথে তারা সেই পেশা এবং জিনিসের সাথে নারী না পুরুষ জড়িত তা বলবে।

পোস্টার ৭

জিনিস	নারী/পুরুষ	পেশা/অবস্থান	নারী/পুরুষ
হাতুড়ি		নার্সিং	
ঝাড়ু		পর্যটক গাইড	
সেলাই মেশিন		শিক্ষক	
চামচ		চিকিৎসক	
স্ক্রু ড্রাইভার		ব্যাংকার	
হেলমেট		স্থপতি	
ক্লিপ/চুলের ব্যান্ড		যন্ত্র প্রয়োগকারী	
গয়না		কৃষক	
কসমেটিক্স		গাড়িচালক	
হাঁড়িপাতিল		পাইলট	
ব্রিফকেস		সভাপতি	
চুলা		পরিচালক	
		হিসাবরক্ষক	
		ব্যবসায়ী	
		প্রকৌশলী	
		বিমানচালক/ভ্যানচালক	
		হকার	
		রূপচর্চা প্রয়োগকারী	
		রাজনৈতিক নেতা	
		ঝাঁধুনি	
		নাপিত	
		সেনা	
		পুলিশ	
		গায়ক/নৃত্যশিল্পী	
		কল সেন্টারকর্মী	

- **পোস্টারের কাজ শেষ হয়ে গেলে নিচের প্রশ্নগুলোর ওপরে আলোচনা করুন :**

১. আমরা কেন কিছু নির্দিষ্ট জিনিস বা পেশার সাথে নারী অথবা পুরুষকে জড়িত করি?

২. ভূমিকার ক্ষেত্রে কি কোনো আধিপত্যের ব্যাপার আছে? কেন আছে?

৩. যখন এসব কোনো ভূমিকা বা পেশার সাথে অর্থনৈতিক মূল্য যোগ হয় তখন কী ঘটে?

৪. নারী বা পুরুষ কোন্ কাজ করবে তার কোনো জৈবিক ভিত্তি আছে কি?

অংশগ্রহণকারীরা জিজ্ঞেস করতে পারে 'একজন মেয়ে কীভাবে রিক্সা চালাবে বা ড্রাইভার হবে?' তাদের জিজ্ঞেস করুন 'কেন পারবে না বলে তোমাদের মনে হয়?' উত্তর আসতে পারে 'এটাতো ছেলের কাজ', 'মেয়েদের এত শক্তি নেই বা শরীরের গঠন ছেলেদের মতো না এমন কাজ করার জন্য', 'আমরা কখনো কোনো মেয়ে বা মহিলাকে রিক্সা চালাতে দেখিনি'। তাদের বলুন গ্রামে অনেক মেয়ে ভ্যান চালিয়ে সবজি বা অন্য জিনিস বিক্রি করে পরিবারে উপার্জনক্ষম ছেলে সদস্য না থাকার কারণে, তাদের অনেকের লেখাপড়া জানা না থাকলেও তারা সাইকেল বা মোটরসাইকেল চালায়। শহরে অনেক নারী তাদের নিজেদের গাড়ি চালায়, অনেক প্রতিষ্ঠান পুরুষের পাশাপাশি নারী গাড়িচালক নিয়োগ দেয়; আমাদের এখন নারী পাইলট, ট্রেন চালকও আছে, নারীরা সেনাবাহিনীতে, পুলিশে, বিভিন্ন বেসরকারি ও কর্পোরেট অফিসে উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনায় আছে (যেমন- রূপালী চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক - বার্জার পেইন্ট, সোনিয়া বশির কবির, ব্যবস্থাপনা পরিচালক - মাইক্রোসফট বাংলাদেশ) এবং সরকারের নেতৃস্থানীয় পদেও আছে।

- তাদের জিজ্ঞেস করুন মেয়েরা যদি সিদ্ধান্ত নিতে না পারে, তাহলে আমরা কী করে আমাদের সমাজে নেতৃত্বের পদে তাদের দেখতে পাই
- তাদের ব্যাখ্যা করতে থাকুন যে, মেয়েরা কিছু কাজ করতে পারে না বলে আমরা মনে করি এবং তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতা তৈরি বা ব্যবহার করতে না দিয়েই আমরা তাদের যোগ্যতার ওপরে সন্দেহ করি। সেজন্যই যেসব পদ সচরাচর ছেলেদের সাথে যুক্ত, সেসব পদে মেয়েদের সংখ্যা অনেক কম। যারা এসেছে তাদেরকে অনেক চ্যালেঞ্জে আর প্রচলিত বৈষম্যের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে সফলতা পেতে। এটা অনেকটা কারো ২ হাত বেঁধে, সাঁতার না শিখিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিতে বলার মতো। প্রকৃতপক্ষে, সমাজ নারী বা মেয়েদের বাইরে যাওয়া, কাজ বা উপার্জন করা অনুমোদন করে না কারণ এটি তাদের দায়িত্ব ও ভূমিকা নয়; অন্যদিকে মেয়েরা যথাযথ শিক্ষা, পুষ্টি এবং অন্যান্য অধিকার পায় না এই বলে যে তাদের উপার্জন করতে হয় না। এসব রীতিকে চ্যালেঞ্জ করতে হলে আমাদের যেসব কাজ 'পুরুষের' বলে ভাবা হয়, সেসব কাজে মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। এটা সমাজকে নাড়া দেবে এই চিন্তা করার জন্য কোন পেশা মেয়ে না ছেলে তার ওপর নয়, বরং তা নির্ভর করে ব্যক্তির দক্ষতা, যোগ্যতা ও আত্মবিশ্বাসের ওপর। আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস হচ্ছে এই লক্ষ্যপূরণের পূর্বশর্ত। মেয়ে ও নারীদের উচিত আত্মবিশ্বাস রাখা এবং ছেলে/পুরুষের সাথে যুক্ত যে কোনো ভূমিকা পালন করার জন্য চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মতো সাহস দেখানো। আগেকার দিনে খুব কম নারী ও মেয়েরা উচ্চশিক্ষা পেত, শ্রমশক্তিতে প্রবেশ করত এবং থাকত, যা আমরা আগের সেশনগুলোতে দেখেছি। আজকাল সময় ও প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের সাথে সাথে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে এবং আমরা নারীদের সংখ্যা বাড়তে দেখছি।
- আলোচনা চলাকালে অংশগ্রহণকারীদের একই পেশায় নারী ও পুরুষের ফ্লিপ শিটটি দেখান।
- আলোচনা শেষের পর অংশগ্রহণকারীদের বলুন যে তারা এখন একটি দলীয় খেলা খেলবে। খুব বেশি হলে ৫ জনের একটি করে দল করুন। দলে মেয়ে ও ছেলে উভয় সদস্য থাকবে। একজন করে সদস্যকে প্রতিটি দলের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হবে। আপনি পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করবেন যেন একটি বা দু'টি দলের নেতৃত্বে একটি করে মেয়ে থাকে। প্রতিটি দলকে নির্দেশ দিন একটি কাঠামো তৈরি করার জন্য যেসব উপকরণ দেয়া হবে তার সাহায্যে এবং নিশ্চিত করতে হবে যেন কাঠামোটি নিজ থেকেই দাঁড়িয়ে থাকে। তাদেরকে উপকরণগুলো দিন এবং ৫ মিনিট সময় দিন। নির্ধারিত সময়ের পরে তাদের বেশি সময় নিতে দেবেন না এবং তারা ঠিক যেখানে আছে, সেখানেই থামিয়ে দিন

- এই পর্যায়ে এসে যে স্কুলে জেন্ডার সেশন চলছে, সেখানকার একজন নারী ও একজন পুরুষ শিক্ষককে দলীয় কাজটিকে মূল্যায়ন করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। বিচার করার আগে প্রতিটি দলকে বলতে বলুন কাজটি করার সময় তাদের দলীয় অভিজ্ঞতা কেমন ছিল, উদ্দেশ্যপূরণ বা না পূরণের কারণগুলো বলতে বলুন। অনুগ্রহ করে নিশ্চিত করুন যে বিচারকরা যেন যেই কাঠামোগুলো বানানো হয়েছে সেগুলোর মান, পরিকল্পনা করার ক্ষমতা, নেতৃত্ব এবং সামগ্রিক দলীয় কাজের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করে
- ফলাফল দেবার পরে, অনুগ্রহ করে ব্যাখ্যা করতে ভুলবেন না যে, দলীয় কাজ নির্ভর করে দলের কর্মীদের দক্ষতা, যোগ্যতা, ইচ্ছা, দৃষ্টিভঙ্গি, পারস্পরিক সম্মান, নেতৃত্বের ভূমিকা এবং উদ্দেশ্য পূরণে ব্যক্তির দায়বদ্ধতার ওপর। তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন কোনো দল কি খারাপ করেছে কারণ সেই দলে মেয়ে নেতৃত্ব বা সদস্য আছে বলে? বা এ ধরনের কাজ মেয়েদের জন্য নয় এবং তাদের ছেলেদের মতো চিন্তা ও তৈরি করার ক্ষমতা নেই বলে? কেউ যদি এমন কথা বলে তাহলে তাদেরকে মতামত জাহির করতে দিন এবং অন্যদেরও যারা এমন চিন্তার বিরুদ্ধে, তাদের অনুরোধ করুন তাদের গ্রহণযোগ্য মতামত আর যুক্তিযুক্ত তর্কের মাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক করতে। সতর্ক থাকুন যেন বিতর্কটি বেশিক্ষণ ধরে না চলে এবং রূঢ় রূপধারণ না করে। দু'জন শিক্ষককে বিচারকের ভূমিকায় রাখার উদ্দেশ্য হলো দলীয় কাজটিকে অনেক বেশি মূল্যায়িত করার পাশাপাশি আলোচনায় শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গিও সমন্বিত করা।

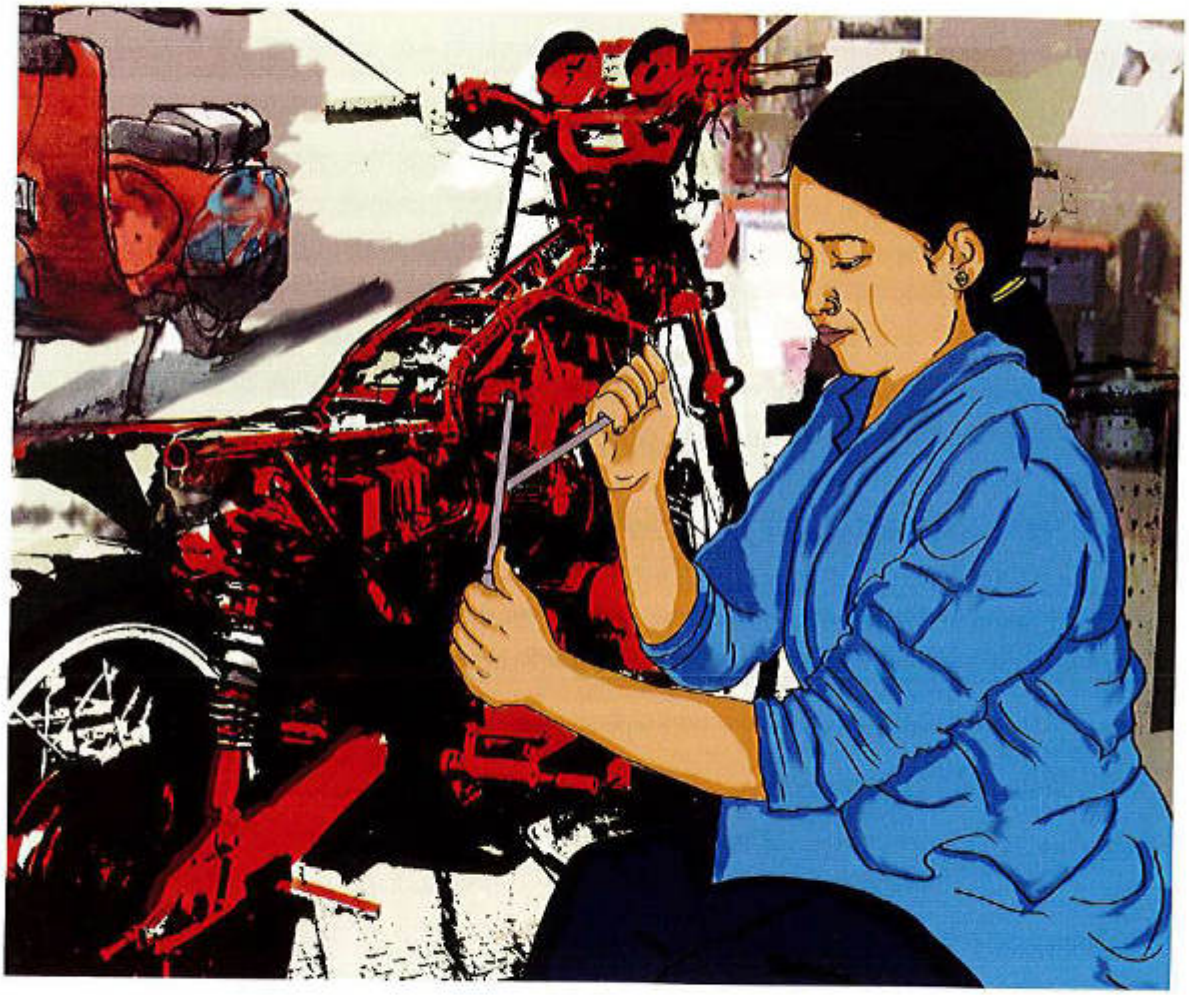

অধিবেশন ২.৩ জেন্ডার অসমতা এবং কর্মস্থলে জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য

উদ্দেশ্য

- জেন্ডার অসমতা এবং কর্মস্থলে জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্যের ওপর সচেতনতা সৃষ্টি করা

পদ্ধতি

আলোচনা

সময়

৪০ মিনিট

প্রক্রিয়া

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন আগের সেশনে আমরা বুঝেছি কীভাবে সমাজের প্রত্যাশা, বৈষম্যমূলক রীতি, দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস, চর্চা এবং চিরাচরিত জেন্ডার ভূমিকা কর্মক্ষেত্র ও কর্মস্থলে জেন্ডার অসমতা ও বৈষম্য সৃষ্টি করে। এসব অসমতা ও বৈষম্য শুধু বাংলাদেশে নয় সমস্ত পৃথিবীতেই আছে।
- কিছু তথ্য ও উপাত্ত তুলে ধরুন ওপরের কথাগুলো পরিষ্কার করার জন্য।

তথ্য ও উপাত্ত

- সারা পৃথিবীর ৭৯৬ মিলিয়ন অশিক্ষিত মানুষের দুই-তৃতীয়াংশ হচ্ছে নারী
- কর্মঘণ্টায় জেন্ডার অসমতা আজও সবদেশে রয়ে গেছে। বৈতনিক ও অবৈতনিক কাজ যোগ করলে, উন্নয়নশীল দেশের নারীরা পুরুষের চাইতে অনেক বেশি কাজ করে আর কম সময় ব্যয় করে শিক্ষা, অবসর, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং নিজের যত্নে। প্রায় সকল দেশে পুরুষরা প্রতিদিন যতটা সময় অবসর কাটায়, নারীরা তার চেয়ে বেশি সময় অবৈতনিক গৃহকর্মে ব্যয় করে
- উন্নয়নশীল দেশে কৃষিশ্রমের গড়ে ৪৩ শতাংশ হচ্ছে নারী। নারী কৃষকরা পুরুষের চাইতে অনেক কম জমি নিয়ন্ত্রণ করে এবং ফসল, বীজ, ঋণ ও কৃষি সম্প্রসারিত সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সুযোগ সীমিত
- ২০ শতাংশেরও কম জমির মালিক নারী। জমি ও ঋণের ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারে জেন্ডার বিভাজন নারী/পুরুষ কৃষক এবং উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ থেকে লাভবান হওয়ার সক্ষমতার ওপর প্রভাব ফেলে
- পুরুষের চাইতে নারীরা অনেক ঝুঁকিপূর্ণ, স্বল্প বেতনের বা অমূল্যায়িত কাজ করে। ২০১৩ সালে ৪৬.৯% পুরুষের তুলনায় ৪৯.১% শ্রমজীবী নারী ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ছিল, বেশিরভাগ সময়ে শ্রম আইনে অরক্ষিত ছিল
- নারীরা শ্রমবাজারে পুরুষের তুলনায় অসমতার ভিত্তিতে কাজ করে চলেছে। ২০১৩ সালে জনসংখ্যা অনুযায়ী পুরুষদের কর্মসংস্থানের হার ছিল ৭২.২% এবং যেখানে নারীর হার ৪৭.১%
- সারা বিশ্বে নারীরা পুরুষদের তুলনায় কম বেতন পায়। বেশিরভাগ দেশে নারীরা পুরুষের বেতনের ৬০ থেকে ৭৫ শতাংশ পায়। এর পেছনের কারণগুলো হলো নারীরা বেতনভুক্ত কর্মী না হয়ে হয় অবৈতনিক পরিবারকর্মী; তারা অনেক বেশি কম উৎপাদনশীল কাজ করে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে যেখানে পুরুষের তুলনায় তাদের প্রাতিষ্ঠানিক খাতে যাওয়ার গতিশীলতা কম এবং মেয়েদেরকে দেখা হয় অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল হিসেবে।

- মেয়েরা প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং সঞ্চয়ের বন্দোবস্তে অনেক কম পৌছাতে পারে। বিশ্বে ৫৫ শতাংশ পুরুষের প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে সঞ্চয়ী হিসাব আছে আর মাত্র ৪৭ শতাংশ নারীর তা আছে। এই ব্যবধান নিম্ন-মধ্যম আয়ের অর্থনীতিতে; দক্ষিণ এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকাতে সবচেয়ে বেশি
- ২০১৩ সালের ১ জুলাই-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী মাত্র ২০.৯ শতাংশ জাতীয় সাংসদ ছিল নারী; গ্রামাঞ্চলের কাউন্সিলের সভাপতি বা প্রধান হিসেবে নারী পুরুষের তুলনায় কম। যেমনটি বাংলাদেশে দেখা যায় (০.২%)। (ইউএন উওমেন এন. ডি.)
- বিশ্বে মাত্র ২৪% নারী সিনিয়র ব্যবসায়ীর ভূমিকায় রয়েছে (মেডল্যান্ড ২০১৬)।

বাংলাদেশ

- মাত্র ৩৩% বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মেয়ে এবং চিকিৎসা ও আইনের মতো পেশাগত শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ মাত্র ৩৮%। সরকারি চাকরিতে ২৪% নারী (দৈনিক প্রথম আলো ২০১৫)
- শ্রমশক্তির ৩৩.৫% নারী ৮১.৭% পুরুষের বিপরীতে (বিবিএস ও মিনিস্ট্রি অফ প্ল্যানিং ২০১৫)
- নারীরা পুরুষের চাইতে কম বেতন পায়। পুরুষ মাসে গড়ে ১১,৭৩৩ টাকা পায় এবং নারীরা পায় ১০,৮১৭ টাকা (দৈনিক প্রথম আলো ২০১৬)

- তাদেরকে ব্যাখ্যা করতে থাকুন কর্মস্থলে নারীরা ব্যবস্থাপনার উচ্চপদে না থাকার কারণে তারা পরিকল্পনা, নকশা এবং সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দিতে পারে না। অনেক নারীই চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয় সন্তান বা পরিবারের সদস্যদের দেখাশোনা করার জন্য। এতে নারীর পেশাগত উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। নারী বৈষম্যের শিকার হয় যখন কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয় বা দায়িত্ববন্টন হয়। নারী হিসেবে মনে করা হয় যে, তারা বড় দায়িত্ব নিতে পারবে না। কর্মস্থলে যেহেতু পুরুষরা সিদ্ধান্ত নেয়, তারা নারীদের চাইতে পুরুষদেরই অগ্রাধিকার দেয় উচ্চপদে পদোন্নতি, প্রশিক্ষণে যাবার এবং দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য সক্ষমতা তৈরির সুযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে। আজও অনেক দপ্তর বা কারখানায় কর্মবিভাজন হয় জেন্ডারের ভিত্তিতে, ব্যক্তির যোগ্যতা ও দক্ষতাকে এড়িয়ে গিয়ে। একটি অফিসের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে, যেখানে অফিস সহকারীর দুটি খালি পদে যদি একজন নারী ও একজন পুরুষকে নির্বাচন করা হয় এটা খুবই সম্ভব যে, পুরুষটি অফিসের লজিস্টিকের কাজ করবে এবং নারীটিকে দেয়া হবে অভ্যর্থনায় সহায়ক- এরকম আরও উদাহরণ দিতে পারেন
- স্কুল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাসের শৃঙ্খলা বজায় রাখা, খেলা বা অনুষ্ঠান করার কাজ থাকে ছেলেদের জন্য, যেখানে মেয়েদের দায়িত্ব থাকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার। মেয়েরা অনেক সময় অঙ্ক বা বিজ্ঞান নিতে ভয় পায় কারণ তারা মনে করে প্রকৌশল, প্রত্নতত্ত্ব বা জ্যোতির্বিজ্ঞান তাদের জন্য উপযুক্ত নয়। বিষয় পছন্দ থেকে পেশাতেও এমন হয়। শিক্ষক, সরকার এবং ডাকঘরের কাজ অনেক বেশি পছন্দের, আইটি-কম্পিউটার বা বিজ্ঞানীর চাইতে
- আমাদের গভীরভাবে ভাবতে হবে সমাজ যে চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গি নারীর প্রতি রেখেছে, সে সম্পর্কে। এসব চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গি বৈষম্য এবং জেন্ডার অসমতা সৃষ্টি করে শিক্ষায়, কর্মক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে। আমাদের উচিত দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো এবং একজন মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখা, নারী বা পুরুষ হিসেবে নয়।

অধিবেশন ২.৪ অদৃশ্য দেয়াল ভেঙে ফেলা

উদ্দেশ্য

- আমাদের চারপাশে যে 'অদৃশ্য দেয়াল' আছে এবং আমরা তা কী করে ভাঙতে পারি সে ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করা
- জেন্ডার অসমতার বিরুদ্ধে আমরা কীভাবে দাঁড়াতে পারি তা শেখা।

পদ্ধতি

খেলা, গল্পের বিশ্লেষণ, আলোচনা, মুক্তচিন্তার ঝড়

উপকরণ

দাগ টানার জন্য চক

সময়

৪৫ মিনিট

প্রক্রিয়া

- সেশন শুরু করুন একটা উদ্দীপনামূলক খেলা দিয়ে। ঘরের এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত দাগ টানুন। অংশগ্রহণকারীদের বলুন অন্যের সাথে জুটি বাঁধতে। তাদের ৩ মিনিট দিন জোড়া বাঁধতে। তারপর জোড়ার একজন দাগের একদিকে দাঁড়াবে আর অন্যজন আরেক দিকে। তারা একজন আরেকজনের দিকে মুখ করে দাঁড়াবে, তাদের পায়ের আঙুলের মাথা দাগের কাছে থাকবে। তারা হাত উঁচু করবে এমনভাবে তাদের তালু তাদের জোড়ার আরেকজনেরটা ছুঁতে পারে। যখন আপনি বলবেন 'যাও', তারা ধাক্কা দেবে একে অপরকে আস্তে কিন্তু শক্তভাবে। প্রতিটি জোড়া একে-অপরকে সামনের দিকে যাওয়া থেকে প্রতিরোধ করবে। যে তা করতে সফল হবে সেই হবে বিজয়ী। সব জোড়াই এটা করবে। প্রতিটি জোড়াকে ১০ সেকেণ্ড দিন। প্রথম রাউন্ড বা দফা শেষ হয়ে গেলে, তারা জোড়া বদল করবে এবং আবার চেষ্টা করবে
- অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন ওপরের কাজটা করতে তাদের কেমন লেগেছে। তাদের অনুভূতি বলার পরে আলোচনা শুরু করুন নিচের প্রশ্নগুলো দিয়ে:
  - দেয়ালের কাজ কী?
  - তোমরা কি কোনো অদৃশ্য দেয়াল দেখেছ?
  - তোমাদের কি মনে হয় অদৃশ্য দেয়াল বলে কিছু আছে?

[এই প্রশ্ন করা হবে অংশগ্রহণকারীদের মনোযোগ পাবার জন্য। তারা এগুলো ঠিক জবাব না-ও দিতে পারে, বিশেষ করে শেষ দুটির, তবে আরও পরিষ্কার উত্তর পাওয়া যাবে যখন সেশনটা চলতে থাকবে]

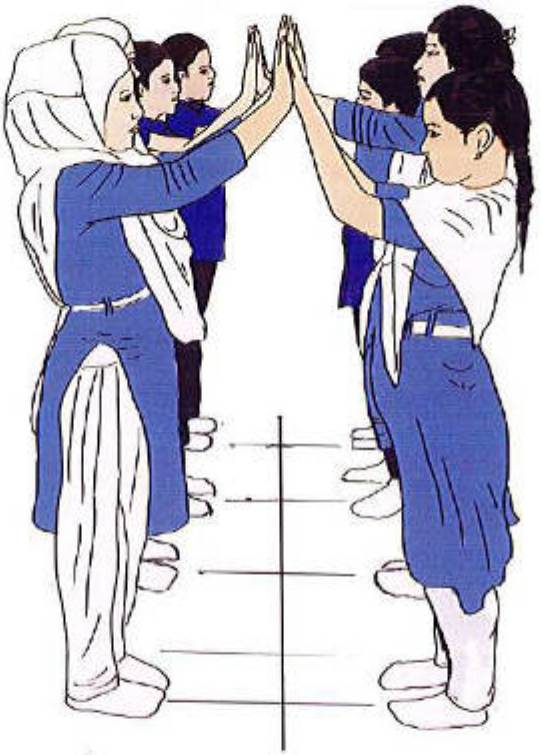

- তাদের বলুন আমরা অদৃশ্য দেয়াল দেখতে না পেলেও তা আছে এবং অনুভব করা যায়। ঠিক যেমনটি অনুভব করা গেছে একে অপরকে ধাক্কা দেবার সময়। 'অদৃশ্য দেয়াল' ব্যাপারটি ভালোভাবে বোঝা যাবে কিছু উদাহরণ দেখলে।

উদাহরণ ১

ইতি তার পড়া চালিয়ে যেতে চায় এবং সে স্বপ্ন দেখে সরকারি চাকরি করার। সে সত্যিই মনে করে যে সে তা অর্জন করতে পারবে। সে এমনও মনে করে তার ভাইয়া যার লেখাপড়ায় কোনো আগ্রহ নেই এবং তার কাজ হচ্ছে ভিডিও গেম খেলা আর অন্য ছেলেদের সাথে গল্পগুজব আর ঘোরাঘুরি করা, সে তার চাইতেও ভালো পারবে। অথচ তার মা-বাবা ভাবে তার ভাইয়ের লেখাপড়া আর ভবিষ্যতের পেছনে খরচ করবে। ইতি জানে যে সে যদি আরও পড়তে চায় তবে তাকে বাসা থেকে বের হয়ে অন্য শহরে চলে যেতে হবে। যেখানে আত্মীয়দের সাথে বা হোস্টেলে থাকতে পারবে। সে তার এলাকার কয়েকজন মেয়েকে চেনে যারা আরও লেখাপড়া করার জন্য অন্য শহরে গিয়েছে এবং অবশেষে ভালো চাকরি পেয়েছে। তাছাড়া সে জানে তার মা-বাবা তার এই লেখাপড়া করা আর স্বাধীন জীবনযাপন করার ইচ্ছাকে পছন্দ করে না। অনেক সময়ই সে ভেবেছে মা-বাবার সাথে তার স্বপ্ন নিয়ে আলাপ করবে আর যেসব মেয়েরা বাইরে গিয়ে লেখাপড়া করেছে তাদেরকে বলবে তার মা-বাবার সাথে কথা বলতে। কিন্তু যখনই সে তা করতে চেয়েছে মনে বাঁধা পেয়েছে। সে অনুভব করেছে একটা 'অদৃশ্য দেয়াল' তাকে তা করতে বাধা দেয়। আসলে সে মনে করে যে যদি তার মা-বাবা তার চিন্তাকে অগ্রাহ্য করে আর খুব রেগে গিয়ে তার লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে পারে। তার মতামতের তোয়াক্কা না করে বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারে। তাই সে তার স্বপ্নের কথা পরিবারের কোনো সদস্যকে বলে না।

প্রশ্ন :

- তোমাদের মধ্যে কেউ কি এমন বোধ করেছো?
- কেন এমন বোধ হয়?
- এই বোধটা বদলাতে আমরা কী করতে পারি?

উদাহরণ ২

ইমনের বন্ধু সুমন খুব হাসিখুশি একটি ছেলে; সে কখনো কারো সাথে তর্ক করে না। সেসব সময় বলে তার মা ও বোনকে গৃহকর্মে সাহায্য করে। ইমন দেখেছে যে অন্য বন্ধুরা সুমনকে নিয়ে মজা করে আর সুমনের সামনে ও পেছনে তাকে নিয়ে হাসে। তারা সুমনকে ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করে সে কীভাবে মেয়েদের কাজ করে বা তার হরমোনের সমস্যা আছে কিনা। তার সুমনের জন্য খারাপ লাগে এবং অন্য বন্ধুদের আচরণে বিরক্ত লাগে। তারপরও সে প্রতিবাদ করে বলতে পারে না যে গৃহকর্ম শুধু মেয়েদের নয়। ইমন অনুভব করে যে তার কথা বলা উচিত কিন্তু বলতে পারে না; সে অনুভব করে একটা 'অদৃশ্য দেয়াল'- কারণ সে ভয় পায় এই ভেবে যে, যদি সে সুমনকে রক্ষা করতে চায় অন্যরা তাকে নিয়েও হাসবে।

প্রশ্ন :

- তোমাদের মধ্যে কেউ কি এমন বোধ করেছো?
- কেন এমন বোধ হয়?
- এই বোধটা বদলাতে আমরা কী করতে পারি?

উদাহরণ ৩

লিপিরা ২ বোন ও ১ ভাই। তার বোনেরা মেধাবী কিন্তু বাবা বড় বোনকে খুব কমবয়সে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। তার বড় বোন লেখাপড়া চালিয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি। তার দ্বিতীয় বোন এইচএসসি পর্যায়ে পড়ে, সে প্রকৌশলী হতে চায়, তার বাবার এ নিয়ে আপত্তি আছে। কারণ তিনি মনে করেন যে প্রকৌশলী ছেলেদের কাজ একজন মেয়ে বাইরে যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করবে তার ভালো লাগে না। তার ইচ্ছা সে যেন শিক্ষকতা করে। তাছাড়া সে একজন সুপাত্রের সন্ধান করছে তার বিয়ের জন্য। তার বোন সবসময় কাঁদে নিজের ইচ্ছাপূরণ করতে না পারার জন্য। লিপি চায় যে তার বোন যেন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে আর নিজের মতো জীবনযাপন করতে পারে। কিন্তু সে সবসময় অনুভব করে একটা 'অদৃশ্য দেয়াল', যা তাকে বাবার সাথে তার মেয়েদের ইচ্ছাকে সম্মান জানাবার অনুরোধ করা থেকে বিরত রাখে। সে তার সাথে কথা বলতে পারে না কারণ সে মনে করে করে বাবা এটি ইতিবাচকভাবে নেবেন না এবং রেগে যাবেন তার ওপর।

প্রশ্ন :

- তোমাদের মধ্যে কেউ কি এমন বোধ করেছো?
- কেন এমন বোধ হয়?
- এই বোধটা বদলাতে আমরা কী করতে পারি?

উদাহরণ ৪

সুমিতের ভাই অমিতের সম্পর্ক আছে শিখার সাথে। তারা দু'জনেই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে এখন চাকরি করে। তারা বিয়ে করতে চায় কিন্তু সুমিতের পরিবারের এ বিয়েতে মত নেই কারণ তারা চায় না যে, অমিত চাকরিজীবী মেয়ে বিয়ে করুক। তাদের যুক্তি হচ্ছে- মা-বাবা ছেলেকে বিয়ে করায় যেন তার স্ত্রী গৃহকর্ম সামলাতে পারে শ্বশুরবাড়িতে, শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করতে পারে। বউ যদি বাইরে কাজ করে, তাহলে এগুলো করবে কখন? অমিত কয়েকবার মা-বাবাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে আজকাল মেয়েরা চাকরির পাশাপাশি পরিবার সামলাচ্ছে, কিন্তু তারা অমিতের কথায় কান দেন না। তার মা-বাবা বলে যে শিখা যদি চাকরি ছাড়ে এবং ঘর সামলায় তবেই তারা মত দেবে। সুমিত অনুভব করে একটি 'অদৃশ্য দেয়াল', যা তাকে ঠেকিয়ে রাখে ভাইকে সাহায্য করতে এবং মা-বাবার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কথা বলতে যেন তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টায়। তার ভয় হয় যদি মা-বাবা তাকে ভুল বোঝে এর জন্য।

প্রশ্ন :

- তোমাদের মধ্যে কেউ কি এমন বোধ করেছো?
- কেন এমন বোধ হয়?
- এই বোধটা বদলাতে আমরা কী করতে পারি?

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন আমাদের কমিউনিটিতে আরও যেসব 'অদৃশ্য দেয়াল' আছে সেগুলোর কথা বলতে। তারপর তাদের ব্যাখ্যা করে বলুন যে যদিও আমরা এটাকে দেখতে পাই না, আমরা অনুভব করতে পারি এবং এটা আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে প্রভাব বিস্তার করে আছে। অদৃশ্য দেয়াল আমাদের বিশ্বাসের পক্ষে দাঁড়াতে এবং যা কিছু ঘটে সেগুলোকে প্রশ্ন করতে বাধা দেয়। অদৃশ্য দেয়াল মেয়ে/নারী এবং ছেলে/পুরুষকে অন্যায্য ভূমিকায় রাখে আর সমাজে জেন্ডার অসমতাকে জিইয়ে রাখে। অদৃশ্য দেয়াল এমন বাধার সৃষ্টি করে যে তা সরানো অসম্ভব বলে মনে হয়। যদিও অদৃশ্য দেয়ালকে শক্ত আর অবিনশ্বর (যা ধ্বংস করা যায় না) বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে তা কৃত্রিম। এগুলোকে সাহস, শক্তি, দৃঢ় সঙ্কল্প এবং ধৈর্য দিয়ে সরানো যায়। দিনের পর দিন আলোচনা ও গঠনমূলক কাজ অদৃশ্য দেয়াল ভেঙে দিতে পারে। কাজগুলো হয়ত খুব ছোট, যেমন তোমার বোনের আশা ও স্বপ্নের কথা শোনা, ছেলেদের মা ও বোনের গৃহকর্মের ভার নেয়া, কিন্তু এর প্রভাব অনেক বড় যা 'অদৃশ্য দেয়াল' ভাঙার দিকে নিয়ে যেতে পারে। মেয়ে ও নারীদের উচিত নিজেদের মনের কথা শোনা, নিজের ইচ্ছেকে সম্মান করা এবং তাদের বিরুদ্ধে যে দেয়াল যা শক্ত এবং অদৃশ্য, সেটিকে ভেঙে ফেলার যোগ্যতা বাড়ানো। এখন এটা তোমার ওপর নির্ভর করছে- হয় এটিকে সরিয়ে দাও বা ভয় নিয়ে অদৃশ্য দেয়ালের পেছনে বাস কর।

[এই সেশনটি সেভ দ্য চিলড্রেন কারিকুলাম ২০১৩ থেকে কিছুটা অনুপ্রাণিত]

মডিউল ৩

আমার শরীর আমার অধিকার
যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার

অধিবেশন ৩.১ নিজেকে জানো : তোমার শরীর ও মন

উদ্দেশ্য

- বয়ঃসন্ধিকালে বা কৈশোরে শরীর ও মনের পরিবর্তন নিয়ে জানা

পদ্ধতি

আলোচনা, দলীয় কাজ (এই সেশনটি মেয়ে ও ছেলেদের আলাদা হবে এবং সহায়কও একই সেক্স-এর হবেন)

উপকরণ

ফ্লিপ কাগজ, ভিপ কার্ড, মার্কার/আর্ট লাইনার

সময়

৪৫ মিনিট

প্রক্রিয়া

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন আলোচনা করব কীভাবে আমরা বড় হলাম যা আসলে একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। আমরা আস্তে আস্তে বড় হই, একবারে নয়। আমাদের শরীরে সময়ে সময়ে শিশুকাল থেকে প্রাপ্তবয়স্ককাল পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সে পরিবর্তন ঘটে। কিছু মানসিক পরিবর্তনও হয়।

- আলোচনাটি চালিয়ে যান এই বলে যে ১০ থেকে ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত সময়টা হলো বয়ঃসন্ধিকাল। এই সময়টা শৈশব থেকে প্রাপ্তবয়স্কে রূপান্তরিত হবার সময়, যে সময়টায় বড় ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে। যে মেয়ে বা ছেলে এই সময় বা বয়সটা পার করে, তাকে বলে কিশোরী-কিশোর। শিক্ষার্থীরা এই সময়টা পার করছে। তাই তারা কিশোরী-কিশোর। পরিপূর্ণ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করতে গেলে সবারই উচিত নিজের শরীর ও মন সম্পর্কে জানা। যা রোগ-প্রতিরোধ করতে এবং সমস্যা হলে সাহায্য করবে। অনেক সময়ই, যেহেতু এসব পরিবর্তনের ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান সীমিত বা ত্রুটিপূর্ণ থাকে, আমরা অস্থির বোধ করি যখন দেখি আমাদের শরীর পরিবর্তিত হচ্ছে এবং তখন অন্যরকম বোধ করছি। তাই আমাদের এসব পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে হবে কারণ এগুলো আমাদের বেড়ে ওঠার অবিচ্ছেদ্য অংশ। আরও জানতে হলে এসব পরিবর্তন নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করতে হবে। তবে কেউ যদি খোলামেলা আলোচনা করতে সহজ বোধ না করে, তাহলে সে আলোচনায় অংশ না-ও নিতে পারে। তারপরও জেনে রাখা ভালো যে তোমরা যত বেশি জানবে তত বেশি নিরাপদ থাকবে।

- বেশিরভাগ সময়ে মা-বাবা, বোন বা পরিবারের বড়রা এসব ইস্যু নিয়ে আমাদের সাথে আলাপ করে না। তাই এই শ্রেণিকক্ষটির পরিবেশ কোনোরকম অস্বস্তি ছাড়া একটি মুক্তস্থান হিসেবে বিবেচিত হবে, যেখানে শিক্ষার্থীরা সহায়কের সাথে এসব বিষয় নিয়ে আলাপ করতে পারবে।

- অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন :
  - তোমরা কি জানো, বয়ঃসন্ধিকালে কী কী শারীরিক পরিবর্তন (মেয়ে-ছেলে উভয়ের) হয়?
  - তোমরা কি জানো, বয়ঃসন্ধিকালে কী কী মানসিক পরিবর্তন (মেয়ে-ছেলে উভয়ের) হয়?

- তাদের বলুন ওপরের প্রশ্ন দু'টির উত্তর দিতে ২টি দলে ভাগ হয়ে যেতে। দল-১ আলোচনা করবে বয়ঃসন্ধিকালীন মেয়ে-ছেলে উভয়ের শারীরিক পরিবর্তন নিয়ে এবং দল-২ মানসিক পরিবর্তন নিয়ে। আলোচনার বিষয়বস্তু একটি ফ্লিপ কাগজে লিখতে হবে। প্রতিটি দল থেকে দু'জন করে তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করবে এবং একজন আরেকজনকে উপস্থাপনা করতে সাহায্য করবে (যেহেতু আলোচনাটি সংবেদনশীল তাই অন্যজন উপস্থাপককে সহজ হতে সাহায্য করবে যেন সে খোলামেলাভাবে আলোচনা করতে পারে)

- অংশগ্রহণকারীদের উপস্থাপনায় কোনো বিষয় সংযোজন বা বিয়োজন করতে হলে তা করুন

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন প্রত্যেকেরই সব ধরনের মানসিক বা শরীরিক পরিবর্তন একই বয়সে না-ও হতে পারে। যেমন, কোনো কোনো মেয়ের মাসিক হয় যৌবনে পৌছানোর সাথে সাথেই, অর্থাৎ ১১ বছর বয়সে। আবার কোনো কোনো মেয়ের হয় ১৩ বছর বয়সে। যৌবন হলো এমন সময় যখন কিশোরী-কিশোররা যৌন পরিপক্কতা লাভ করে এবং তাদের শরীর সন্তানধারণ করার জন্য তৈরি হয়ে যায়। বয়ঃসন্ধিকালে এসব পরিবর্তন ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া এবং পুষ্টির অভ্যাসভেদে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে আলাদা হয়। এসব পরিবর্তন খুবই স্বাভাবিক

- আলোচনার পরে অংশগ্রহণকারীদের দু'টি ভিন্ন রঙের ভিপ কার্ড দিন, মেয়েদের সম্পর্কে লেখার জন্য এক ধরনের রং ও ছেলেদের জন্য অন্য ধরনের রং। তাদের বলুন যে, এসব শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের শুরুতে আমরা সবাই আমাদের মা-বাবা বা অন্য কারুর (এটি অভিভাবক/পরিবারের সদস্য/আত্মীয়/শিক্ষক/প্রতিবেশী হতে পারে) কাছ থেকে বিভিন্ন বিধিনিষেধের ক্ষেত্রে বার্তা/নির্দেশ পাই। তাদের বলুন ভিপ কার্ডে তাদের অন্তত একটি অভিজ্ঞতার কথা লিখতে। বক্তব্যের শেষে অংশগ্রহণকারীদের নাম লেখার দরকার নেই

[খুবই সম্ভব যে ছেলেদের চাইতে মেয়েরা বক্তব্য দেবে যেমন- চলাচলে বিধিনিষেধ, একা একা বাইরে যাবার সুযোগ কম, ছেলেদের সাথে বাইরে খেলা, জোরে না দৌড়াতে, লাফাতে বা গাছে চড়তে নিষেধ করা, মাসিক চলাকালীন ঘরে থাকতে বলা, শরীর ঢাকতে, এমনকি ছেলেদের সাথে কথা না বলা বা দেখা করা। ছেলেরা হয়তো বলবে তাদের জন্য স্বপ্নদোষ একটি পাপ। এটি যেহেতু আলাদা সেশন হবে, অংশগ্রহণকারীদের বলুন বিপরীত সেক্সের সম্পর্কে যা জানে তা লিখতে।]

- এরইমধ্যে একটি রঙিন ভিপ কার্ডে 'মেয়ে' এবং আরেক রঙা ভিপ কার্ডে 'ছেলে' লিখুন। তারপর তা বোর্ডে লাগান। কিছুক্ষণ পরে, তাদের কাছ থেকে ভিপ কার্ডগুলো নিয়ে কার্ডের রং অনুযায়ী 'মেয়ে' ও 'ছেলে' শিরোনামের নিচে লাগান

- আলোচনা করুন যে মেয়েদের ক্ষেত্রে বক্তব্য এসেছে ছেলেদের তুলনায় বেশি, যদিও পরিবর্তন মেয়ে ও ছেলে, উভয়েরই হয়। সব বক্তব্যই কোনো না কোনো নিষেধ, সীমাবদ্ধতা এবং যা বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের ওপর চাপিয়ে দেয়া, যেগুলো আমরা আগের সামাজিকীকরণের সেশনে শিখেছি। সমাজের এই চাপিয়ে দেয়া অনেক কিছুই কুসংস্কার ও সমাজ ব্যবস্থার মূলে থাকা প্রাচীনকাল ধরে চলে আসা রীতি যা সবসময় নারী ও তার অধিকারকে ছোট করে দেখে এবং যা মূলত এসেছে বয়ঃসন্ধিকালে মেয়ে ও ছেলেদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কে সীমিত জ্ঞান বা অজ্ঞানতা থেকে। মানুষ হিসেবে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়ার একটি অংশ হিসেবে যদিও এসব পরিবর্তন প্রতিটি মানুষেরই হয়, এসব পরিবর্তনের ওপর ভিত্তি করে সমাজ ছেলে ও মেয়েদের মাঝখানে পার্থক্যের দাগ টেনে দিয়েছে এবং বৈষম্যের শুরু হয়েছে সেখান থেকেই

- আলোচনা চালিয়ে যান যে শরীর ও মনের পরিবর্তন সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান সবারই দরকার। মেয়ে ও নারীদের অনেক বেশি তাদের শরীর ও মনের পাশাপাশি এসব পরিবর্তন সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হবে। শরীর ও মনের 'বৈধ মালিক' হিসেবে স্বাভাবিকভাবে তাদের অধিকার হলো এগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা এবং সেই সাথে অন্য কারো দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে না দেয়া। ছেলে ও পুরুষদেরও এই ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। তাছাড়া, তাদের (ছেলেদের) যেমন অধিকার আছে নিজের শরীর ও মনকে নিয়ন্ত্রণের, তেমনি তাদেরও অন্যের এই অধিকারকে অগ্রাহ্য করা উচিত নয়

- তাদের বলুন যে আমাদের শরীর ও মনকে জানতে এবং আবেগকে বুঝতে আমাদের দরকার প্রজনন অঙ্গ এবং প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্যের অধিকার সম্পর্কে জানা। সামনের সেশনগুলোতে আমরা তা জানব।

সহায়কের জন্য তথ্য

বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তন

মেয়ে	ছেলে
• দেহের আকার ও উচ্চতা বাড়ে • পশ্চাৎদেশ চওড়া হয় (উরু ও নিতম্ব ভারী হয়) • স্তন বৃদ্ধি পায় এবং (অনেক সময়) ব্যথা হয় • বগল, যোনির স্থানে ও শরীরে পশম গজায় • ঋতুস্রাব বা মাসিক ও নিঃসরণ শুরু হয় • জরায়ু ও ডিম্বাশয় বড় হয় • কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন • ত্বকে ব্রণ হতে পারে।	• দেহের উচ্চতা ও আকার পরিবর্তিত হয় • কাঁধ চওড়া হয় • পুরুষাঙ্গ এবং অণ্ডকোষের আকার বড় হয় • শরীরে (বগলের নিচে এবং প্রজনন অঙ্গের আশেপাশের স্থানসহ) এবং মুখে পশম (দাড়ি-গোঁফ) গজায় • বীর্য উৎপাদন ও স্বপ্নদোষ হয় • কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন হয় • ত্বকে ব্রণ হতে পারে।

মেয়ে ও ছেলেদের বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক ও আবেগীয় পরিবর্তন :

- বিপরীত সেক্সের প্রতি আকর্ষণ
- মেজাজের ঘন ঘন পরিবর্তন
- লাজুকতা ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পায়
- কৌতূহল বৃদ্ধি পায়
- আয়নায় নিজেকে দেখতে পছন্দ করে
- একা ঘোরা ও স্বাধীনভাবে চলতে চায়
- নিয়মভঙ্গ বা বিদ্রোহের ইচ্ছে জাগে।

অধিবেশন ৩.২.১ নিজের শরীরকে জানো : সন্তান জন্মদান

উদ্দেশ্য

- প্রজননতন্ত্র ও সন্তান জন্মদানে নারী ও পুরুষের অবদান সম্পর্কে জানা

পদ্ধতি

আলোচনা, কুইজ পরীক্ষা (এই সেশনটি মেয়ে ও ছেলেদের আলাদা হবে এবং সহায়কও একই সেক্স-এর হবেন)

উপকরণ

নারী ও পুরুষের প্রজননতন্ত্রের ওপরে ফ্লিপ শিট, কুইজ প্রতিযোগিতার জন্য প্রশ্ন প্রতিজনের জন্য দু'টি করে (প্রাক ও পরবর্তী)

সময়

৪৫ মিনিট

প্রক্রিয়া

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন যে আগের সেশনে আমরা জেনেছি বয়ঃসন্ধিকালে শরীর ও মনের পরিবর্তন সম্পর্কে। আমাদের উচিত আরও বেশি জানা ও পরিষ্কার হবার জন্য আরও বেশি খোলামেলা আলোচনায় অংশ নেওয়া। অংশগ্রহণকারীরা আলোচনাকালে অনেক শব্দ পাবে যা তারা হয়তো আগে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করেনি। এছাড়া, তাদের হয়তো আলোচ্য বিষয়ে অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে যা নিয়ে আগে কখনো প্রশ্ন করা হয়নি সামাজিক বিধিনিষেধের কারণে (যৌনাঙ্গকে আমাদের শরীরের একটি নিষিদ্ধ অংশ বলে মনে করা হয়, তাই এটি নিয়ে খোলামেলাভাবে কথা বলা উচিত নয়)। কিন্তু তাদের উৎসাহ দিন চিন্তা করতে যে যখন আমাদের শরীরের ব্যাপার আসে, আমরা যদি লজ্জাবোধ করি তাহলে আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে আর পরিশেষে তা ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়াবে

- ব্যাখ্যা করে বলুন যে, শরীর হচ্ছে অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের অঙ্গের সমষ্টি। জিজ্ঞেস করুন- তোমরা জানো প্রজনন অঙ্গ বা প্রজননতন্ত্র কি? এসো একটা কুইজ প্রতিযোগিতা হয়ে যাক। অংশগ্রহণকারীদের প্রাক পরীক্ষার কাগজ দিন এবং বলুন যে তাদের নিজেদের নাম লেখার দরকার নেই

- কুইজের পরে, আলোচনায় বলুন সব প্রাণীই তাদের পরের প্রজন্ম তৈরি করে সন্তান জন্মদানের মধ্য দিয়ে। আমরা মানবশিশুর জন্ম দেই। প্রজনন অঙ্গগুলো সন্তান জন্মদান বা প্রজন্ম তৈরির সাথে জড়িত এবং এসব অঙ্গকে একত্রে প্রজননতন্ত্র বলে। নারীর আছে স্ত্রী প্রজননতন্ত্র এবং পুরুষের আছে পুরুষ প্রজননতন্ত্র। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের প্রজননতন্ত্র শিশু জন্মে অবদান রাখে, শুধু মানুষের ক্ষেত্রে নয়, অন্য প্রজাতিতেও। ছবিসম্বলিত ফ্লিপ শিট ব্যবহার করুন যখন নারী ও পুরুষের প্রজননতন্ত্র সম্পর্কে ব্যাখ্যা করবেন

- তাদের জিজ্ঞেস করুন শিশুর জন্ম কী করে হয় তা তারা জানতে চায় কিনা। সহায়ক আবারও ছবি ব্যবহার করে বুঝিয়ে দেবেন এবং যৌনমিলন সম্পর্কে সহজ, পরিষ্কার এবং শিশুবান্ধব ভাষায় বলবেন। আলোচনা শেষ করুন ঋতুচক্র ও স্বপ্নদোষ ব্যাখ্যা করার মধ্য দিয়ে

- আরও বলুন প্রতিটি ক্ষেত্রে এসব খুবই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া তাই তাদের লজ্জা পাবার কোনো কারণ নেই

- সেশনের শেষে, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন- সেশন কেমন ছিল? তাদের কী শিখতে ভালো লেগেছে? তাদেরকে বলুন যদি আজকের সেশন নিয়ে প্রশ্ন থাকে, তবে তা নামহীন বাক্সে ফেলতে। তাদের ধন্যবাদ দিন একটি শিক্ষা উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করবার জন্য। পরের সেশনে এই আলোচনা চলবে। পরবর্তী পরীক্ষার জন্য কুইজের প্রশ্নটি দিন [কুইজ যেন পরীক্ষার মতো না হয়, এগুলো শুধুই অংশগ্রহণকারীরা সেশন থেকে কী শিখল তা বের করে আনার জন্য সহায়ক টুল হিসেবে ব্যবহৃত হবে]।

অধিবেশন ৩.২.২ নিজের শরীরকে জানো : প্রজননের ক্ষমতা

উদ্দেশ্য

- শিশুর সেক্স নির্ধারণের জন্য নারীর ক্রোমোজামকে দায়ী করা চিরাচরিত এই ধারণাকে চিহ্নিত করে তাকে চ্যালেঞ্জ করা।

পদ্ধতি

গল্প বিশ্লেষণ, আলোচনা (এই সেশনটি মেয়ে ও ছেলেদের আলাদা হবে এবং সহায়কও একই সেক্স-এর হবেন)

উপকরণ

প্রজননতন্ত্রের ওপরে ফ্লিপ শিট, দুটি গল্পের অনুলিপি

সময়

৪৫ মিনিট

প্রক্রিয়া

- নামহীন বাক্সে কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটির উত্তর দিয়ে সেশন শুরু করুন
- অংশগ্রহণকারীদের বলুন তারা জেনেছে একটি শিশু কীভাবে নারীর শরীরের ভেতরে সৃষ্টি হয়। তাদের জিজ্ঞেস করুন তারা কি জানে, শিশুটি মেয়ে না ছেলে হবে সেটি কীভাবে ঠিক হয়। তাদের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন এবং এরপর প্রক্রিয়াটিকে ব্যাখ্যা করুন। তাদের বলুন, যদিও তাদের কেউ কেউ এটি সম্পর্কে জেনে থাকতে পারে, তবে সব অংশগ্রহণকারীর বুঝবার জন্য এই বিষয়ে আলোচনা করা হবে
- বিস্তারিত আলোচনার পরে তাদের বলুন দু'টি গল্প বিশ্লেষণ এবং গল্প দু'টির ভিত্তিতে নিচের প্রশ্নগুলো করুন-

গল্প ১

৫ বছর আগে ময়নার যখন বিয়ে হয়েছিল, তখন তার বয়স ছিল ১৪। এখন সে ৩টি মেয়ের মা। যখন তার প্রথম মেয়েটি হয়েছিল, তার স্বামী হাসান সন্তানটি হওয়ায় খুশি হয়েছিল, কিন্তু তার শ্বশুর-শাশুড়ি খুশি হয়নি কেননা তারা চেয়েছিল প্রথম সন্তান নাতি হবে। তার শাশুড়ির মতে, প্রথম সন্তান ছেলে হলে পরের সন্তান ছেলে হোক বা আর কোনো সন্তান না হোক সেটি নিয়ে কোনো চিন্তা থাকে না। ময়না ও হাসানের পরের সন্তানটি ছেলে হবে বলে আশা করা হয়েছিল, তারপর দ্বিতীয়টিও যখন মেয়ে হলো হাসান খুশি হয়নি। তৃতীয় সন্তানটি নেওয়া হয়েছে খুব তাড়াতাড়ি কারণ শ্বশুর-শাশুড়ি একটা নাতির জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিল। তৃতীয়বার গর্ভধারণের সময় ময়নাকে একজন পীরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় ছেলে হবার জন্য দোয়া চাইতে বা ঝাড়-ফুঁক করতে। তাকে চলাফেরা, খাওয়া দাওয়ায় অনেক বিধিনিষেধ মানতে হয়েছিল। এতোকিছুর পরও একটি মেয়ে হয়েছে। তার জন্মের পরে ময়নার স্বামী বা শ্বশুর-শাশুড়ি তাকে কোলে নেয়নি। ময়না খুব ভীত আর উদ্বিগ্ন ছিল যদি ছেলে না হয় তাহলে তার কী হবে ভেবে। যেহেতু তার খাওয়া দাওয়ায় অনেক নিষেধ ছিল, তাই তৃতীয় মেয়েটি অপুষ্টি নিয়ে জন্মেছে এবং অনেক সমস্যা রয়েছে। কয়েকদিন আগে মেয়েটি খুব অসুস্থ ছিল, কিন্তু ময়নাকে বাচ্চাটি নিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে দেয়া হয়নি। বাচ্চাটা হবার পর থেকে হাসান তার সাথে ভালোভাবে কথা বলে না। তার স্বামী এবং শ্বশুর-শাশুড়ি সবসময় গালামন্দ করে। কোনো কারণ ছাড়াই তার সাথে ঝগড়া করে। এখন তার শাশুড়ি এ কথাও বলছে- যেহেতু ময়নার ছেলে জন্ম দেবার ক্ষমতা নেই তাই তারা হাসানকে আবার বিয়ে দেবে। আর পরিবারের উত্তরাধিকার পাবার জন্য তাদের একটি ছেলে দরকার। ময়নাও অপরাধী আর লজ্জাবোধ করে একটা ছেলের জন্ম না দিতে পেরে। তাই অনেক সময় নতুন বাচ্চাটার যত্নও করে না ঠিকমতো। ময়না খুব ভয়ে থাকে যে কোনো সময় হাসান দ্বিতীয় বিয়ে করে ফেলবে, তার আর তিনটি ছোট মেয়ের কী হবে সেটি ভেবে।

গল্প ১-এর জন্য প্রশ্ন :

- শুধু কি ময়না একাই কন্যা সন্তান হবার জন্য দায়ী?
- কেন তার স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ি ছেলে সন্তান না হবার জন্য সবসময় তাকে দোষ দেয়?
- ময়না কেন অপরাধবোধে ভোগে? এমতাবস্থায় অপরাধবোধে ভোগা কি ঠিক?
- যথাযথ জ্ঞান না থাকার নেতিবাচক ফল কী হয়?
- এই পরিস্থিতির উন্নতি কীভাবে করা সম্ভব?

গল্প ২

শিরি ও ফরহাদের ৫ বছর হলো বিয়ে হয়েছে। প্রথম ২ বছর খুব ভালো ছিল। কিন্তু গত ৩ বছর ধরে শিরি তার প্রতি ফরহাদের আচরণের পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছে। এখন সে তার প্রতি খুব রূঢ়। শিরি বুঝতে পেরেছে যে তার সুখের বিবাহিত জীবন উবে গেছে। কারণটা বোঝাই যায়। তাদের কোনো সন্তান হয়নি এখনও। তারা দু'জনেই শিক্ষিত এবং চাকরি করে। প্রথম থেকেই তারা ঠিক করেছিল যে দেরি না করে সন্তান নেবে। বিয়ের ৩ বছর পরে তারা খুব আন্তরিকভাবে চিন্তা করতে থাকে এ ব্যাপারে। ফরহাদ শিরিকে অনেক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেছে। শিরি অনেক জায়গায় গেছে, কিন্তু কোনো সমাধান পাওয়া যায়নি। শিরি ও ফরহাদ এখন অনেক সামাজিক অনুষ্ঠান এড়িয়ে চলে, এমনকি আত্মীয়দের বাসাও। কারণ তারা প্রশ্নের মুখোমুখি হয় কেন সন্তান নিচ্ছে না বা তাদের এখনও কোনো সন্তান নেই কেন? শিরি লক্ষ্য করেছে যে, যদিও প্রশ্নটা দু'জনকেই করা হয়, এরপরও বেশিরভাগ সময় তার দিকেই তীরটা ছোড়া হয়। এতে সে দুঃখ পায়। শিরি শুনেছে শ্বশুর-শাশুড়ি ওর দিকে আঙুল তুলে বলেছে যে তারই প্রজনন ক্ষমতা নেই। গত মাস দু'য়েক ধরে সে ফরহাদকে ডাক্তারের কাছে যাবার জন্য বলছে, কিন্তু সে প্রতিবারই না করে। বললেই চিৎকার করে এবং বলে যে শিরিরই সন্তান দেবার ক্ষমতা নেই। তাছাড়া, তারও মনে হয় তারই প্রজনন সমস্যা আছে যা ঠিকভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। সে সবসময় ভাবে তাদের সন্তান না হলে বিবাহিত জীবন ভেঙে যাবে। শিরি খুব দুশ্চিন্তায় জীবন কাটাচ্ছে।

গল্প ২-এর জন্য প্রশ্ন :

- যদিও সন্তান হবার জন্য নারী ও পুরুষ উভয়রই অবদান রয়েছে তাহলে সন্তান না হবার জন্য কে দায়ী?
- কেন স্বামী তার স্ত্রীকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায়? কেন সে তার নিজের পরীক্ষা করাতে যায় না?
- কেন স্ত্রী অপরাধবোধে ভোগে?
- এ পরিস্থিতিতে স্বামী, স্ত্রী এবং আত্মীয়দের ভূমিকা কী হতে পারে?

- আলোচনা করুন অনেক পরিবার শিক্ষিত হোক বা না হোক, ছেলেসন্তান না হবার জন্য স্ত্রীকে দায়ী করে। এমনকি নারীরাও নিজেদের দায়ী করে স্বামী বা পরিবারের অন্য সদস্যদের ইচ্ছেপূরণ করতে না পারার জন্য, কারণ তাদেরকে শেখানো হয়েছে তাদের ইচ্ছের চেয়েও স্বামী বা অন্যদের ইচ্ছে অনেক জরুরি। সন্তান হওয়াটা একটি সর্বজনীন প্রকৃতিপ্রদত্ত প্রক্রিয়া জানার পরও নারীরা সমাজের রীতি ও প্রত্যাশা, যা সামাজিকভাবে তৈরি করা আর পরিবর্তনশীল, তা মেনে নেয়। সমাজের সাথে সাথে নারীরাও নিজেদেরকে দোষী করে সমাজকে তার প্রজনন প্রক্রিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ করতে দেয় এবং তাদের অবস্থানকে অবদমন করার জন্য এমন সব প্রচলিত নীতিকে সুদৃঢ় করে যে পরিস্থিতির জন্য তারা কোনোভাবেই দায়ী নয়
- যদিও সন্তান হবার জন্য নারী ও পুরুষ উভয়েরই অবদান রয়েছে, শুধু নারীদেরই ক্ষমতা আছে গর্ভধারণ করার। তাই সমাজ এই ক্ষমতাকে সন্তান হবার পুরো প্রক্রিয়াটির সাথে যুক্ত করে এবং যদি কোনো সন্তান বা ছেলেসন্তান না হয়, সেজন্য নারীকে অপরাধী করে তোলে। মেয়ে ও নারীদেরকে অবশ্যই প্রজননতন্ত্র ও প্রক্রিয়াকে জানতে এবং নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। ছেলে ও পুরুষের দায়িত্ব হচ্ছে প্রজননের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকে জানা এবং সে জ্ঞানকে ব্যবহার করে নারীদের দোষারোপ এবং অবদমন করা থেকে বিরত থাকা। তাছাড়া, মেয়ে ও নারীর নিজেদের শরীর এবং প্রজননতন্ত্রের ওপরে যে নিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে সে ব্যাপারটিকে ছেলে ও পুরুষদের সম্মানজনক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে।

সহায়কের জন্য তথ্য

মানব প্রজনন প্রক্রিয়ায় ২ ধরনের সেক্সকোষ বা জননকোষ জড়িত থাকে। পুরুষ জননকোষ বা শুক্রাণু এবং স্ত্রী জননকোষ বা ডিম্ব বা ডিম্বাণু নারীর প্রজননতন্ত্রে একটি নতুন প্রাণের জন্য মিলিত হয়। নারী ও পুরুষ উভয় প্রজনন কোষই উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয়।

নারী প্রজননতন্ত্র

নারীর প্রজননতন্ত্রে ভিতরে ও বাইরের অঙ্গ আছে। এটি নারীকে ডিম্বাণু (ডিম) উৎপাদন করতে, যৌনমিলন করতে, ডিমের উর্বরতা, রক্ষা এবং উর্বর ডিমকে পুষ্টি দিতে সক্ষম করে তোলে, যতক্ষণ না এটি পুরো তৈরি হচ্ছে এবং জন্ম দিচ্ছে।

যোনি : মুখের ভেতরের মতো টিস্যু দিয়ে এটি তৈরি, যাতে অনেক ভাঁজ আছে এবং যা যৌনমিলনের সময় বা সন্তান জন্মদানের সময় পথ তৈরি করার জন্য প্রসারিত হয়। যোনি ৩ ধরনের কাজ করে- (১) যৌনমিলনের সময় পুরুষাঙ্গ এটির মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে (২) জন্মের সময় শিশু এই পথ দিয়ে বের হয় এবং (৩) জরায়ু থেকে মাসিকের রক্ত এই পথ দিয়ে বের হয়।

সতীচ্ছদ : সতীচ্ছদ একটি পাতলা আবরণ যেটিতে এক বা একাধিক ছিদ্র আছে এবং যার দ্বারা যোনিমুখ আংশিকভাবে ঢাকা থাকে। ব্যক্তি নির্বিশেষে সতীচ্ছদ আলাদা হয়ে থাকে।

সারভিক্স/গর্ভাশয়ের সংকীর্ণ অংশ (গলা) : জরায়ুর নিচের অংশ - যা যোনি পর্যন্ত বিস্তৃত। সারভিক্স/গর্ভাশয়ের সংকীর্ণ অংশের শক্ত মোটা দেয়াল আছে। এর মুখটি খুবই চিকন (এটি একটি স্ট্র-র চেয়ে বড় না), যেখান দিয়ে মাসিকের রক্ত যায় এবং শুক্রাণু প্রবেশ করে। স্বাভাবিক প্রসবের ক্ষেত্রে এই মুখটি প্রসারিত হয়ে শিশু বের হবার পথ করে দেয়।

জরায়ু/গর্ভাশয় : এটি উল্টো নাশপাতির মতো ছোট একটি অঙ্গ যেখানে গর্ভাবস্থায় ভ্রূণ বড় হয়। যখন কোনো নারী গর্ভবতী থাকে না তখন তার জরায়ু একটি মুঠোর সমান (প্রায় ৩ ইঞ্চি লম্বা ও ২ ইঞ্চি চওড়া)।

গর্ভনালি বা ডিম্ববাহী নালি : জরায়ুর ওপরের কোণায় দু'টি নালি থাকে যা জরায়ু/গর্ভাশয়ের সাথে ডিম্বাশয়ের যোগ করায়। তারা যেখানে ডিম্বাশয়ের সাথে যোগ হয়েছে, তা দেখতে ফুলের মতো। এই নালির মধ্য দিয়ে ডিম্বকোষ জরায়ুতে যায়।

ডিম্বাশয় : জরায়ুর ওপরের ডান ও বামদিকে বড় একটি আঙুরের মতো দু'টি ডিম্বাকার অঙ্গ থাকে। এটির সাথে স্নায়ুতন্ত্রী এবং চামড়ার পরতযুক্ত। জন্ম থেকে ডিম্বাশয়ে ৫০০,০০০ ডিম থাকে। ডিম্বাশয়ে ডিম সংরক্ষিত থাকে এবং বেড়ে ওঠে। তারপর ডিম্বস্ফোটন প্রক্রিয়ার ডিম্ববাহী নালির মধ্যে চলে আসে। এটি নারীর হরমোনও তৈরি করে।

পুরুষ প্রজননতন্ত্র

বাইরের যৌনাঙ্গ

পুরুষাঙ্গ : মূত্র এবং প্রজনন কার্য ক্ষমতাসম্পন্ন একটি অঙ্গ। এটি খুবই সংবেদনশীল। এটির আকার ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে ভিন্ন হয়। বেশিরভাগ সময় পুরুষাঙ্গ নরম ও ঝুলন্ত থাকে। তবে যৌন উত্তেজনার সময় এটির আকার বৃদ্ধি পায় এবং শক্ত হয়ে যায়, এই প্রক্রিয়াকে বলে লিঙ্গোত্থান। যৌনক্রিয়ার সময় এটি থেকে তরল পদার্থ বের হয়, যাকে বলে শুক্রাণু বা বীর্য, যাতে থাকে শুক্র এবং এটিকে বীর্যপাত বলা হয়। পুরুষাঙ্গ দু'টি ভাগে তৈরি- দণ্ড এবং শিশ্নমুণ্ড। পুরুষাঙ্গের মূল অংশ হলো দণ্ড এবং শিশ্নমুণ্ড হচ্ছে পুরুষাঙ্গের মাথাটি। এর ত্বক খুব নরম এবং সংবেদনশীল। শিশ্নমুণ্ডের শেষে একটুখানি খোলা, যেখান থেকে বীর্য এবং মূত্র শরীর থেকে মূত্রনালি হয়ে বের হয়।

অণ্ডকোষ : পুরুষাঙ্গের পেছনে একটি থলের মতো, যেটির অনেকগুলো স্তর আছে, বাইরেরটি শরীরের অন্যস্থানের চেয়ে গাঢ় রঙের কেশাচ্ছাদিত সূক্ষ্ম ত্বক দিয়ে ঢাকা। এর অবস্থা পেশির সংকোচন বা শিথিলতার ওপর নির্ভর করে। যেমন- শীতে এটি সংকুচিত এবং কুঁচকে যায় এবং গরমে এটি মসৃণ এবং প্রসারিত হয়। অণ্ডকোষে শুক্রাশয় থাকে।

অভ্যন্তরীণ যৌনাঙ্গ

শুক্রাশয় : যখন কোনো কিশোর যৌবনে পৌঁছায়, তখন দু'টি শুক্রাশয় কোটি কোটি অতিক্ষুদ্র শুক্রাণু উৎপাদন করে। শুক্রাণু উৎপাদন ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। শুক্রাশয় ডিম্বাকার এবং ২ ইঞ্চি (৫ সে.মি.) মতো বাড়ে লম্বায় এবং ১ ইঞ্চি (৩ সে.মি.) ব্যাসে। শুক্রাশয়ও অন্তঃস্রাবি ব্যবস্থার একটি অংশ কারণ এগুলো হরমোন উৎপাদন করে, টেস্টোস্টেরনসহ যা পুরুষের বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী, যেমন- ত্বকের প্রকৃতি, মুখমণ্ডলের কেশ, গলার স্বর এবং পেশী। এটি দেখতে দু'টি ডিমের মতো এবং এগুলোকে অনুভব করতে হলে স্পর্শ করতে হবে।

এপিডিডাইমিস : শুক্রাশয়ের সাথে যোগ করা ১টি পথ। শুক্র শুক্রাশয়ে উৎপাদিত হয় এবং এপিডিডাইমিসে সংরক্ষিত থাকে যতদিন পর্যন্ত না তা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় এবং বীর্যপাতের মুহূর্তে তা বের হয়ে আসে।

অন্তর্বাহী নালি (ভাস নালি) : দু'টি অতি চিকন অণ্ডকোষ নালি, যা শুক্রকে প্রোস্টেট গ্রন্থিতে নিয়ে যায়।

প্রোস্টেট গ্রন্থি : এটি বীর্যের কিছুটা অংশ উৎপাদন করে। এটি বীর্যপাত নালির চারপাশে থাকে মূত্রনালির কেন্দ্রে।

বীর্যথলে : ভাস নালির সাথে যুক্ত দু'টি থলের মতো জিনিস মূত্রথলির কাছে থাকে। বীর্যথলে এবং প্রোস্টেট গ্রন্থি ১টি সাদা ধরনের তরল উৎপাদন করে যাকে বীর্যদ্রব বলে, যা শুক্রের সাথে মেশে যখন কোনো পুরুষের যৌন উত্তেজনা হয়।

মূত্রনালি : ১টি নালি যা মূত্র নির্গমন এবং বীর্যপাত দু'টিতেই লাগে। এটি প্রায় ৮ ইঞ্চি (২০ সে.মি.) লম্বা এবং ৩ ভাগে বিভক্ত যেমন- প্রোস্টেটিক মূত্রনালি- যা প্রোস্টেট গ্রন্থির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়; ঝিল্লিময় মূত্রনালি- যা শ্রোণির মধ্যচ্ছদা দিয়ে প্রবাহিত হয়। তৃতীয় অংশটি পুরুষাঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়।

বীর্যপাত নালি : এটি তৈরি হয়েছে অন্তর্বাহী নালির সংযোগে এবং বীর্যথলে দিয়ে। এটি ছোট ও সোজা এবং প্রায় পুরো পথটিই প্রোস্টেটের পাশে, শেষ হয়েছে মূত্রনালিতে গিয়ে। বীর্যপাত নালিতে বীর্যথলে ও অন্তর্বাহী নালির তরল পদার্থ একসাথে মিশে প্রোস্টেটিক মূত্রনালিতে প্রবাহিত হয়।

[সূত্র : কোরো ফর লিটারেসি ২০০৮]

শিশু জন্ম প্রক্রিয়া

প্রথমে শুক্র শুক্রাশয়ে তৈরি হয়, তারপর তা এপিডিডাইমিসের মধ্য দিয়ে যায়। এরপর শুক্র ভাস নালিতে পৌঁছায়। এটি সেখানে বীর্যপাত না হওয়া পর্যন্ত থাকে। প্রোস্টেট গ্রন্থি এক ধরনের তরল উৎপাদন করে, যা শুক্রকে শরীরের বাইরে বাঁচিয়ে রাখে। বীর্যপাতের সময় প্রোস্টেট এবং অন্য গ্রন্থি থেকে শুক্র এবং তরল একটি মিশ্রণ তৈরি হয় মূত্রনালি থেকে বের হবার সময়। এই মিশ্রণটিকে বীর্য বলে। মূত্রনালি একটি নালি, যা মূত্রথলির সাথে মূত্র নির্গমনের জন্য যুক্ত থাকে। যৌনমিলনের উত্তেজনার সময় এই সংযোগটি বন্ধ থাকে যেন বীর্য মূত্রের সংস্পর্শে না আসে। একটি শুক্রাণুর নিজে থেকেই সাঁতরে চলাফেরার ক্ষমতা রয়েছে। এটির একটি ডিমের মতো মাথা এবং ঘূর্ণির মতো লেজ থাকে। শুক্রাণু পুরুষের কাছ থেকে বংশগতি তথ্য নিয়ে যায় এবং একটি অবিকশিত ভ্রূণ সৃষ্টি করতে নারীর ডিম্বের সাথে একত্রিত হয়। ২ মাস পরে অবিকশিত ভ্রূণটি একটি ভ্রূণ হয়ে যায়, যা পরে শিশু হয়।

শুক্রাণু অনেক নাজুক এবং তার বেঁচে থাকার সুযোগও কম। সেজন্যই প্রতিটি মানুষের শুক্রাশয় প্রতিদিন কোটি কোটি শুক্র উৎপাদন করে। দুধ বা ক্রিম অথবা ননির মতো বীর্যতে কোটি কোটি শুক্র থাকে, কিন্তু নারীর যোনি থেকে ডিম্বনালিতে যাবার সময় তাদের সামান্য কয়েকটি বাঁচে, যেখানে নারীর ডিম শুক্রে নিষিক্ত হবার জন্য অপেক্ষা করছে। যে সামান্য কয়েকটা বাঁচে তার মধ্য থেকে একটি শুক্র একটা ডিমে ঢুকে তাকে নিষিক্ত করে।

শুক্র যদিও অনেক নাজুক, কিন্তু সেটি অনেক অটল ও দীর্ঘদিন উজ্জীবিত থাকতে পারে। অনেক সময় গর্ভধারণ যৌনমিলন ছাড়া এমনকি সতীচ্ছদ অক্ষত রেখেই হতে পারে। সতীচ্ছদ একটি আবরণ, যা যোনিকে কিছুটা ঢেকে রাখে। এটিকে বলা হয় 'স্প্ল্যাশ গর্ভধারণ'। শুক্র খুব দ্রুত যোনির বাইরে থেকে জরায়ুতে প্রবেশ করতে পারে। যৌনমিলনের ৩ দিন পর পর্যন্ত শুক্র নারীর প্রজনন অঙ্গে বেঁচে থাকে।

জন্ম থেকেই নারী তার শরীর একাউন্টে ৫০০০০০ ডিম্বকোষ পায়, যা ডিম্বাশয়ে থাকে। এই বিরাট অঙ্কের মাত্র ৩০০-৫০০ নারীর জীবনের প্রজনন বছরগুলোতে ছাড়া পায়। যা ৮-১০ বছর বয়সে শুরু হয়, হরমোন নিঃসরণ বেড়ে মেয়েকে যুবতী নারীতে রূপান্তরিত করে। প্রথম ঋতু হয় ১১-১৪ বছরে বয়সে, যা শরীর সন্তান নিতে তৈরি হবার জন্য নিশ্চিত সংকেত। এটি অবশ্যই 'শারীরিকভাবে তৈরি' বলা যায়। আবেগীয় দিক থেকে তোমরা নিজেদের সন্তান নেবার জন্য প্রস্তুত হওয়া থেকে হয়তো অনেক দূরে রয়েছ।

নারীর উর্বতার সময় জানতে হলে এই চক্রটি বুঝতে হবে। চক্রটি ২৩-৩৫ দিনের। গড় চক্র ২৮ দিন পর্যন্ত থাকে। চক্রের প্রথম দিন হচ্ছে ঋতুর প্রথম দিন। শেষ দিন হচ্ছে পরের ঋতুর আগের দিন। চক্রের ব্যাপ্তি ব্যক্তিবিশেষে আলাদা হয় এবং তা সবসময় নিয়মিত হয় না। মানসিক চাপ, ওজন বাড়া বা কমায় তা বিঘ্ন ঘটতে পারে। প্রথম ঋতুর পরে, চক্র নিয়মিত হতে নারীর ১-৩ বছর লাগতে পারে।

চক্রের প্রথম ১৪ দিনে (সাধারণত চক্রের ব্যাপ্তির ওপর নির্ভর করে) ডিম পরিপূর্ণ হতে থাকে। একটি হরমোন যাকে গুটিকা উদ্দীপক হরমোন (follicle stimulating hormone -FSH) বলে, পরিপূর্ণ হবার প্রক্রিয়াকে উদ্দীপ্ত করে। ডিমের চারপাশের প্রলেপ এস্ট্রোজেন উৎপাদন করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নারী হরমোন, যা নিষিক্ত হবার পরে ডিমটিকে থাকার জন্য জরায়ুর আস্তরণকে বড় করে একটি পুষ্টিকর এবং নিরাপদস্থান তৈরি করে।

২৮ দিনের চক্রের আনুমানিক ১৪ দিনে একটি ডিম বের হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। মস্তিষ্কের আরেকটি হরমোন যাকে বৃদ্ধিকারী হরমোন (luteinizing hormone-LH) বলে, ডিমকে নির্দেশনা দেয় ডিম্বাশয় থেকে বের হয়ে ফ্যালোপিয়ান টিউবে যেতে। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে বলে ডিম্বস্ফোটন। এটি কোনো নারীর গর্ভধারণ করার জন্য মাসের মধ্যে সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। এরপর ডিম ডিম্বাশয় বা গর্ভনালি থেকে জরায়ুতে যায়। এই ভ্রমণ ৭ দিন সময় নেয়। ইত্যবসরে, আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ হরমোন উৎপাদিত হয় ডিম্বাশয়ে, প্রোজেস্টেরন, যা জরায়ুকে গর্ভধারণের উপযোগী করে তুলতে যথেষ্ট রক্ত সঞ্চালন এবং নিষিক্ত ডিমকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে।

শুক্র তৈরি ডিমকে ৬ থেকে ১২ ঘণ্টার মধ্যে ফ্যালোপিয়ান টিউবে নিষিক্ত করতে পারে। নিষিক্ত হয় তখন যখন একটি শুক্র ডিমে প্রবেশ করে এবং ভ্রূণের আকার পেতে শুরু করে। দু'টি কোষ বিভক্ত হয়ে ৪টি হয়, সেই ৪টি আবার ৮টি হয় এবং তা এভাবে চলতে থাকে। যখন কোষগুচ্ছ জরায়ুতে পৌঁছায় এবং জরায়ুর আস্তরণে বসতি গড়ে তখন এটি একটি ভ্রূণ হয়ে যায়। এই বসতি গড়াকে বলে প্রতিস্থাপন। নিষিক্ত হওয়া থেকে প্রতিস্থাপন হতে সময় লাগে ৭দিন। নারীর রক্তে এস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরনের - সাথে ভ্রূণের চারপাশের কোষ থেকে গর্ভাবস্থার হরমোন এইচসিজির বৃদ্ধি গর্ভাবস্থা নির্দেশ করে। এই সময় থেকে নারীদেহ ভ্রূণের বেড়ে ওঠার ওপরে মনোযোগ দেয় এবং শিশুজন্মের পরের কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত এই চক্রটি বন্ধ থাকে। তাই নারী গর্ভাবস্থায় আবার গর্ভবতী হতে পারে না। একজন নারী একবারই গর্ভবতী হতে পারে, তবে এতে একের বেশি ভ্রূণ থাকতে পারে যেমন- জমজ।

এস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরনের বৃদ্ধি ডিম্বাশয়ে সংকেত পাঠায় যে এখন আর কোনো ডিম উৎপাদন করো না। আমাদের এখন এই ভ্রূণটিকে দেখতে হবে আগে যদি কোনো ডিম নিষিক্ত না হয় তাহলে প্রোজেস্টেরন উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। তেমনি এস্ট্রোজেনেরও। বার্তাটি মূলত এমন- এই মাসে আমাদের কোনো নিষিক্ত ডিম নেই ভ্রূণ তৈরি করতে, তাই সব জোগাড়যন্ত্র বন্ধ করে নতুন করে শুরু কর আর কাহিনির শেষ হয় জরায়ুতে যে মোটা আস্তরণ, যা নিষিক্ত ডিমের শয্যা হবার কথা, সেটির আর দরকার থাকে না। যে ডিম নিষিক্ত হয়নি সেটির ক্ষেত্রেও এমন বলা যায়। শরীর শয্যা থেকে আর ডিম রক্তপাতের মধ্য দিয়ে রেহাই পায়। এটিই হলো মাসিক বা ঋতুকাল।

জানা-অজানা

- নারী সন্তান জন্ম দিতে পারে যখন সে ডিম উৎপাদন করে (১১ বছর বয়স) তখন থেকে ঋতু/মাসিক বন্ধ (প্রায় ৫২ বছর বয়স) পর্যন্ত
- নারীর একটি ঋতু বা মাসিক চক্র আছে, যা থেকে তার উর্বরতা নির্ণয় করা যায়
- নারীর ডিম শুধু ৬-১২ ঘণ্টার মধ্যে পুরুষের বীর্য দ্বারাই নিষিক্ত হতে পারে
- কোনো নারী কুমারী থেকেও গর্ভবতী হতে পারে (স্প্ল্যাশ প্রেগনেন্সি- যদি তার সঙ্গী তার যোনিতে বীর্যপাত না করে যোনির কাছে কোথাও করে)।

স্বপ্নদোষ

স্বপ্নদোষ হচ্ছে যখন ঘুমের মধ্যে কোনো ছেলে/পুরুষ বীর্যপাত করে। বীর্যপাত মানে হলো পুরুষাঙ্গ থেকে বীর্য বের হওয়া (যে তরলে শুক্র থাকে)। সাধারণত যখন যৌনসম্পর্কিত স্বপ্ন দেখে, তখন স্বপ্নদোষ হয়। সে হয়তো স্বপ্নটি মনেও করতে পারে না। স্বপ্নদোষের জন্য তাকে হস্তমৈথুন করতে হয় না। পুরুষাঙ্গটি স্পর্শ না করেই সে বীর্যপাত ঘটাতে পারে। বড় হবার প্রক্রিয়ায় স্বপ্নদোষ খুবই স্বাভাবিক। কেউ স্বপ্নদোষ নিয়ন্ত্রণ করতে বা বন্ধ করতে পারে না। কারও যদি অনেক বেশি স্বপ্নদোষ হয়, তাহলে তার কোনো সমস্যা আছে, তা বলা যাবে না। কারো কারো সপ্তাহে কয়েকবার স্বপ্নদোষ হতে পারে, আবার কারো সারাজীবনে মাত্র একবার স্বপ্নদোষ হতে পারে।

যৌনমিলন

দু'টি মানুষের মধ্যে যৌনক্রিয়া বিশেষ করে যেখানে পুরুষ তার পুরুষাঙ্গটি নারীর যোনির ভেতর প্রবেশ করায়।

শিশু ছেলে না মেয়ে হবে সেটির প্রক্রিয়া

গর্ভকালে সেক্স নির্ধারিত হয় ক্রোমোজোমের বৈশিষ্ট্য থেকে। গর্ভধারণের আগে, অনিষিক্ত ডিম এক্স ক্রোমোজোম ধারণ করে, আর শুক্র হয় এক্স বা ওয়াই ক্রোমোজোম ধারণ করতে পারে। শিশুর সেক্স সহজভাবে এভাবে হয় বলা যেতে পারে-

- যদি শুক্র এক্স ক্রোমোজোম নিয়ে ডিম এক্স নিষিক্ত করে তবে মেয়ে হবে (XX)
- যদি শুক্র ওয়াই ক্রোমোজোম নিয়ে ডিম এক্স নিষিক্ত করে তবে ছেলে হবে (XY)

শিশুর প্রাপ্ত সেক্স নির্ধারিত হয় গর্ভধারণের সময় মা-বাবা থেকে পাওয়া ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের ভিত্তিতে। মায়ের ডিমে থাকে এক্স ক্রোমোজোম এবং বাবার শুক্রে থাকে এক্স অথবা ওয়াই ক্রোমোজোম। যেহেতু নারীরা ওয়াই ক্রোমোজোম ধারণ করে না, তাই শিশু ছেলে হবে না মেয়ে হবে, সেটি মায়ের ওপর নির্ভর করে না। এটি পুরুষ (আসলে পুরুষের শুক্র) নির্দেশ করে ছেলে হবে না মেয়ে হবে।

(সূত্র : দ্য সোসাইটি অফ অবসটেট্রিসিয়ান অ্যান্ড গায়োনোকলজিস্ট অফ কানাডা ২০১৭)

কুইজ প্রশ্ন

(প্রাক ও সেশনপরবর্তী-পরীক্ষা)

১. প্রজননতন্ত্র কী?

২. ৩টি পুরুষ প্রজনন অঙ্গের নাম লেখ

৩. ৩টি স্ত্রী প্রজনন অঙ্গের নাম লেখ

৪. ডিম্বাশয় বা গর্ভনালির অবস্থান কোথায় লেখ

৫. বীর্য কোথায় উৎপাদিত হয়?

৬. নারীর কেন মাসিক হয়?

অধিবেশন ৩.৩ যৌন অধিকার সম্পর্কে জানা

উদ্দেশ্য

- যৌন এবং যৌনতা সম্পর্কে জানা
- সামাজিক বৈষম্যমূলক রীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে নিজের যৌনতা ও যৌন অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া

পদ্ধতি

গল্প বিশ্লেষণ, আলোচনা (এই সেশনটি মেয়ে ও ছেলেদের আলাদা হবে এবং সহায়কও একই সেক্স-এর হবেন)

উপকরণ

ফ্লিপ কাগজ, মার্কার, 'খারাপ স্পর্শের' ওপর ফ্লিপ শিট, গল্পের অনুলিপি

সময়

৪৫ মিনিট

প্রক্রিয়া

- অংশগ্রহণকারীদের আলোচনার আগে হাসিখুশি করে তুলতে - একটি উদ্দীপনা দিয়ে সেশন শুরু করুন
- 'যৌন' এবং 'যৌনতা' শব্দ দু'টি একটি ফ্লিপ কাগজ বা বোর্ডে লিখুন। তাদের জিজ্ঞেস করুন যে, তাদের এই দু'টি শব্দ সম্পর্কে ধারণা আছে কিনা এবং এ শব্দ দু'টির মধ্যে পার্থক্য আছে কিনা। তাদের জিজ্ঞেস করুন 'যৌন' এবং 'যৌনতা' শব্দ দু'টি শুনলে প্রথম কোন্ কথা তাদের মাথায় আসে। তারা যা বলে তা লিখে রাখুন
- তাদের বলুন মানুষ বিশেষ করে আমাদের সমাজে, শব্দ দু'টি ব্যবহার করতে লজ্জা বা ইতস্ততবোধ করে। অনেক কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে এই শব্দগুলোর মানে অনেকে পরিষ্কারভাবে জানে না বা বোঝে না। অনেকে আলাদাও করতে পারে না। আমরা অনেকে এটিকে খারাপ বা ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ হিসেবে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করি। তারপর আলোচনা এড়িয়ে যাই ফলে এর সাথে জড়িত ঝুঁকির কারণগুলো চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হই
- আলোচনা চালান এভাবে- সবাই জানে যে, সেক্স হচ্ছে নারী ও পুরুষনির্বিশেষে কোনো মানুষের জৈবিক পরিচয়। সেক্স বলতে আবার যৌন কর্মকাণ্ডকেও বোঝানো হয়, বিশেষ করে যৌনমিলনের সংক্ষিপ্ত রূপ বোঝাতে। যৌনতা বলতে বোঝায় একজন মানুষ হিসেবে তুমি কী, তোমার নারীত্ব বা পুরুষত্ব। আমাদের যৌনতা শুরু হয় জন্মের সময় এবং শেষ হয় মৃত্যুতে। যৌনতা হচ্ছে- শরীরের আবেদন, জেন্ডার পরিচয়, যৌন প্রবৃত্তি, যৌন আকাঙ্ক্ষা, অভিব্যক্তি, যৌন কামনা, যৌনাঙ্গ, ঘনিষ্ঠতা, সম্পর্ক, প্রেম এবং ভালোবাসা। একজন মানুষের মনোভাব, মূল্যবোধ, জ্ঞান এবং আচরণ তার যৌনতার অন্তর্ভুক্ত। 'যৌনতা', 'সেক্স বা যৌনমিলন' থেকে ভিন্ন। যৌনতা অনেক বড় পরিসরের শব্দ, এর অনেক ভাগ বা অংশ রয়েছে এবং এটি যৌনমিলনের চেয়েও অনেক ব্যাপক।
- তাদের বলুন মানুষ কীভাবে তাদের যৌনতাকে ব্যক্ত করে তা তাদের পরিবার, সংস্কৃতি, বিশ্বাস এবং ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত। যৌনতা নিয়ে মানুষের আলাদা মূল্যবোধ রয়েছে
- এখন অংশগ্রহণকারীদের দু'টি দলে ভাগ করে গল্পটি পড়তে দিন। তাদের ১০ মিনিট সময় দিন পড়তে ও আলোচনা করতে।

মিনা ৩টি বাড়িতে গৃহপরিচারিকার কাজ করে। তার দিন শুরু হয় খুব ভোরে এবং সে সন্ধ্যাপর্যন্ত কাজ করতে থাকে। সে বাসাগুলোর সব কাজ করে। সকালের নাস্তা বানানো থেকে শুরু করে রান্না করা, কাপড় ধোয়া, বাসন ও মেঝে পরিষ্কার করা। সে বস্তিতে একটি ছোট ভাড়া বাসায় থাকে তার স্বামী ও ৩টি সন্তান নিয়ে। যেখানে তাকে অন্য ভাড়াটেদের সাথে শৌচাগার এবং রান্না করার জন্য চুলা ব্যবহার করতে হয়। প্রতিদিন সে খুব ভোরে ওঠে যখন প্রায় অন্ধকার থাকে, স্বামী ও সন্তানদের জন্য রান্না আর সবকিছু ঠিকঠাক করে রাখে, যেন সে না থাকলেও তার স্বামী ও সন্তানরা তৈরি খাবার পায়। সন্ধ্যায় কাজ থেকে ফেরার পথে সে প্রতিদিনের দরকারি শাক-সবজি কিনে তাড়াতাড়ি রান্না করার জন্য চলে আসে। বিছানায় যাবার আগে তার কোনো বিশ্রাম নেই। বিছানাটা আসলে ঠিক বিছানা নয়, একটা ছেঁড়া চটের বস্তার ওপরে কাপড় বিছানো, যেখানে সে, স্বামী আর সবচেয়ে ছোট ৩ বছরের বাচ্চা একসাথে ঘুমায়। তাদের একটা ছোট চৌকি আছে যেটিতে তার অন্য ছেলে আর কিশোরী মেয়ে ঘুমায়। তার স্বামী সাজ্জাদ রিক্সা চালায়। সে সারাদিনে সামান্য সময় কাজ করে, সামান্য টাকা আয় করে। আয়ের বেশিরভাগ খরচ করে নিজের জন্য- তাস খেলে আর ধূমপান করে। বেশিরভাগ সময় সে টাকা নেয় মিনার কাছ থেকে।

মিনা, যার একটি মিনিটের জন্যেও ছুটি নেই। সে রাতেও ভালোভাবে ঘুমাতে পারে না, কারণ বেশিরভাগ রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পরে সাজ্জাদ মিনাকে খোঁচাতে থাকে যৌনমিলনের জন্য। সারাদিন ধরে কাজ করে ক্লান্ত মিনা তাকে মানা করে না। কারণ তাকে শেখানো হয়েছে এবং সে শিখেছে পরিপূর্ণ নারী হয়ে ওঠার শুরু থেকেই যে স্ত্রীকে স্বামীর সব ইচ্ছে মেনে নিতে হয়। দৈহিক মিলন থেকে শুরু করে প্রতিদিনের ইচ্ছেগুলোকে পর্যন্ত। কোনো স্ত্রীর উচিত নয় স্বামী যখন মিলিত হতে চাইবে, তখন তাকে প্রত্যাখ্যান করা। এসব শেখা সত্ত্বেও মিনা কোনো কোনো রাতে তাকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু সেসব রাত ছিল ভয়ানক, সেগুলো ছিল তার জন্য দুঃস্বপ্ন। তাকে মার, ঘুষি এবং সবরকম শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। সন্তানদের সামনে সাজ্জাদ তাকে গালিগালাজ করে এবং তাকে দোষারোপ করে। আরেকজনের সাথে পরকীয়া প্রেম আছে এই কথা বলে। তার সন্তানরা ভয় পায়, অনেক সময় তারাও মাকে বাঁচাতে এসে বাবার হাতে মার খায়। এখন তার দু'টি সন্তানের যৌন বা দৈহিক সম্পর্ক কী তা বোঝার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। সে লজ্জা পায় এই ভেবে যে তাদের কী অভিজ্ঞতা হচ্ছে মা-বাবার যৌন সম্পর্ক নিয়ে। সে সে একই ঘরে থাকে নিজের কিশোরী মেয়ের জন্যে দুঃখবোধও করে। তার (কিশোরী মেয়ে) কী মনে হয়, নিশ্চয় সে বিপর্যস্ত এবং লজ্জিত হয়। এই পরিস্থিতি বিবেচনা করে সে ঠিক করেছে তার স্বামীকে আর মানা করবে না রাতে, যত ক্লান্তই সে থাকুক। অনেক সময় সে কাঁদতে কাঁদতে নির্ঘুম রাত কাটায় আর ভাবে নিজের কথা, সে কি একটা মানুষ? সে নিজেকে একটা রাস্তার পশু মনে করে। যার অনুভব করা, বলা, মতবিনিময় করা বা আনন্দ পাবার কোনো অধিকার নেই, তার শরীর শুধু স্বামীর ভোগ করার জন্য? তাকে কখনো মিলনের আনন্দের, প্রত্যাশা, আনন্দের কথা জিজ্ঞেস করা হয়নি বিয়ের পর থেকে। এটা বলা যায় না যে সে কখনোই যৌন আকাঙ্ক্ষা অনুভব করেনি। কিন্তু তা সে স্বামীর কাছে প্রকাশ করে না। কীভাবে করবে? সে একজন নারী এবং নারী হয়ে নিজের ইচ্ছের কথা এভাবে কী বলা সম্ভব? অন্য মানুষ এমনকি তার স্বামী ভাববে 'সে কি খারাপ মেয়ে?' সে অনেক ভেবেছে এবং বুঝতে পেরেছে যে সমাজ শুধু পুরুষের যখন, যার সাথে, যেখানে খুশি ইচ্ছা প্রকাশ করাটাকে মেনে নিয়েছে। অন্যদিকে স্ত্রীরা সবসময়ই স্বামীকে আনন্দ দেবে। প্রথমদিকে সাজ্জাদ স্পর্শ করলেই সে উত্তেজিত হতো। তবে সাজ্জাদ কখনো ভাবেইনি যে তার সম্মতি নিতে হবে বা তার আনন্দ-অনুভবের কথা জিজ্ঞাসা করবে। এমনকি গর্ভধারণের ব্যাপারেও তার কোনো কথা বলার ছিল না। সে নিরাপদ যৌনমিলনের জন্য গর্ভনিরোধক সম্পর্কে জানে না। ৩০ বছর বয়সেই সে তিন সন্তানের মা। তাকে লাগে ৫০ বছর বয়স্কা নারীর মতো। তার সব মানসিক এবং শারীরিক সৌন্দর্য মিলিয়ে গেছে। সে অন্যদের কাছে শুনেছে যে সাজ্জাদ অন্য নারীর কাছে যায়, যদিও সে স্বীকার করে না। বরং ঝগড়া এবং সহিংস আচরণ করে যদি মিনা কখনো তার পরকীয়া নিয়ে কোনো কথা জিজ্ঞেস করে। তার নিজেকে নিয়ে চিন্তা করার সময় নেই। তার দিন যায় মানসিক চাপের মধ্যে, চিন্তায় কীভাবে তিনটি সন্তানকে মানুষ করবে এবং বিবাহিত জীবন সামলাবে, কারণ সে বুঝতে পেরেছে যে সাজ্জাদের এখন আর তার বা তাদের সন্তানদের জন্য কোনো ভালোবাসা নেই এবং যে কোনো সময়ে সে

- তাদেরকে বলুন যদি গল্পটি শেষ করে থাকে তবে তারা আলোচনায় অংশ নেবার জন্য এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে প্রস্তুত কিনা?
  - তোমাদের কি মনে হয় আমাদের সমাজে নারী ও পুরুষদের যৌনতার ব্যাপারে একই ধরনের রীতির অভিজ্ঞতা হয়? এগুলো কীভাবে আলাদা হয়?
  - নারীর যৌনতার বিষয়ে বৈষম্যমূলক রীতির কারণে নারীরা কী কী ধরনের ঝুঁকিতে পড়ে?
  - নারীর কি যৌন আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা থাকা উচিত? সেটা কি প্রকাশ করা উচিত?
  - শুধু কি পুরুষের যৌন আকাঙ্ক্ষা, অনুভব, আনন্দ আর প্রত্যাশার অধিকার থাকা উচিত?
  - যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে আনন্দ থাকা কি গুরুত্বপূর্ণ? যদি হ্যাঁ হয়, কেন?
  - নারী ও পুরুষের যৌন আকাঙ্ক্ষা, অনুভব, আনন্দ আর প্রত্যাশার কথা কি একে অপরকে বলা উচিত? যদি নারীটি বলতে না পারে তার আবেগ ও যৌনতার কথা তখন কী হয়?
  - কেন যৌন সম্পর্ক সহিংস হয়ে যায়? এটা কি সমাজে গৃহীত?
  - কে সহিংস হয়? নারী না পুরুষ? কেন নারীরা সম্পর্ককে সহ্য করে সেটা দুঃখ আর যন্ত্রণা বয়ে আনার পরেও?
  - নারী ও পুরুষের মধ্যে সুস্থ যৌন সম্পর্কের জন্য কী কী বিষয় গুরুত্বপূর্ণ?
  - যৌনতার ধারণা বোঝার ফলে নারী কীভাবে লাভবান হতে পারে?
- অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা করে গল্প থেকে তথ্য বের করে আনার মাধ্যমে তাদেরকে পরিষ্কার করুন যে সামাজিক রীতির কারণে নারীরা এসব (সহিংস যৌন সম্পর্ক, বৈবাহিক ধর্ষণ, এইচআইভি/এইডস এবং অন্যান্য যৌনবাহিত রোগ, ঘন ঘন সন্তান হওয়া, বন্ধ্যাত্ব ইত্যাদি) অভিজ্ঞতার শিকার হতে পারে। তাদেরকে নির্দেশনা দিন সঠিক তথ্য ও জ্ঞানের সাথে ওপরের প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দিতে। আমাদের নিজেদের যৌনতা, যৌন অধিকার এবং অন্যদের যৌনতা ও যৌন অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়াটা খুবই প্রয়োজনীয়
- তাদের বলুন যে বয়ঃসন্ধিকালে আমরা অনেক শারীরিক ও মানসিক বা আবেগীয় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাই এবং এ পর্যায়ে মেয়ে ও ছেলেদের মধ্যে বিপরীত সেক্সের সাথে সম্পর্ক করতে চাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। তবে তাদেরকে নিশ্চিত হতে হবে যাকে সে পছন্দ করছে সে তার যৌনতাকে সম্মান করছে এবং সে নিজের প্রতি সম্মান দেখাচ্ছে। তোমাদের একটি জিনিস মনে রাখতে হবে আর তা হলো সত্যিকারের ভালোবাসা কষ্ট দেয় না। যেখানে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ নেই সেখানে ভালোবাসাও অনুপস্থিত থাকে
- আলোচনা চালিয়ে যান এই বলে মানুষ যৌন উত্তেজিত হয় স্পর্শে। তাই আমাদের সবাইকে 'কু বা খারাপ স্পর্শ' এবং অবাঞ্ছিত যৌনস্পর্শ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। আমাদের দৈনিক জীবনে অপরের সাথে আমাদের শারীরিক সংযোগ ঘটে থাকতে পারে। আমরা যদি ভালোর সাথে খারাপের পার্থক্য না করতে পারি, তাহলে অনেকে অন্য মানুষকে অসঙ্গত উপায়ে স্পর্শ করে উত্তেজিত হতে পারে যা ওই মানুষটি পছন্দ না-ও করতে পারে। এই কাজটি সহিংসতা এবং অসম্মানজনক বলে বিবেচিত হয় যাকে স্পর্শ করা হচ্ছে তার জন্য। এরপর তাদেরকে খারাপ স্পর্শের ফ্লিপ শিটটি দেখান। আলোচনা করুন তাদের সাথে যে কোথায় এমন হয়, কে করে এবং এ থেকে নিরাপদ থাকার উপায় কী। কিছু বাস্তব উদাহরণ দিন আলোচনার সময়
- আলোচনা শেষে তাদেরকে ব্যাখ্যা করুন সর্বজনীন যৌন অধিকার কী, যা সকলেরই ভোগ করা উচিত।

সহায়কের জন্য তথ্য

নারী ও পুরুষের আলাদা ধরন আর উপায় আছে নিজেদের আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য। এসব পার্থক্য সামাজিক রীতি ও জেন্ডার দ্বারা প্রভাবিত। এজন্য নারীরা তাদের যৌন আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতিকে লাগাম দিয়ে রাখে এবং সাধারণত তাদের যৌন অধিকার স্বীকৃতি পায় না। নারীরও যৌন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের অধিকার রয়েছে, সেই সাথে 'না' বলার, যদি তারা যৌন আগ্রাসন না চায় বা স্বামী, প্রেমিক, সঙ্গীর সাথে যৌনক্রিয়ায় অংশ নিতে না চায়

যৌনতা প্রতিটি নারীর জীবনের একটি অংশ। আমাদের সবার শরীরেই শারীরিক উত্তেজনা এবং আনন্দের সম্ভাবনা রয়েছে। কোনো কোনো নারী জীবনে কখনো যৌনভাবে সক্রিয় হতে না-ও চাইতে পারে, তবে বেশিরভাগ নারীই তাদের জীবনের কোনো এক সময়ে যৌন আকাঙ্ক্ষা কোনো না কোনোভাবে পূরণ করে। কীভাবে নারী তার যৌনতা প্রকাশ করবেন (বা করবেন না) সেটার স্বাধীনতা নারীর যৌন স্বাস্থ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

নিজের শরীরকে বোঝা এবং তা কীভাবে কাজ করে সেটা জানা যৌন স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যেসব নারী বোঝে, তাদের শরীরকে তারা আনন্দ দেবার জন্য যৌনক্রিয়ার ক্ষেত্রে ভালোটিকেই বেছে নিতে পারে। তারা গর্ভধারণ করবে না এড়িয়ে যাবে তাও বেছে নিতে পারে। যৌনবাহিত সংক্রমণ সম্পর্কে জ্ঞান নারী এবং তার সঙ্গীকে নানান অসুখ থেকে সুরক্ষিত রাখে। যৌন স্বাস্থ্যের মধ্যে নিজের সাথে এবং নিজের যৌন আকাঙ্ক্ষার সাথে সহজ হওয়ার মতো বিষয়ও পড়ে। এর মানে হলো অন্যের সাথে স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক। যৌন স্বাস্থ্যের মানে আরও হলো কীভাবে সহিংস এবং অত্যাচারিত সম্পর্ক চিহ্নিত করা যায়, প্রত্যাখান করা যায় এবং এমন সম্পর্কের কারণে সংঘটিত বিষয়গুলোকে মোকাবিলা কীভাবে করা যায় তা শেখা। নারীর যৌন সাড়াদান সম্পর্কে জানা তোমাকে নিজের শরীরের সাথে সহজ করে দেবে। তোমরা যদি বোঝ যে যখন তোমরা উত্তেজিত হও তখন তোমাদের শরীরে কী ঘটছে, তখন তোমরা হয়তো নিজের যৌন অভিজ্ঞতার উন্নয়ন ঘটাতে পারবে। মানব শরীরের প্রতিটা অংশই আনন্দ দিতে পারে স্পর্শ পেলে, তবে মানুষের শরীরের এমন কিছু অংশ আছে যা আদরের ক্ষেত্রে অন্য জায়গার চাইতে অনেক বেশি সংবেদনশীল। এটি মানুষে মানুষে আলাদা হয়, তাই সঙ্গীর সাথে কথা বলেই বুঝতে পারা যায় যে সে কিসে বেশি খুশি হয় (নারী বা পুরুষ উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য)। একজন নারীর যৌন প্রতিক্রিয়া সারাজীবন ধরে পরিবর্তিত হয়। এর কিছুটা হয় তার অভিজ্ঞতা ও স্ব-জ্ঞানের স্তরের পরিবর্তনে, আর শরীর বৃদ্ধির সাথে সাথে শারীরিক পরিবর্তনের কারণেও হয়। গর্ভধারণ এবং সন্তান জন্মদান নারীর যৌন প্রতিক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে। নারীর যৌন স্বাস্থ্যের আরেকটি অংশ হচ্ছে কীভাবে ঋতু বা মাসিক বন্ধের সাথে শারীরিক ও আবেগীয় পরিবর্তনকে সামলানো যায়।

(সূত্র : কোরো ফর লিটারেসি ২০০৮)

যৌন স্বাস্থ্যের অধিকার

যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের অধিকার হলো বয়স, জেন্ডার এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে সকল মানুষের, নিজের যৌনতা এবং প্রজননের ক্ষেত্রে নিজের পছন্দটিকে বেছে নেয়া এবং অন্যের পছন্দকেও সম্মান দেয়ার অধিকার। পছন্দ অনুযায়ী বেছে নেওয়া এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য সহযোগিতামূলক তথ্য ও সেবার ক্ষেত্রে প্রবেশ এবং অত্যাচার, সহিংসতা বা বৈষম্য থেকে মুক্ত থাকতে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারও এর মধ্যে পড়ে

সর্বোপরি যৌন অধিকারের মধ্যে পড়ে কারো শরীরের অখণ্ডতাকে সম্মান করা এবং যৌন সক্রিয় হওয়া বা না হওয়া, যৌনসঙ্গী বেছে নেওয়া, সম্মতির ভিত্তিতে যৌন সম্পর্কে যাওয়া (বিয়েসহ), এবং কখন সন্তান নেবে কি নেবে না এই বিষয়গুলোও। এইচআইভি/এইডস, অনিচ্ছাকৃত গর্ভধারণ, যৌন নির্যাতন ও সহিংসতা বা যে কোনো বড় ধরনের যৌন স্বাস্থ্যের বিষয়কে কেন্দ্র করে হোক না কেন, সারা পৃথিবীতে যৌন স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচিগুলো ঝুঁকি ও বিপন্নতা কমানোর পূর্বশর্ত হিসেবে ক্ষমতায়নের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছে (পার্কার ২০০৭)।

অধিবেশন ৩.৪ সুস্থ ও নিরাপদে থাকা

উদ্দেশ্য

- প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার সম্পর্কে জানা
- বয়ঃসন্ধিকালীন পরিচ্ছন্নতা ও পুষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয় করা

পদ্ধতি

আলোচনা, মুক্তচিন্তার ঝড় এবং গল্প বিশ্লেষণ (এই সেশনটি মেয়ে ও ছেলেদের আলাদা হবে এবং সহায়কও একই সেক্স-এর হবেন)

উপকরণ

ফ্লিপ কাগজ, মার্কার

সময়

৪৫ মিনিট

প্রক্রিয়া

- অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন তারা প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানে কিনা। তাদের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন। আলোচনা শুরু করুন তাদের আগের সেশনের কথা মনে করিয়ে দিয়ে যে তারা নারী ও পুরুষের প্রজনন অঙ্গ ও তন্ত্র সম্পর্কে এবং কীভাবে তারা সন্তান জন্ম প্রক্রিয়ায় জড়িত সে সম্পর্কে জেনেছে। এই প্রজননতন্ত্র হচ্ছে আমাদের শরীরের অংশ এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ শুধু প্রজন্ম সৃষ্টিতে নয়, একটি সুস্থ জীবনযাপনের জন্যও

- এখন জিজ্ঞেস করুন প্রজনন স্বাস্থ্যের সাথে কী কী বিষয় জড়িত। যখন তারা তালিকা করতে থাকবে, অনুগ্রহ করে একটি ফ্লিপ কাগজে লিখে রাখুন। তাদেরকে চিন্তা করতে এবং মাসিক, স্বপ্নদোষ, যৌনাঙ্গ পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থাপনা, সন্তান প্রসব, গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা, মাসিক নিয়মিতকরণ, গর্ভপাত, যৌনবাহিত রোগ, তথ্য ও সেবার কথা বলার জন্য দিকনির্দেশনা দিন

- তাদেরকে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিন এবং তাদের সাথে ডব্লিউএইচও-এর প্রণীত সংজ্ঞানুযায়ী প্রজনন স্বাস্থ্যের ওপর আলোচনা করুন

- তাদের বলুন যে বয়ঃসন্ধিকালে মেয়ে ও ছেলেরা বড় ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায় এবং তাই প্রজনন স্বাস্থ্যের ওপর পরিবর্তনগুলোর বড় ধরনের প্রভাব পড়ে। একটি সুস্থ জীবন এবং একটি স্বাস্থ্যকর শরীর ও মনের জন্য প্রতিটি কিশোরী-কিশোরের নিজের শরীর ও মনের পরিবর্তন সম্পর্কে জানার অধিকার আছে। তাদের এসব পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেবার জন্য যৌনবাহিত সংক্রমণ এবং রোগপ্রতিরোধ, অল্পবয়সে বা অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ, নিরাপদ এমআর (মাসিক নিয়মিতকরণ) সেবার এবং মাসিককালে যথাযথ পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থাপনার জন্য সব তথ্য জানা ও সেবা পাবার অধিকার আছে। আমরা জেনেছি, সামাজিক রীতির কারণে মেয়েরা ছেলেদের চাইতে তাদের শরীরের পরিবর্তন নিয়ে জিজ্ঞেস করতে এবং সহায়তা চাইতে অনেক বেশি সমস্যায় পড়ে। তাই ছেলেদের চাইতে মেয়েদের জন্য প্রজনন স্বাস্থ্যের অধিকার নিশ্চিত করা অনেক বেশি প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে, অন্যান্য অধিকারের মতো সামাজিক রীতির দ্বারা মেয়ে/নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্যের অধিকারও প্রত্যাখাত হয় (সবচাইতে বড় উদাহরণ হলো, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে গর্ভবতী নারীদের স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে, পরিবার পরিকল্পনা ও গর্ভনিরোধক ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কোনো সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা নেই, অপুষ্টির ফলে অকাল প্রসব এবং অল্প বয়সে গর্ভধারণ, প্রসব জটিলতায় উচ্চ মাতৃমৃত্যু হার এবং প্রসবকালীন ও প্রসবের পরে জটিলতার কারণে কিশোরীদের প্রজনন ক্ষমতাহ্রাস)

- তাদেরকে জানান যে, সম্প্রতি বাংলাদেশে কিশোরী-কিশোর ও নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত করতে প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অনেক সেবা দেয়া হচ্ছে। (অনুগ্রহ করে তাদের প্রজনন অধিকার ব্যাখ্যা করুন)। কিশোরী-কিশোর এবং নারী ও পুরুষ সবার সহজলভ্য সেবা এবং সেবা দাতা সম্পর্কে তথ্য জানা উচিত। তাদের জিজ্ঞেস করুন যে কোথায় এবং কী ধরনের সেবা তাদের এলাকায় দেয়া হচ্ছে তা তারা জানে কিনা। তাদেরকে অনুগ্রহ করে জানান যে, কোথায় গেলে তারা প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা পাবে। তাদের বলুন আমাদের সবার দায়িত্ব হচ্ছে এসব সেবা সম্পর্কে শেখা ও জানা
- এবার অংশগ্রহণকারীদের বলুন নিচের কেসগুলো বিশ্লেষণ করতে এবং আলোচনা করতে কেন বিশেষ করে কিশোরী-কিশোরদের জন্য তথ্য, জ্ঞান এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মেয়েদের প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে অধিক সচেতন হতে হবে, কারণ সামাজিক রীতির কারণে তাদের ছেলেদের চেয়ে অধিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। আরও আলোচনা করুন যে স্বপ্নদোষ এবং মাসিকের সাথে জড়িত বিষয় নিয়ে তাদের আরও চিন্তা করা উচিত এবং এসব ভিত্তিহীন জনশ্রুতি উপেক্ষা করা দরকার। তাদের বলুন বয়ঃসন্ধিকালে মেয়ে-ছেলে উভয়েরই বেড়ে ওঠার জন্য যথাযথ এবং যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টি আর খাবার প্রয়োজন।

কেস : ১

১৩ বছরের কলির মাসিকের সময় তলপেটে ব্যথা হয়। তার অনেক রক্তপাত হয় এবং ব্যথা এত বেশি হয় যে সে নড়তেই পারে না। এজন্য সে সবসময় স্কুলে অনুপস্থিত থাকে ওই বিশেষ দিনগুলোতে। তার দাদী ও মা তাকে বলেছে যে এটা একটা অসুখ যা সবার কাছে গোপন করে রাখতে হবে, কারণ জানাজানি হয়ে গেলে তার বিয়ের জন্য সুপাত্র পেতে অসুবিধা হতে পারে। তাকে সেই দিনগুলোতে অনেক খাবার, যেমন- মাংস, দুধ, ফল এবং টকফল খেতে মানা করা হয়, কারণ তারা মনে করে এগুলোতে তার রক্তপাত আরও বেশি হবে। তাকে কবিরাজের দেয়া শেকড়বাকড় দেয়া হয়েছে কিন্তু তাতে তার ব্যথা আর রক্তপাত কমেনি। এখন সে প্রায়শই অসুস্থ থাকে, তার ওজন কমে যাচ্ছে, খাওয়ায় রুচি নেই এবং নিদ্রাচ্ছন্ন ও ক্লান্ত থাকে।

কেস : ২

মানিকের বয়স ১৪। গত দুই বছর ধরে তার প্রায়ই স্বপ্নদোষ হচ্ছে। সে কাউকে তা বলতে পারে না। মা-বাবাকে এসব বলা খুবই লজ্জার ব্যাপার। তাকে বলা হয়েছে যে এটা একটা পাপ, কারণ এমন হয় যখন কেউ মেয়েদের সাথে যৌনমিলনের স্বপ্ন দেখে। অন্যরা তাকে ভুল বুঝতে পারে এবং তাকে খারাপ ছেলে ভাবতে পারে। শেষে সে একজন বন্ধুকে বলে। আর সেই বন্ধু তাকে এক ফেরিওয়ালা, যে রাস্তায় আয়ুর্বেদিক ওষুধ বিক্রি করে তার কাছে নিয়ে যায়। ফেরিওয়ালা তাকে একটা ওষুধ দেয় কিন্তু তাতে কাজ হয় না। তার কেবল ঘুম পায় এবং খাদ্যরুচি চলে গেছে সেই ওষুধ খাবার পরে। অনেক সময় তার স্কুলও বাদ পড়ে এসব কারণে। তাই সে ওই ওষুধ খাওয়া বন্ধ করেছে। এখন সে অপরাধবোধে ভোগে বারবার স্বপ্নদোষ হবার কারণে।

কেস : ৩

শিলা মাসিকের সময় পুরানো কাপড় ব্যবহার করে। সে তার মা-বাবার সাথে বস্তির একটি ঘরে ভাড়া থাকে যেখানে গণশৌচাগার ব্যবহার করতে হয়। সে তার যৌনাঙ্গ ভালোভাবে পরিষ্কার করতে পারে না সময় ও পানি স্বল্পতার কারণে। সে তার কাপড় খোলা বাতাসে বা রোদে শুকাতে পারে না। অনেক সময় তাকে প্রায় ভেজা কাপড় ব্যবহার করতে হয়। কয়েকদিন ধরে তার যৌনাঙ্গের চারপাশে চুলকাতে শুরু করেছে এবং দিন দিন অবস্থা খারাপ হচ্ছে। সে কাউকে এ কথা বলতে পারে না। একদিন সে তার মা'কে এটা বললে মা তাকে বকা দিয়ে বলেছে যে এসব নিয়ে খোলামেলা কথা বলতে নেই। মা-বাবার সাথে এসব নিয়ে আলাপ না করার মতো ভদ্রতা তার থাকা উচিত। তার মা তাকে বলেছে যে একসময় সে-ও এমন অবস্থার মধ্য দিয়ে গেছে এবং এটাই স্বাভাবিক।

কেস : ৪

মিনার বয়স ১৫ বছর এবং একই বস্তিতে থাকা একটি ছেলের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। ছেলেটির বয়স ১৮ বছর এবং সে স্কুলে যায় না। ছেলেটা তাকে বিয়ে করবে এই অঙ্গীকারের ভিত্তিতে গত বছর তাদের মধ্যে কয়েকবার দৈহিক সম্পর্ক হয়। তাদের মা-বাবা দু'জনই কাজ করে। নিরাপদ যৌনমিলন এবং গর্ভধারণ সম্পর্কে সে কিছুই জানত না। ছেলেটা তাকে সবসময়ই হুমকি দেয় তাদের যৌনসম্পর্কের কথা কাউকে না বলতে, যদি বলে তাহলে সে তাকে বিয়ে করবে না। কয়েক মাস পরে তার মাসিক না হওয়ায় সে বুঝতে পারে গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। কথাটা জেনে তার প্রেমিক তাকে একটি অপরিচ্ছন্ন জায়গায় নিয়ে যায় অনিরাপদ গর্ভপাত করানোর জন্য। সে সময়ে তার মনে হয়েছিল যেন সে মরেই যাবে। গর্ভপাতের পরে তার এত জটিলতা দেখা দেয় যে খবরটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এখন সে জীবন আর মরণের মাঝখানে আছে। সে শুধু শারীরিকভাবেই অসুস্থ নয়, তাকে তার মহল্লায়ও অপমান করা হয়েছে এবং সবাই তাকে খারাপ মেয়ে বলে ভাবে। এমনকি তার পরিবারও তাকে সবসময় দোষারোপ করে। অন্যদিকে ছেলেটা সব দায় অস্বীকার করছে।

সহায়কের জন্য তথ্য

প্রজনন স্বাস্থ্য

ডব্লিউএইচও স্বাস্থ্যের সংজ্ঞায় বলেছে- 'স্বাস্থ্য হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সুস্থ অবস্থা; শুধু রোগব্যাধি বা দুর্বলতার অনুপস্থিতি নয়।' এই সংজ্ঞার সাথে প্রজননতন্ত্র এবং এর কার্যাবলি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কিত।

তাই প্রজনন স্বাস্থ্য বলতে বোঝায় মানুষ তৃপ্তিদায়ক ও নিরাপদ যৌনজীবন পাবে এবং তাদের প্রজনন ক্ষমতা অর্থাৎ কখন, কীভাবে, কোথায় তারা তা ঘটাবে সেটা ঠিক করার স্বাধীনতা থাকবে। তার মানে হচ্ছে নারী ও পুরুষের নিরাপদ, ফলপ্রসূ, সাশ্রয়ী এবং গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করার পাশাপাশি আইন বহির্ভূত নয় এমনসব উর্বরতা নিয়মিতকরণের পদ্ধতি গ্রহণ, যথাযথ স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকার ও তথ্য পাবার অধিকার আছে যা নারীকে গর্ভ এবং সন্তান প্রসবকালে নিরাপদ রাখবে এবং স্বামী-স্ত্রীর সুস্থ শিশু পাবার সুযোগ থাকবে [ডব্লিউএইচও ২০১৭]।

ওপরের প্রজনন স্বাস্থ্যের সংজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে এটি একটি পদ্ধতি, উপায় এবং সেবার সংকলন যা প্রজনন স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যাসমূহ প্রতিরোধ এবং সমাধান করে প্রজনন স্বাস্থ্যে ও সুস্থ থাকায় অবদান রাখে। এতে যৌন স্বাস্থ্যও অন্তর্ভুক্ত, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবন এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ককে উন্নত করা, শুধুই প্রজনন ও যৌনবাহিত অসুখ নিয়ে কাউন্সেলিং এবং সেবা প্রদান নয় [ইউনাইটেড নেশনস্ পপুলেশন ফান্ড (ইউএনএফপিএ) ২০১৪]।

প্রজনন অধিকার- দম্পতি এবং ব্যক্তির উন্নতমানের স্বাস্থ্য লাভের মৌলিক অধিকার, যার মধ্যে আছে সন্তানের সংখ্যা, জন্মবিরতি এবং সময় সম্পর্কে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত ও দায়িত্ব নিতে পারা, তথ্য জানা ও পাওয়ার উপায় জানা এবং জোরজবরদস্তি ছাড়া, বৈষম্য এবং সহিংসতামুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারা (উইকিপিডিয়া এন. ডি.)। প্রজনন অধিকারের মধ্যে আরও থাকতে পারে- ভালোভাবে জেনে প্রজননের ক্ষেত্রে নিজের পছন্দকে বেছে নেবার জন্য নিরাপদ ও আইনবহির্ভূত নয় এমন গর্ভপাতের, জন্ম নিয়ন্ত্রণের, কোনোরকম বৈষম্য ছাড়াই প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা পাবার এবং গর্ভনিরোধক, এসটিআই সম্পর্কে শিক্ষা পাবার, বলপূর্বক নির্বীর্যকরণ, জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকার অধিকার।

যৌনবাহিত সংক্রমণ (Sexually Transmitted Infections)-এসটিআই

যখন কোনো এসটিআই সংক্রমিত ব্যক্তি আরেকজনের সাথে যৌনমিলনে লিপ্ত হয় তখন সংক্রমণ ঘটে। এইচআইভি একটি অনিরাময়যোগ্য এসটিআই, তবে বেশিরভাগ এসটিআই নিরাময়যোগ্য। যদি কারো এসটিআই থাকে, তবে তার এইচআইভিতে সংক্রমিত হবার সম্ভাবনা ১০ গুণ বেশি। এসটিআই নারীর বন্ধ্যাত্বের একটি অন্যতম কারণ। এসব সংক্রমণ নারীর প্রজননতন্ত্রের ক্ষতি করতে পারে, গর্ভধারণ তার জন্য অসম্ভব বা কঠিন হয়ে যেতে পারে। তাই এসটিআই থাকলে এর চিকিৎসা করা খুবই জরুরি।

মাসিক ও স্বপ্নদোষ সংক্রান্ত ভিত্তিহীন জনশ্রুতি

- মাসিক একটি অসুখ

  সত্যি : তা মোটেই নয়। যদিও মাসিকের আগে-পরে তলপেটে ব্যথা হয় হয়, কিন্তু তা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।

- মাসিকের সময় ব্যবহৃত কাপড় জনচক্ষুর আড়ালে রাখতে হয়, কারণ কেউ দেখলে পাপ হয়

  সত্যি : মাসিকের সময় প্রতিবার ব্যবহার করার পর কাপড় পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন এবং শুকনো করে রাখতে হয়। যদি এগুলো নোংরা জায়গায় রাখা হয়, তাহলে সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে।

- শুধু খারাপ ছেলেরা স্বপ্নদোষে ভোগে

  সত্যি : এটি ছেলেদের জন্য স্বাভাবিক।

- স্বপ্নদোষে ছেলেদের শক্তিনাশ হয়

  সত্যি : শক্তিক্ষয়ের সাথে স্বপ্নদোষের কোনো সম্পর্ক নেই।

- মাসিক চলাকালীন চলাচল কম করা উচিত

  সত্যি : মাসিক একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এবং সব মেয়ে/নারীরই মাসিক হয়। মাসিকের সময় সবই স্বাভাবিকভাবে করা যায়।

- মাসিকের সময় মাছ আর টক খাওয়া বারণ

  সত্যি : মাসিকের সময় সবই খাওয়া যায়। এ সময় বরং আরও বেশি করে পুষ্টিকর খাবার খেতে হয়।

- বীর্য রক্ত দিয়ে তৈরি

  সত্যি : বীর্য এক ধরনের তরল, এর সাথে রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই।

মাসিককালীন যত্ন ও প্রতিরোধ

- ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা- শরীর ও কাপড় প্রতিদিন ভালোভাবে ধোয়া
- স্যানিটারি ন্যাপকিন/কাপড়/তুলা ৪ ঘণ্টা পরপর বদলানো; যদি অনেক রক্ত পড়ে তাহলে ৪ ঘণ্টার কম সময়ে বদলানো
- যদি স্যানিটারি ন্যাপকিনের বদলে কাপড় ব্যবহার করা হয়, তাহলে নরম, পরিষ্কার কাপড় ব্যবহার করা আর তা সবসময় সাবান, পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত পানি দিয়ে পরিষ্কার করা
- অনেক পুষ্টিকর ও আয়রনসমৃদ্ধ খাবার খাওয়া
- যদি অনেক ব্যথা হয়, বেশি রক্ত পড়ে, রক্ত জমাট হয় এবং সাদা স্রাব নিঃসরণ হয় তবে কাছাকাছি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়া বা যারা স্বাস্থ্যসেবা দেয় তাদের পরামর্শ নেওয়া
- যথেষ্ট বিশ্রাম নেওয়া
- যদি মাসিকচক্র বাদ যায় তাহলে চিকিৎসকের কাছে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়া।

স্বপ্নদোষের পর যত্ন

- পরিষ্কার পানি দিয়ে যৌনাঙ্গ ধুয়ে ফেলা
- পরিষ্কার কাপড় ব্যবহার করা
- যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নোংরা এবং ভেজা কাপড় ধুয়ে ফেলা, তা নাহলে চুলকাতে পারে
- প্রতিদিন শরীর পরিষ্কার পানি দিয়ে সাফ করা।

এমআর (মাসিক নিয়মিতকরণ) ও গর্ভপাতের মধ্যে পার্থক্য

এমআর হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যা মাসিক না হলে বা বাদ গেলে ম্যানুয়াল ভ্যাকুয়াম অ্যাসপিরেশন (এমভিএ) ব্যবহার করে নিরাপদ অগর্ভধারণ অবস্থাকে ঠিক রাখা হয়। এটি ১৯৭৯ সাল থেকে বাংলাদেশ জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির একটি অংশ হিসেবে চলে আসছে। সরকারি বৈশিষ্ট্য মোতাবেক কোনো নারীর ৮-১০ সপ্তাহের মধ্যে মাসিক না হলে পরে এমআর সেবা দেয়া হয়, কোন্ সময়ে দেওয়া হবে তা নির্ভর করে সেবা দানকারীর ওপর। গর্ভপাত হচ্ছে ভ্রূণের জরায়ুর বাইরে বাঁচার অবস্থার আগেই গর্ভ থেকে সরিয়ে ফেলে গর্ভাবস্থাকে শেষ করা। যখন ইচ্ছে করে গর্ভপাত করানো হয়, তখন একে গর্ভপাত বলা হয়। যখন নিজে থেকেই হয়ে যায় তখন তাকে বলে মিসক্যারিজ বা গর্ভস্রাব। গর্ভপাত শব্দটি ব্যবহার করা হয় বেশিরভাগ সময়ে স্বেচ্ছায় গর্ভপাতের ক্ষেত্রে। বাংলাদেশে নারীর জীবন বাঁচানোর বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে করা ছাড়া স্বেচ্ছায় গর্ভপাত অবৈধ (১৮৬০-এর পেনাল কোডের অধীনে)।

এমআর সেবা অনুমোদিত এবং সহজলভ্য হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে শত শত নারী প্রতিবছর অনিরাপদ গর্ভপাত করে নিজেদের বিপদের মুখে ফেলে। এসব নারী হয় এমআর সেবা সম্পর্কে বা কোন্ প্রক্রিয়ায় যেতে হবে তা জানে না অথবা এমআর ও অনিরাপদ গর্ভপাতের মধ্যে পার্থক্য বোঝে না [ভ্যাসফ এবং অন্যান্য, ২০১২]।

যেসব কেন্দ্রে সেবা দেওয়া হয়

মেরী স্টোপস ক্লিনিক

ফ্যামিলি প্ল্যানিং এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (এফপিএবি)

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রিভেনশন অফ সেপটিক অ্যাবোর্শন (বাপসা)

রিপ্রোডাকটিভ হেলথ সার্ভিস ট্রেনিং অ্যান্ড এডুকেশন প্রোগ্রাম (আরএইচ-স্টেপ)

মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসমূহ

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

জেলা সদর হাসপাতাল

কিশোরী-কিশোরদের জন্য পুষ্টি

বয়ঃসন্ধিকালকে বলা হয় বেড়ে ওঠার সময়। এ সময় কিশোরী-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিকভাবে বেড়ে ওঠা ও তাদের উন্নয়নের জন্য পুষ্টিকর খাবার দরকার। মেয়েদের মাসিককালীন রক্তপাতের কারণে আয়রন স্বল্পতাজনিত অ্যানিমিয়া দেখা দিতে পারে।

কিশোরী-কিশোরদের প্রোটিন ও ভিটামিনসমৃদ্ধ খাবারের প্রয়োজন। অ্যানিমিয়া যেন না হয় তার জন্য মেয়েদের দরকার যথেষ্ট পরিমাণ আয়রনসমৃদ্ধ খাবার খাওয়া যেমন- তরমুজ, পাকা তেঁতুল, সবুজ শাকসবজী, কাঁচা কলা, গাজর, সজনে ডাটা, লেবু, টমেটো, আনারস, আম, কলিজা, ডিম, মাংস ও দুধ। এছাড়া তাদেরকে দিনে যথেষ্ট পরিমাণ বিশুদ্ধ পানি খেতে হবে (দিনে ১০/১২ গ্লাস)। সবাইকে জানতে হবে পুষ্টিকর খাবার কোন্গুলো এবং কোন্ খাবারে কত পুষ্টি থাকে।

মডিউল ৪

সহিংসতা থেকে সম্মানের পথে যাত্রা : ক্ষমতার সম্পর্ক এবং নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতাকে চ্যালেঞ্জ করা

অধিবেশন ৪.১ ক্ষমতা ও সহিংসতা : যোগসূত্রটি কী?

উদ্দেশ্য

- 'ক্ষমতা' ও 'সহিংসতা' কী তা জানা
- ক্ষমতা ও সহিংসতার মধ্যকার যোগসূত্র চিহ্নিত করা

পদ্ধতি

আলোচনা, খেলা

উপকরণ

পোস্টার কাগজ বা ভিপ কার্ড

সময়

৪৫ মিনিট

প্রক্রিয়া

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন যে আজকে আপনি আলোচনা শুরু করবেন এক ধরনের হাঁটার মধ্য দিয়ে। তাদের বলুন সবাই মিলে গোল হয়ে দাঁড়াতে। তাদের বলুন যে, আপনি যেসব ব্যক্তির কথা উল্লেখ করবেন অংশগ্রহণকারীদের উল্লিখিত ব্যক্তিদের মতো করে হাঁটতে হবে। অংশগ্রহণকারীরা সবাই মিলে তাই করবে একটি বৃত্তে ঘুরে ঘুরে যেমন- যখন আপনি বলবেন 'সৈন্য', তাদেরকে সৈন্যের মতো হাঁটতে হবে। যখন বলবেন- 'চাষি', তখন চাষির মতো, 'ধনী নারী', 'গরিব নারী', 'স্থানীয় মাস্তান' (গুণ্ডা/দুর্বৃত্ত) এবং আরও অনেকে হতে পারে।

[এই কাজটির জন্য খালি জায়গা ব্যবহার করবেন যেন অংশগ্রহণকারীরা চারদিকে ঘুরতে পারে। আপনি দু'ধরনের মানুষের কথাই উল্লেখ করবেন, যাদের ক্ষমতা আছে এবং যাদের নেই]

- এবার অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন
  - চরিত্রগুলো অনুকরণ করতে কেমন লাগল?
  - তাদের এভাবে হাঁটতে কী কী বিষয় বা চিন্তা প্রভাবিত করেছিল?

[অংশগ্রহণকারীরা বলতে পারে অনুকরণ করতে গিয়ে নিজেদেরকে তাদের মতো মনে হচ্ছিল; তারা আরও বলতে পারে যে, তারা তাদের অঙ্গভঙ্গি বদলে ফেলেছিল যে নামটা উচ্চারিত হয়েছিল তার মতো এবং সেই ব্যক্তির যোগ্যতা/ক্ষমতা/সামাজিক মর্যাদা/সমাজে আধিপত্য, অবস্থান ইত্যাদি বিষয় প্রভাব বিস্তার করেছিল হাঁটার সময়ে]

- তাদের বলুন যে, এই অনুশীলন থেকে বোঝা গেল আমাদের ক্ষমতা, কর্তৃত্ববাদী অবস্থান শুধু যে হাঁটাচলায় প্রভাব ফেলে তা নয়, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং কাজেও ফেলে। এভাবে একজনের ইচ্ছানুযায়ী আচরণ, কাজ এবং অন্যকে প্রভাবিত করতে পারাকেই বলে ক্ষমতা। ক্ষমতা হচ্ছে এমন জিনিস যা মানুষকে একটি কর্তৃত্ববাদী অবস্থানে নিয়ে যায় এবং সে ব্যক্তিকে তার তুলনায় যারা অধস্তন অবস্থানে আছে তাদের ওপর কর্তৃত্ব করতে দেয়। ক্ষমতা সবসময় শারীরিক নয়, সবসময় শরীরের শক্তি, শারীরিক গঠন বা পেশি থাকার সাথে সম্পর্কিত নয়, বরং পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত। আমরা এটা নিয়ে আরও কথা বলব আলোচনার শেষে

- অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন তারা সহিংসতা বলতে কী বোঝায় বা এ সম্পর্কে জানে কিনা। উত্তরের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, ব্যাখ্যা করুন যে 'সহিংসতা হচ্ছে কোনো ব্যক্তি বা দলকে ক্ষতি করার ভয় দেখানো এবং সেই উদ্দেশ্যে শারীরিক শক্তি ব্যবহার করা বা শক্তি ব্যবহার করার হুমকি দেয়া'

- এবার তিনটি পোস্টার কাগজ বা কার্ডঘরের তিনটি আলাদা জায়গায় রাখুন। প্রথম পোস্টার/কার্ডে লেখা থাকবে 'সহিংসতা', একটি হবে 'সহিংসতা নয়', আরেকটি হবে 'আমি জানি না'। তাদের বলুন 'সহিংসতা'র মানে আরও স্পষ্ট করতে অংশগ্রহণকারীরা একটি খেলা খেলবে। সহায়ক কয়েকটি পরিস্থিতি বলবেন, এগুলো শোনার পরে যদি কেউ মনে করে যে, এটি সহিংসতার ঘটনা, তাহলে সে যে কার্ডে লেখা আছে 'সহিংসতা', সেখানে দাঁড়াবে। যদি কেউ মনে করে তা সহিংসতা নয়, তবে সে যে কার্ডে আছে 'সহিংসতা নয়', সেখানে দাঁড়াবে। আর যদি কেউ ঠিক করতে না পারে, তাহলে সে 'আমি জানি না' যেখানে লেখা আছে সেখানে যাবে। তাদের বলুন সকলের মনে রাখতে হবে যে, সবারই নিজের যুক্তি অনুযায়ী চিন্তা করার অধিকার আছে। তাই কাউকে জোর করে বা বুঝিয়ে নিজের জায়গায় আনা যাবে না

- প্রতিটি পরিস্থিতি বর্ণনা করার পরে অংশগ্রহণকারীদের সময় দিন নিজের জায়গা নিতে। তারপর সে স্থান নেবার কারণ জিজ্ঞেস করুন। যে কোনো বিষয়ে দলগুলো বিতর্ক করতে পারে নিজেদের মধ্যে, তারপর আলোচনা শেষে, কেউ যদি স্থান পরিবর্তন করতে চায়, সে তা করতে পারে।

পরিস্থিতি : ১

১৩ বছরের আসিফ একটা হিউম্যান হলারে হেল্পার হিসেবে কাজ করে। সে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে এবং এমন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করছে দারিদ্র্যের কারণে। একদিন একজন যাত্রীর অনেক তাড়া ছিল আর আসিফের স্বাভাবিকের চাইতে বেশি সময় লাগছিল ভাংতি দিতে। যাত্রী যখন চিৎকার করে উঠল জলদি করার জন্য, তখন সে জবাব দিল সে তো আর সময় নষ্ট করছে না, সে খুচরা খুঁজছে। যাত্রীটি হঠাৎ করে ছেলেটিকে একটি চড় দিয়ে জিজ্ঞেস করল-তার মুখে মুখে কথা বলার এত সাহস কী করে হলো?

পরিস্থিতি : ২

রাণী একটি বাড়িতে গৃহপরিচারিকার কাজ করে। গৃহকর্ত্রী তাকে অনেক কাজ দেয় এবং সে ঠিকমতো পরিষ্কার করে না এই বলে সবসময় বকাঝকা করে। হঠাৎ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে রাণী অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং কাজে যেতে পারেনি, সে গৃহকর্ত্রীকে না আসার কারণ জানিয়ে ছুটি চায়। এক সপ্তাহ পরে সে ভালো বোধ করে। সে কাজে ফেরত গেলে গৃহকর্ত্রী তাকে জানায় যে সে রাণীর অনুপস্থিতিতে আরেকজনকে রেখেছে। তাই রাণীকে এখন দরকার নেই; এমনকি রাণীকে প্রথম সপ্তাহের কাজের বেতনও দেওয়া হয়নি।

পরিস্থিতি : ৩

একটি মেয়ে এক মার্কেটের কাছাকাছি তার বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছিল। একদল ছেলে কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল। তারা মেয়েটিকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছিল এবং তার দিকে তাকিয়ে ছিল, হাসছিল, মন্তব্য করছিল তার পোশাক নিয়ে। একসময় জিজ্ঞেস করে যে সে একা দাঁড়িয়ে আছে কেন, তাদের সাথে যোগ দিক।

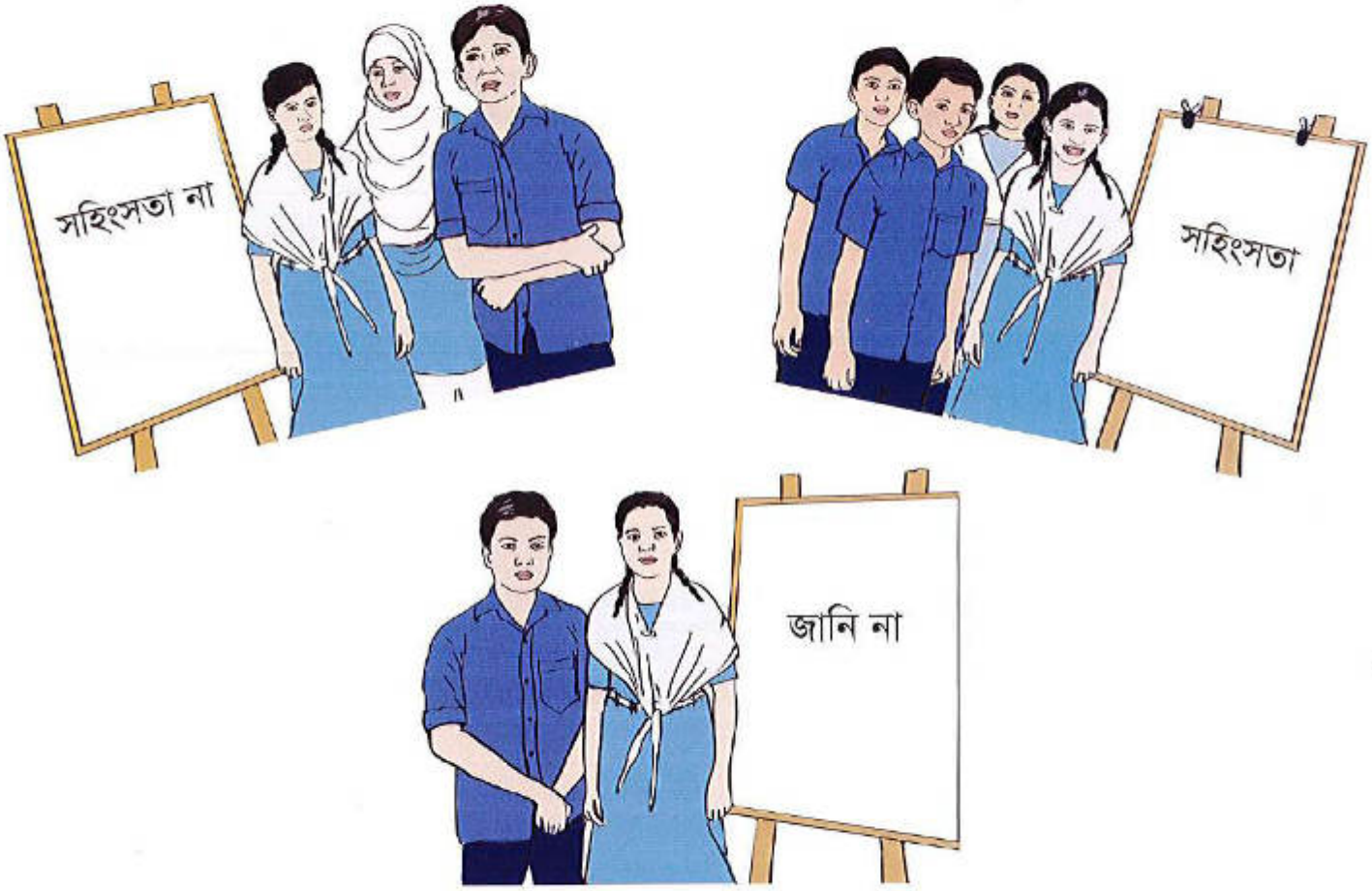

পরিস্থিতি : ৪

রিনা একটি অফিসে চাকরি করে যেখানে তার উচ্চপদস্থ অবস্থানে যিনি আছেন তিনি পুরুষ। সেই ব্যক্তি সবসময় তার টেবিলে তাকে ডেকে ব্যক্তিগত বিষয়ে আলাপ করে আসল কাজ, চ্যালেঞ্জ বা তার দরকারি সহায়তার কথা বলে না। অনেক সময় সে তাকে ছুটির কিছুক্ষণ আগে কাজ দেয় এবং বলে কাজটা জরুরি এবং সেদিনই লাগবে। অনেকবার রিনা তাকে অনুরোধ করেছে শেষমুহূর্তে কাজ না দিতে, কারণ তাতে সে সময়মতো বাসায় ফিরতে পারে না এবং অফিসে একা তার সেই ব্যক্তির সাথে থাকতে হয়। কিন্তু সেই উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তার এই অনুরোধের তোয়াক্কা করেনি।

পরিস্থিতি : ৫

মনির রাস্তার পাশে একটি ছোট চায়ের দোকান চালায়। একদিন কতগুলো স্থানীয় মাস্তান, যারা আবার রাজনৈতিক দলের কর্মী দোকানে এসে চা খায় এবং ছোট্ট দোকানটিতে বসে আড্ডা দিতে থাকে। দোকানে অন্য দাঁড়ানো আর চা চাইবার কোনো উপায় ছিল না। মনির তাদের অনুরোধ করল তাদের কাপ শেষ হয়ে গেলে অন্যদের জন্য জায়গা করে দিতে। দলের নেতা চিৎকার করে বলল "তুই বলে দিবি আমরা কী করব?" একপর্যায়ে তারা মনিরকে দোকান থেকে টেনে বের করে এনে মারা শুরু করে।

পরিস্থিতি : ৬

পবন ও বর্ষা বেশ সচ্ছল দম্পতি, দু'জনেই শিক্ষিত, দেখতে ভালো, চটপটে কাজকর্মে। একদিন পবন বর্ষাকে না বলে অনেক দেরিতে বাসায় ফেরে। সে জিজ্ঞেস করতে থাকে পবন কোথায় ছিল, কারণ সে চিন্তিত হয়ে পড়েছিল যে তার বুঝি কিছু হয়েছে, সে বর্ষার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে- যে সে যেন তার ব্যাপারে নাক না গলায়। ঝগড়া অনেকক্ষণ ধরে চলল এবং একপর্যায়ে পবন বর্ষার গালে একটা থাপ্পড় দিয়ে চিৎকার করে বাসা থেকে চলে যেতে বলে।

পরিস্থিতি : ৭

তরুণী মিনা তার শ্বশুর বাড়িতে থাকে। তার স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ি তার সব কাজ আর ব্যবহারেই সীমাবদ্ধতা পায় এবং তার সাথে চিৎকার করে কোনো কারণ ছাড়াই। তার শ্বশুর-শাশুড়ির কাছ থেকে সবসময় তাকে খোঁটা শুনতে হয় যে তার পরিবার বিয়ের সময় যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে অনুযায়ী যৌতুকের পুরো টাকাটা শোধ করেনি।

দলের জন্য প্রশ্ন :

- তোমাদের কি মনে হয় এটা সহিংসতার ঘটনা? কেমন ধরনের সহিংসতা?
- কে কার প্রতি সহিংসতা করেছে এবং কেন করেছে?

আলোচনার সূত্র

পরিস্থিতি : ১

এটি একটি সহিংসতার ঘটনা। ছেলেটি শিশুশ্রমে নিয়োজিত এবং এটি শিশু অধিকারের পরিপন্থী। তার কোনো শিক্ষা, বিনোদন, নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা নেই জীবনে- যা প্রতিটি শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য দরকার। তার প্রতি যাত্রীটির আচরণ ছিল সহিংস। ছেলেটি মৌখিক ও শারীরিক সহিংসতার শিকার। আক্রান্ত ছেলেটি অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং দরিদ্র বলে সে একটি তুলনামূলক অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে রয়েছে। সে যাত্রীর ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে লড়তে অক্ষম, যাত্রী তার ক্ষমতা ছেলেটির ওপর ব্যবহার করেছে।

পরিস্থিতি : ২

ঘটনাটি মৌখিক ও অর্থনৈতিক সহিংসতা। গৃহকর্ত্রীর গৃহকর্ম করে তাকে মানসিকভাবে আঘাত করেছে, সে কোনো উত্তর দিতে পারেনি, কারণ তার কাজের দরকার। গৃহকর্ত্রী অসুস্থতাকেও বিবেচনা করেনি, তার আয় করা বেতন দিতে অস্বীকার করেছে। সে হঠাৎ করে বেকার হয়ে পড়ে এবং তাকে অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত করা হয়। যদিও তারা দু'জনই নারী, এখানে গৃহকর্ত্রীর ক্ষমতা গৃহকর্মীর চাইতে অনেক বেশি আর্থ-সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে ।

পরিস্থিতি : ৩

ছেলেগুলো যে আচরণ করছিল সেটা যৌন হয়রানি এবং এক ধরনের যৌন সহিংসতা। যদিও তারা মেয়েটিকে শারীরিকভাবে ক্ষতি করেনি, তাদের মন্তব্যগুলো তাকে বিব্রত ও অপমানিত করেছে। সে একা ছিল এবং হয়তো তার আরও খারাপ কিছু হবে বলে ভয় পেয়েছিল, যা তার চলাফেরা ও নিরাপত্তার ওপর প্রভাব ফেলেছে। ছেলেগুলো হয়তো ভেবেছে শুধু মজা করার জন্য তারা এমন কাজ করেছে আর এতে কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু এ ধরনের কাজ মেয়েটিকে কষ্ট দিয়েছে।

পরিস্থিতি : ৪

এটি একটি যৌন হয়রানিমূলক ঘটনা। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তার ক্ষমতার দাপট দেখাচ্ছে যাকে তত্ত্বাবধান করে সেই নারীকে একটি দুরভিসন্ধি নিয়ে। নিজের উচ্চপদস্থতার সুযোগে অসদ্ব্যবহার করছে। যদিও সে কোনোরকম শারীরিক স্পর্শ করেনি, তার আচরণ কর্মপরিবেশকে নারীটির জন্য অসুবিধাজনক এবং নিরাপত্তাহীন করে তুলছে।

পরিস্থিতি : ৫

এটি একটি শারীরিক সহিংসতা। দলটির কর্মীরা বেচারা চা বিক্রেতাকে প্রহার করেছে কারণ তাদের পেছনে রাজনৈতিক নেতাদের সহায়তা আছে এবং তারা মনে করে যে, তারা যা করে সেটাই ঠিক। কারো তাদের কাজ নিয়ে কোনো প্রশ্ন করার সাহস থাকবে না। তারা রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে অন্যের ক্ষতি করতে।

পরিস্থিতি : ৬

এটি একটি শারীরিক সহিংসতার ঘটনা। আমাদের সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীর ক্ষমতা কম। পুরুষ মনে করে সমাজে তাদের স্ত্রীর অবস্থান যা-ই হোক না কেন তাদের সাথে যা খুশি করা তাদের অধিকার। স্বামীর সব অধিকার আছে স্ত্রীর জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার, কিন্তু স্ত্রীকে তার জীবনে হস্তক্ষেপ করতে দেয়া যায় না। এমন শারীরিক সহিংসতা নারীকে মানসিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত করে।

পরিস্থিতি : ৭

এটি একটি মৌখিক ও মানসিক সহিংসতা। আমাদের সমাজের অনেক নারীকেই শ্বশুর বাড়িতে খারাপ কথা শুনতে হয় যদি বিয়ের সময় তাদের ইচ্ছাপূরণ না করা হয় কনেপক্ষ থেকে। এই দেওয়া-নেওয়ার চর্চার কারণে বরপক্ষ কনে ও তার পরিবারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে সবসময়। তারা মনে করে সেই পরিবারে মেয়ে বা নারীটিকে গ্রহণ করার বিনিময়ে জিনিসপত্র বা টাকা পাওয়া তাদের বৈধ অধিকার। এর ফলে মেয়েদের একটা অধস্তন অবস্থায় থাকতে হয় পরিবারে, সমস্ত অপমান সহ্য করতে হয় এবং নিজের পরিবার থেকে দূরে থেকে দুঃখভরা জীবনের বোঝা টানতে হয়।

- একদম শেষে আলোচনার ইতি টানুন এই বলে যে, প্রতিটি পরিস্থিতি, ব্যক্তি বা দলের আচরণ কিংবা কাজ অন্যকে আঘাত দেয় বা ক্ষতি করে। তাই এগুলো সহিংসতার ঘটনা। যদিও সব ঘটনা একই রকম সহিংসতার নয়। এগুলো শারীরিক, মৌখিক, মানসিক নির্যাতন এবং যৌন হয়রানির মাধ্যমে সংঘটিত হতে পারে। যারা সহিংসতা ঘটায় তাদের বলা হয় আক্রমণকারী, সহিংসতা বা নির্যাতনকারী আর যার ওপরে ঘটায় তাকে বলে আক্রান্ত বা ভিকটিম। সমস্ত ক্ষেত্রেই, যারা ক্ষমতাবান তারা যারা ক্ষমতাবান নয় এমন তাদের ওপর সহিংসতা ঘটায়। ক্ষমতার ব্যবহার শুধু অবস্থানের ওপর নির্ভর করে না, পরিস্থিতির ওপরও করে। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ক্ষমতাবান হয়। যেমন- একজন মানুষ আক্রমণকারী হতে পারে যখন সে তার স্ত্রীকে প্রহার করে, কিন্তু সে অফিসে তার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার কাছে আবার অন্য ধরনের নির্যাতন বা সহিংসতার শিকার হয়। বাড়িতে সে স্ত্রীর চাইতে ক্ষমতাবান, কিন্তু অফিসে সে তার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার চাইতে কম ক্ষমতাবান। মানুষ সহিংস আচরণ করে তার নিজের স্বার্থে এবং

অন্যের ক্ষতি করে নিজের লাভের জন্য। অন্যদিকে মানুষ যখন মনে করে যে তারা ক্রমাগত আক্রান্ত হচ্ছে, আগে হোক আর পরে, তারা তাদের চেয়েও কম ক্ষমতাবান মানুষকে আক্রান্ত করে। প্রকৃতপক্ষে, ক্ষমতার অপব্যবহার হয় সহিংসতা ঘটানোর মধ্য দিয়ে। আবার ক্ষমতা ব্যবহার করা যায় সহিংসতা প্রতিরোধ করতে। সমাজের একজন সদস্য হিসেবে তোমরা সমাজে সমস্ত রকম সহিংসতা বন্ধ করতে প্রভাব বিস্তার করতে পার।

সহিংসতার সংজ্ঞা

ইচ্ছাকৃতভাবে শারীরিক শক্তি বা ক্ষমতা ব্যবহার করা, হুমকি দেওয়া বা সংঘটিত করা, কোনো ব্যক্তি, দল বা কমিউনিটির বিরুদ্ধে, যার ফল আহত হওয়া, মৃত্যু, মানসিক ক্ষতি, অনুন্নয়ন বা বঞ্চনার মতো খারাপ হতে পারে।

ক্রাগ ও অন্যান্য, ২০০২

অধিবেশন ৪.২.১ নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা (ভিএডব্লিউ ও জি)

উদ্দেশ্য

- জেন্ডারভিত্তিক বা নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা এবং এর নানান রূপ বা ধরন সম্পর্কে জানা

পদ্ধতি

আলোচনা, দলীয় কাজ ও খেলা

উপকরণ

ফ্লিপ/পোস্টার কাগজ এবং রঙিন কলম/পেন্সিল, সহিংসতার নানান ধরনের ওপর ফ্লিপ শিট

সময়

৪৫ মিনিট

প্রক্রিয়া

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন যে, গত সেশনে আমরা জানতে পেরেছি ক্ষমতা ও সহিংসতার মধ্যেকার যোগসূত্রটি সম্পর্কে। কয়েকটি পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বোঝা গেছে যে যাদের ক্ষমতা নেই তাদের ওপর যাদের ক্ষমতা আছে তারা সহিংসতা করে। যখন এটি কোনো জেন্ডারের ভিত্তিতে করা হয়, তখন তাকে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা বলে। অনেক সময় আমাদের সমাজে নারী ও মেয়েরা সহিংসতার শিকার হয়, কারণ নারী ও পুরুষের মধ্যেকার জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য এবং অসম ক্ষমতার সম্পর্ক বিরাজমান। আমরা জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতাকে নারীর প্রতি সহিংসতা বলতে পারি। আজ আমরা আলোচনা করব নারী ও মেয়েরা কোথায়, কেন এবং কীভাবে প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার মুখোমুখি হচ্ছে

- অংশগ্রহণকারীদের একটি খেলায় অংশ নিতে বলুন এবং সাবধানে নির্দেশনা পালন করতে বলুন। ৪/৫ জন করে শিক্ষার্থীর দল তৈরি করুন। প্রতিটি দল নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতার একটি করে ছবি আঁকবে, তারা ৫ মিনিট দলের মধ্যে আলোচনা করবে; সহিংসতাটি কোথায়, কেন এবং কী ধরনের, কে করছে এবং এ পরিস্থিতিতে জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য কী ভূমিকা পালন করছে সেটা বিবেচনা করে একটি সহিংস পরিস্থিতি তুলে ধরবে। প্রতিটি দল সেই পরিস্থিতিকে প্রতিনিধিত্ব করে এমন একটি ছবি আঁকবে। ব্যাখ্যা করার জন্য কোনো কিছু লেখা থাকবে না। যখন একটা দল তাদের ছবি উপস্থাপন করবে, অন্য দলগুলো ছবিটিকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবে এবং কোথায়, কেন, কে এবং কীভাবে সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। যদি উত্তরগুলো ছবি আঁকা দলটি যেমনভাবে পরিস্থিতিটিকে ভেবেছিল তার সাথে মিলে যায় তাহলে সেই দল নম্বর পাবে। একটা স্কোর বোর্ড থাকবে এবং সঠিক উত্তরের ওপর পাঁচ নম্বর দেয়া হবে। মনে করিয়ে দেবেন এটি একটি খেলা এবং নিখুঁত ছবি বলে কিছু নেই। আমরা সবাই ছবি আঁকতে পারি কারণ সবাই আমাদের চারদিকের সহিংসতার ঘটনা জানি। তাই তোমরা শুধু কাগজে আঁকার মাধ্যমে সেই ঘটনাটা তুলে ধরবে। পোস্টার কাগজ এবং ছবি আঁকার পেন্সিল দিন অংশগ্রহণকারীদের। কাজ করতে ১০ মিনিট সময় দিন।

[ইত্যবসরে একটা ফ্লিপ কাগজে রেজাল্ট বসানোর জন্য ছক তৈরি করুন সহায়কের জন্য তথ্যতে উল্লিখিত পোস্টার-৮ মোতাবেক]

- ১০ মিনিট পরে দলগুলোকে বলুন তাদের ছবি জমা দিতে। এগুলোকে ফ্লিপ স্ট্যান্ডে ঝুলিয়ে দিন বা বোর্ডে লাগিয়ে দিন। তারপর প্রথম যে ছবিটি এসেছে সেটা দিয়ে শুরু করুন। অংশগ্রহণকারীরা দলগত হয়ে বসবে। যে দল আগে হাত তুলবে তারা উত্তর দেবে এবং তারা যদি সঠিক উত্তর দেয় তবে তারা নম্বর পাবে আর না বলতে পারলে ছবি আঁকিয়ে দল ব্যাখ্যা করবে। একটি দলকে একবারই সুযোগ দেয়া হবে প্রতিটি ছবির ক্ষেত্রে। নম্বরের ওপর ভিত্তি করে খেলায় বিজয়ী ঘোষণা করা হবে এবং অন্য দলগুলোকে বলুন বিজয়ী দলের জন্য হাততালি দিতে

- কাজ শেষ হয়ে যাবার পরে অংশগ্রহণকারীদের বলুন যে ভিএডব্লিউ ও জি যে কোনো স্থানেই হতে পারে, ঘরে বা বাইরে। নারী ও মেয়েদের ওপর সহিংসতা যে কেউ করতে পারে, শুধু অপরিচিত মানুষই নয়, কাছের বা দূরের আত্মীয়, ঘনিষ্ঠ সঙ্গী, এমনকি তার সাথে রক্তের সম্পর্ক আছে এমন কেউ হতে পারে। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতার হার অনেক বেশি। তবে নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা অন্য দেশেও হয়, উন্নত হোক বা উন্নয়নশীল দেশ। তাদের নারীর প্রতি সহিংসতার নানান তথ্য-উপাত্ত বলুন এবং সহিংসতার বিভিন্ন ধরন বা রূপের ফ্লিপ শিটটি দেখান

- আলোচনা শেষ করুন এই বলে যে কোনো ধরনের সহিংসতা নারী ও মেয়েদের মনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে থাকে। পরিবার, সমাজ এবং জাতিও সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভিএডব্লিউ ও জি পরিবারের মধ্যে ঘটলেও এর প্রভাব শুধু ব্যক্তিগত পরিসরেই সীমাবদ্ধ থাকে না, এজন্যই বলে যে ভিএডব্লিউ ও জি বা জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা কোনো ব্যক্তিগত বিষয় নয় বরং এটি সর্বসাধারণের বিষয়। জেন্ডার বৈষম্য আর নারীর অধস্তন অবস্থা জিইয়ে রাখা সমাজের মূলে নিহিত রীতি যখন জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার মূল কারণ হয়, তখন আমাদের সেসব রীতি, বৈষম্য বা অসম ক্ষমতার সম্পর্ককে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষেত্রগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে। আমাদের সবাইকেই বুঝতে হবে কোনো কারণে আক্রমণকারীরা নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা ঘটায় আর তাদের জীবনকে ভঙ্গুর ও অধস্তন অবস্থাকে আরও তীব্র করে তোলে।

সহায়কের জন্য তথ্য

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা/নারীর প্রতি সহিংসতার সংজ্ঞা

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৯৩ সালে গৃহীত নারীর প্রতি সহিংসতা বিলোপ সাধন ঘোষণাপত্র (ডিইভিএডব্লিউ) থেকে নারীর প্রতি সহিংসতার গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞাটি এসেছে।

"নারীর প্রতি সহিংসতা কথাটির মানে হচ্ছে জেন্ডারভিত্তিক এমন সহিংসতা যার ফলে বা যার ফল হতে পারে নারীর শারীরিক, যৌন বা মানসিক ক্ষতি কিংবা নারীর যন্ত্রণা পাওয়া, যার ভেতর আছে এমন কাজের হুমকি, জোর করা বা ধারাবাহিকভাবে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা, তা ব্যক্তিগত বা জনপরিসরে হোক।"

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা একটি ব্যাপক শব্দ যা কোনো ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে করা, যা জেন্ডার ভূমিকার ওপর ভিত্তি করে অসম ক্ষমতার ফলে সংঘটিত হয়। সারা পৃথিবীতে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা নারী ও মেয়েদের ওপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এজন্য 'জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা'কে 'নারীর প্রতি সহিংসতা (ভিএডব্লিউ)'ও বলা যায়। এটি সব সমাজে সব শ্রেণিতে ঘটে।

জাতিসংঘের নারীর প্রতি সহিংসতা বিলোপ করার ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, 'নারীর প্রতি সহিংসতা হচ্ছে ঐতিহাসিকভাবে নারী ও পুরুষের মধ্যে অসম ক্ষমতার প্রদর্শন' এবং 'নারীর প্রতি সহিংসতা হচ্ছে একটি সামাজিক হাতিয়ার যা দিয়ে নারীকে জোরপূর্বক পুরুষের তুলনায় একটি অধস্তন অবস্থানে থাকতে বাধ্য করা হয়' (ইউনাইটেড নেশনস জেনারেল এসেম্বলী ১৯৯৩)।

বেশিরভাগ সংস্কৃতি, ঐতিহ্যগত বিশ্বাস, রীতি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদিতে এটি সিদ্ধ করা হয়েছে, আর তাই নারীর প্রতি সহিংসতা বজায় আছে। বাংলাদেশের সমাজে সামাজিক রীতি ও ক্ষতিকর চর্চার কারণে নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা (বাল্যবিবাহ, যৌতুক, স্বামী দ্বারা স্ত্রীকে প্রহার, একই ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী রাখা, সর্বসাধারণের জায়গায় মেয়েদের যৌন হয়রানি, জোরপূর্বক গর্ভধারণ বা গর্ভপাত, স্ত্রী পরিত্যক্ত, পুড়িয়ে দেওয়া, অ্যাসিড নিক্ষেপ) ঘটে।

বেশিরভাগ জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রে সহিংসতাকারী বা আক্রমণকারী হচ্ছে পুরুষ। তবে কোনো সমাজই পুরুষ কর্তৃক নারী নির্যাতন মুক্ত নয়, নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতিতে নারীর প্রতি পুরুষের সহিংসতার মাত্রা এবং তীব্রতায় হেরফের হয় মাত্র। পুরুষ সহিংসতা ঘটায় নারীর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও আধিপত্য বিস্তার করতে, সমাজে তাদেরকে অধস্তন অবস্থায় রাখতে। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে তারা শেখে যে 'পুরুষ' হিসেবে তাদের আধিপত্য, ক্ষমতা ও আগ্রাসন দেখানো এবং প্রয়োগ করার অধিকার আছে। কোনো কোনো ধরনের সহিংসতা নারীদের দ্বারা নারীর প্রতি সংঘটিত হয়। পুরুষের আধিপত্যে থাকা সামজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নারী অন্য নারীর প্রতি সহিংসতায় রত হয় নিজেদের অস্তিত্ব এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। যেমন- শাশুড়িরা পুত্রবধূদের ওপরে সহিংস আচরণ করে। জাতিসত্তা এবং শ্রেণিও নারীর প্রতি সহিংসতার কারণ হিসেবে কাজ করে নারীর অবস্থান ভঙ্গুর করে। উচ্চবিত্ত শ্রেণির নারীরা, যারা স্বামীর ওপর নির্ভরশীল, তারা গৃহপরিচারিকাদের ওপর সহিংসতা ঘটায় কর্ত্রী হিসেবে নিজের অস্থার জোরদার করতে। রাষ্ট্র বা সরকারও নারীর প্রতি সহিংসতা ঘটায় কোনো সশস্ত্র বিরোধের সময় বা জাতিসত্তা নির্মূলের নামে। এমন সহিংসতায় নারী দুভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, প্রথমত সরাসরি সহিংসতার শিকার হয়ে দ্বিতীয়ত যৌন সহিংসতার শিকার হিসেবে তাদের পরিবার এবং সমাজের বিশেষ করে পুরুষের প্রতিক্রিয়ায়।

নারীর প্রতি সহিংসতার বা নির্যাতনের নানান ধরন

শারীরিক সহিংসতা

শারীরিক নিগ্রহ : স্বামী, ঘনিষ্ঠ সঙ্গী, পরিবারের সদস্য, বন্ধু, পরিচিত, অপরিচিত, ক্ষমতা আছে এমন কারো দ্বারা মারধর, ঘুষি মারা, লাথি মারা, কামড়ানো, পোড়ানো (অ্যাসিড নিক্ষেপসহ), বিকৃতকরণ বা হত্যা- অস্ত্র দিয়ে বা অস্ত্র ছাড়া, অনেক সময় সাথে অন্য ধরনের জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা করা।

মানসিক নির্যাতন : মৌখিক বা অমৌখিক হতে পারে

গালাগাল/অপমান : অপমান, অবনমন, কিছু চাওয়া এবং আক্রান্তকে কোনো অপমানজনক কাজ করতে বাধ্য করা, জনসমক্ষে বা ব্যক্তিগতভাবে, পরিবারে বেঁচে থাকার জন্য মৌলিক ব্যয়ভার প্রত্যাখ্যান করা। এ ক্ষেত্রে নির্যাতনকারী ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ আছে এমন যে কেউই হতে পারে; অনেক সময় স্বামী, ঘনিষ্ঠ সঙ্গী বা পরিবারের কর্তৃত্বে রয়েছে এমন সদস্য।

আটক রাখা : কোনো নারীকে তার বন্ধু বা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা, চলাফেরায় বাধা দেওয়া, স্বাধীনতায় বাধা দেওয়া বা বঞ্চিত করা। যার ক্ষমতা ও শক্তি আছে, অনেক সময় সঙ্গী বা পরিবারের লোক যারা ভয় দেখাবার মতো অবস্থানে আছে সে এমন ধরনের নির্যাতন করে।

যৌন সহিংসতা :

ধর্ষণ : এটি হচ্ছে যখন কারো সম্মতি ব্যতীত বলপূর্বক, ভয় দেখিয়ে, অর্থ দিয়ে বা অন্য উপায়ে যৌনমিলনে বাধ্য করা।

বৈবাহিক ধর্ষণ : বৈবাহিক সঙ্গীকে তার সম্মতি ছাড়া বলপূর্বক, জোরপূর্বক, ভয় দেখিয়ে, অর্থ দিয়ে বা অন্য কোনো উপায়ে যৌনমিলনে বাধ্য করা।

যৌন নিগ্রহ : অনধিকারভাবে শারীরিক যৌনতামূলক কাজের হুমকি দেওয়া বা করা, যেমন- জোর করে বা কোনো অসম কিংবা অবদমনমূলক পরিস্থিতিতে খারাপভাবে স্পর্শ করা।

যৌন হয়রানি : কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত বা অনিচ্ছাকৃত যৌন মনোযোগ আকর্ষণ করা, কোনো কিছুর বিনিময়ে যৌনতা চাওয়া, যৌনতামূলক ভয় দেখানো বা অন্যান্য যৌনতামূলক মৌখিক কিংবা শারীরিক কিছু করা, পর্নোগ্রাফি বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে অশ্লীল কিছু দেখানো। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি কাজে সমস্যা সৃষ্টি করে, কাজের পরিবেশে এমন কোনো একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যা ভীতিকর, বিরুদ্ধ এবং অপ্রীতিকর।

যৌন শোষণ বা নিজস্ব আত্মতৃপ্তি অর্জনের জন্য যৌন দাসত্ব : ক্ষমতার অপব্যবহার করে দুর্বলের ওপর যৌন হয়রানি বা বিশ্বাসভঙ্গ করে যৌন শোষণ। অন্যকোনো ব্যক্তির দ্বারা অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক লাভের জন্য যৌন শোষণও এর মধ্যে পড়ে; যৌন শোষণ হলো মানুষ পাচারের অন্যতম কারণ (যৌন উদ্দেশ্যে জোর করে বস্ত্রহীন করা, জোরপূর্বক বিয়ে, জোর করে সন্তানধারণ, পর্নোগ্রাফি বা পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করা, যৌনতার বিনিময়ে খাবার, সেবা, লাভ দিতে সাহায্য করা এবং যৌন দাসত্ব)।

জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তি : জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তি করানো হয় কোনো জিনিসপত্র, কোনো সেবা এবং কোনো একটা সহায়তা দেবার বিনিময়ে। যে সমস্ত দুর্বল বা প্রান্তিক মেয়ে ও নারীরা ন্যূনতম মানবাধিকার পেতে অপারগ তারাই সাধারণত লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়।

অত্যাচার বা যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে যৌন সহিংসতা : মানবতার বিরুদ্ধে যৌনতামূলক অপরাধ যেমন- ধর্ষণ, যৌন দাসত্ব, জোরপূর্বক গর্ভপাত ও বন্ধ্যাত্ব বা সন্তান জন্মদানে অন্য উপায় করা, জোরপূর্বক গর্ভধারণ, জোরপূর্বক প্রসব করানো, জোরপূর্বক সন্তানপালন ইত্যাদি। যৌন সহিংসতা হচ্ছে এক ধরনের অত্যাচার যাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে- যে কোনো যৌনতামূলক কাজ বা হুমকি হিসেবে, আক্রান্ত ব্যক্তি অথবা কোনো তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে কোনো তথ্য, স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য মানসিক বা শারীরিক যন্ত্রণা অথবা দুর্ভোগ দেওয়া অথবা তাকে ভয় দেখানো যে কোনো জাতীয়, জাতিগত বা ধর্মীয় দলের অংশ হিসেবে ধ্বংস করে দেয়া হবে।

আর্থ-সামাজিক সহিংসতা : এটি হয় যখন আক্রমণকারীর হাতে আক্রান্তের অর্থ এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক উৎসগুলো থাকে। সুযোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য করা বা প্রত্যাখ্যান, সেবায় ঢুকতে না দেওয়া, শিক্ষাগ্রহণে বাধা দেওয়া, স্বাস্থ্যসেবা বা বৈতনিক চাকরি করতে না দেওয়া, সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা।

আইনগত চর্চার অসহযোগিতা : আইনগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার না দেওয়া, বিশেষ করে নারীদের।

ক্ষতিকর প্রথাগত চর্চা :

নারীর যৌনাঙ্গ কর্তন : অচিকিৎসাজনিত কারণে যৌনাঙ্গ ছেদ বা কর্তন করা, সাধারণত অল্প বয়সে এটি হয়, আংশিক থেকে সম্পূর্ণভাবে এটি ছেদ করা হয়, চিকিৎসা ছাড়া অন্য কারণ বা সাংস্কৃতিক কারণে, নারী/মেয়েদের প্রসবের পরে বা কোনো নারী বা মেয়েরা যদি যৌন নির্যাতনের শিকার হয় সারা জীবনের জন্য তা সেলাই করে দেওয়া।

বাল্যবিবাহ : আইনগত বয়সের আগে বিয়ে দেওয়া।

জোরপূর্বক বিয়ে : ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে, যদি কোনো মেয়ে প্রত্যাখ্যান করে তবে এর ফল হয় সহিংস।

লজ্জা, সম্মান রক্ষায় হত্যা এবং বিকৃতকরণ : নারী বা মেয়েদের হত্যা এবং বিকৃতকরণ করা হয় শাস্তি হিসেবে যখন মেয়ে বা নারীর কাজকর্ম তার জেন্ডার অনুযায়ী যথাযথ হিসাবে বিবেচিত হয় না বা তার পরিবারের বা কমিউনিটির জন্য লজ্জাজনক হয়, অথবা পরিবারের সম্মান রাখার জন্য এ ধরনের সহিংসতা ঘটানো হয়।

নারী বা মেয়ের প্রতি সহিংসতার কিছু ফল :

স্বাস্থ্য-নির্যাতিতের ব্যক্তিগত পর্যায়ে ফল :

- আঘাত
- পঙ্গুত্ব বা মৃত্যু
- যৌনবাহিত অসুখ (সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ-এসটিডি) এবং এইডস (অ্যাকোয়ার্ড ইমিউন ডেফিশিয়েন্সি সিনড্রোম)
- মাসিকের সমস্যাসহ প্রজনন প্রক্রিয়া বিঘ্নিত
- সন্তানধারণে সমস্যা
- সংক্রমণ
- গর্ভপাত
- অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ
- অনিরাপদ গর্ভপাত
- বিষণ্নতা, সেখান থেকে ক্রমাগত শারীরিক অসুস্থতা
- যৌন আকাঙ্ক্ষার অভাব এবং যন্ত্রণাদায়ক যৌনমিলন
- সমস্যাজনক গর্ভধারণ এবং প্রসব, ক্রমাগত ব্যথা ও সংক্রমণ
- বন্ধ্যাত্ব

সমাজে বৃহত্তর প্রভাব

- চিকিৎসা ব্যবস্থায় চাপ
- আক্রান্তের জন্য উন্নত চিকিৎসা ব্যয়
- মানবসম্পদে প্রভাব, কেননা আক্রান্ত নারী দেশের উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করতে পারে না
- যেসব শিশু দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক, তারা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের চাইতে সহিংসতাকেই বেছে নেয়।

মানসিক-নির্যাতিতার ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রভাব :

- রাগ, ভয়, ক্রোধ এবং নিজের ওপর ঘৃণা জন্মানো ইত্যাদি আবেগীয় ক্ষতি
- লজ্জা, নিরাপত্তাহীনতা, দৈনিক কাজ করার ক্ষমতা লোপ পাওয়া
- বিষণ্ণতা ও বিচ্ছিন্ন বোধ করা
- খাওয়া ও ঘুমের ব্যাঘাত হওয়া
- মানসিক অসুস্থতা এবং নিরাশাবাদী চিন্তা ও আত্মহত্যা, আক্রান্ত ব্যক্তিকে নিয়ে গল্প, বিচার করা, দোষারোপ, সমাজচ্যুত করা।

[সূত্র : মিনিস্ট্রি অফ জেন্ডার এন্ড ফ্যামিলি প্রমোশন, রিপাবলিক অফ রুয়ান্ডা ২০১১]

নারীর প্রতি সহিংসতা সম্পর্কিত কিছু তথ্য উপাত্ত

- ডব্লিউএইচও-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী সারা বিশ্বে প্রতি তিনজন নারীর একজন শারীরিক বা যৌন সহিংসতার শিকার হয়। কোনো কোনো দেশে এই হার ৭০%। আনুমানিকভাবে বলা চলে যে গড়ে ৩৫% নারী সারা জীবনে ঘনিষ্ঠ সঙ্গী বা সঙ্গী নয় তার কাছ থেকে শারীরিক বা যৌন সহিংসতার শিকার হয়। তবে আবার কোনো কোনো জাতীয় গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, ৭০ শতাংশ নারীর ঘনিষ্ঠ সঙ্গীর কাছ থেকে শারীরিক বা যৌন সহিংসতার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তার জীবৎকালে
- যেসব নারী তাদের সঙ্গীর কাছ থেকে শারীরিক বা যৌন নির্যাতিত হয় তাদের গর্ভপাত হবার আশঙ্কা থাকে, দ্বিগুণ আশঙ্কা থাকে বিষণ্ণতায় পড়ার। কোনো কোনো অঞ্চলে দেড়গুণ আশঙ্কা থাকে এইচআইভি সংক্রমিত হবার, যেসব নারী তাদের সঙ্গীর কাছে সহিংসতামুক্ত থাকে তাদের তুলনায়
- হিসেব করে দেখা গেছে যে বিশ্বে ২০১২ সালে যত নারীকে হত্যা করা হয়েছে, তার অর্ধেক খুন হয়েছে ঘনিষ্ঠ সঙ্গী বা পরিবারের সদস্যদের হাতে, সে বছরে খুন হওয়া ৬% পুরুষের তুলনায়
- ২০১২ সালে নতুন দিল্লীতে এক গবেষণায় দেখা গেছে ৯২ শতাংশ নারী তার জীবদ্দশায় জন্মস্থানে যৌন সহিংসতার শিকার এবং ৮৮ শতাংশ কোনো না কোনো ধরনের মৌখিক যৌন হয়রানির শিকার হন (এর মধ্যে আছে অবাঞ্ছিত যৌন মন্তব্য, শিস দেওয়া, হাসা বা অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করা)
- বিশ্বে ৭০০ মিলিয়ন জীবিত নারী বাল্যবয়সেই বিবাহিত হয়েছে (১৮ বছরের নিচে)। তাদের মধ্যে ৩ জনের ১ জন বা প্রায় ২৫০ মিলিয়ন এর ১৫ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে। বালিকা বধূরা অনেক সময় নিরাপদ যৌনতার কথা বলতে পারে না, যা তাদের ভঙ্গুর করে দেয় বা অসময়ে গর্ভধারণ ছাড়াও এইচআইভি (হিউম্যান ইমিউন ডেফিশিয়েন্সি)-র মতো যৌনবাহিত সংক্রমণের ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়
- ৩০টি দেশের অন্তত ২০০ মিলিয়ন জীবিত নারী ও মেয়ে বর্তমানে স্ত্রী যৌনাঙ্গ ছেদ বা বিকৃতির মধ্য দিয়ে গেছে। এসব দেশের বেশিরভাগ মেয়ের যৌনাঙ্গ ছেদ হয়েছে ৫ বছর বয়সের আগেই
- সারা বিশ্বে যত মানুষ পাচার হয় তার অর্ধেক হলো প্রাপ্তবয়স্ক নারী। নারী ও মেয়েরা একযোগে ৭০ শতাংশ হয়, প্রতি তিন পাচারকৃত শিশুর দুজন হয় মেয়ে
- ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিবেদন মোতাবেক প্রতি ১০ জন নারীর একজন ১৫ বছর বয়স থেকে সাইবার হয়রানির শিকার হয় (এর মধ্যে আছে অবাঞ্ছিত, যৌন অপরাধমূলক অশ্লীল ইমেল বা এসএমএস পাওয়া, অপরাধমূলক, অযথার্থ আগ্রাসনের শিকার হয় সামাজিক নেটওয়ার্ক সাইটে)। এই ঝুঁকি ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সের নারীদের মধ্যে বেশি
- ৪টি বড় অঞ্চলে করা একটি জরিপে বলা হয়েছে, হিসেব করে দেখা গেছে যে, ২৪৬ মিলিয়ন মেয়ে এবং ছেলেদের স্কুলসংক্রান্ত সহিংসতার অভিজ্ঞতা হয় প্রতি বছর এবং চারজন মেয়ের মধ্যে একজন বলেছে তারা স্কুলের শৌচাগার ব্যবহার করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। স্কুলসংক্রান্ত সহিংসতার মাত্রা এবং ধরন মেয়ে ও ছেলেদের ক্ষেত্রে আলাদা হয়। তবে প্রমাণিত হয়েছে যে,

স্কুলে অনেক বেশি যৌন সহিংসতা, হয়রানি এবং শোষণের ঝুঁকিতে থাকে। এর ফলে মানসিক, যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্যে প্রভাবের সাথে সাথে স্কুলসংক্রান্ত জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা সারা বিশ্বে স্কুলে যাবার এবং মেয়েদের শিক্ষার অধিকারের পথে একটি বড় বাধা।

[আরও দেখুন ইউএন উওমেন ২০১৬]

বাংলাদেশের পটভূমিতে

- ৮০% বিবাহিত নারী কোনো না কোনো ধরনের সহিংসতার শিকার হয়
- ১৫-১৯ বছর বয়সী ৪০% মেয়ে যৌন হয়রানির শিকার হয়
- এক-চতুর্থাংশেরও বেশি নারী স্বামী ছাড়া অন্যদের দ্বারা সহিংসতার শিকার হয়
- ২০১৩ সালে ২১১ নারী খুন হয়েছে স্বামীর হাতে এবং ৪৮ জন শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের হাতে, একই বছরের প্রথম ৮ মাসে যৌতুকের কারণে ৩২৭টি নির্যাতনের ঘটনা ঘটে
- ইউনিসেফের তথ্য মতে, ৫২% মেয়ে ১৮ বছর বয়সের মধ্যে বিবাহিত হয় এবং ১৮% ১৫ বছর বয়সের মধ্যে। (ইউনিসেফ ২০১৬)
- বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের তথ্য মতে (জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত ঘটনার প্রেক্ষিতে), ৪৮৯৬ নারী ও মেয়ে ২০১৬ সালে বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা বা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, তার মধ্যে ১০৫০টি ধর্ষণের ঘটনা, এ মধ্যে ১৬৬ জন গণধর্ষণের শিকার এবং ৪৪ জন ধর্ষণের পর খুন হয়েছে। (আইন ও সালিশ কেন্দ্র মোতাবেক) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কর্মস্থলে ২৪৪ জন যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে, তাদের মধ্যে ৬ জন আত্মহত্যা করেছে।

[সূত্র : দৈনিক প্রথম আলো ২০১৪, ২০১৬ ও ২০১৭]

পোস্টার ৮

প্রশ্ন (প্রতিটি ৫ নম্বর)	দল-১	দল-২	দল-৩	দল-৪
কোথায়- সহিংসতার স্থান				
কেন- সহিংসতার কারণ				
কী- কোন্ ধরনের সহিংসতা				
কে- সহিংসতা করেছে				
জেন্ডার রীতি কীভাবে সহিংসতায় প্রভাব বিস্তার করেছে				

ঘটনা : নারী ও মেয়েরা কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ ছাড়াই সহিংসতার শিকার

ঘটনা : ১

১৬ বছর বয়সী নাসরিন বাউনিয়া-বাঁধের সি ব্লকে থাকে। একদিন তার মোরগ দুপুরবেলা প্রতিবেশীর চালের ওপর উঠে জোরে জোরে ডাকতে থাকে। এতে প্রতিবেশীর ছোট বাচ্চা ঘুম থেকে জেগে যায়। প্রতিবেশী রাজিয়া রেগে যায় আর নাসরিনের মা'কে আজে বাজে কথা বলে। একপর্যায়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া লেগে যায়। অনেক গালিগালাজ বিনিময় হয়। নাসরিনের মা রেগে গিয়ে বলেন মোরগের আচরণে তাদের কোনো হাত নেই এবং যা ঘটেছে তা অনিচ্ছাকৃত। সেই ঝগড়া এমন চরমে ওঠে যে, একসময়ে অন্য প্রতিবেশীরা হস্তক্ষেপ করে। ঝগড়া মিটে গেলেও সমস্যা মেটেনি। সেদিনই সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে রাজিয়া কতিপয় ভাড়া করা গুণ্ডা নিয়ে এসে নাসরিনদের বাড়ি আক্রমণ করে। তারা লাঠি আর চাপাতি নিয়ে এসেছিল, নাসরিনদের ঘরের সমস্ত জিনিস ভাঙচুর করে। নাসরিনের মা এবং তার দুই বোন ঘটনার সময় বাড়িতে ছিল। তারা তিনজনকেই প্রচণ্ড মারধর করে এবং নাসরিন কোথায় আছে জিজ্ঞেস করে। সৌভাগ্যবশত নাসরিন তাদের আগেই দেখতে পেয়েছিল ফলে সে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় এবং তার বাবাকে ফোন করার চেষ্টা করতে থাকে। বাবাকে ফোনে না পেয়ে সে স্থানীয় দু'টি ছেলেকে নিয়ে নিকটস্থ মাটিকাটা এলাকায় যায়। যেখানে তার বাবা ভ্রাম্যমাণ ফেরিওয়ালা। ভ্যানে করে হোসিয়ারি এবং অন্যান্য কাপড় বিক্রি করে। বাবাকে সে সব জানায় এবং সঙ্গে নিয়ে দ্রুত বাড়ি ফিরে আসে। ততক্ষণে ভাড়াটে গুণ্ডারা চলে গেছে এবং নাসরিনদের ঘর-বাড়িজুড়ে তাণ্ডব চালানোর ফলে লণ্ডভণ্ড অবস্থা ছিল। নাসরিনের মা ও দুই বোন ভয়ানকভাবে মারধরের শিকার হয়ে মারাত্মক আহত হয়, তাদের দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে স্থানীয় মাতবরদের নিয়ে সালিশ বৈঠক বসে কিন্তু ন্যায়বিচার পাওয়া যায়নি কারণ দায়ী ব্যক্তি এবং গুণ্ডারা স্থানীয় প্রভাবশালী নেতাদের পরিচিত ছিল এবং তাদের নিরাপত্তা দিয়েছিল। নাসরিন ও তার পরিবারকে চুপ থাকতে বলা হলো এবং তাদের হুমকি দেয়া হলো যে তারা যদি এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করে তাহলে ফল খারাপ হবে।

পরে জানা গেল আক্রমণকারীদের মূল উদ্দেশ্য ছিল নাসরিনকে অপহরণ করা, কিন্তু তাকে না পেয়ে তার পরিবারের সদস্যদের মারধর করা হয়েছে। যদি তাকে অপহরণ করতে পারত, সে হয়তো যৌন সহিংসতার শিকার হতো এবং আজীবনের জন্য তার পরিবারের বদনাম হতো।

ঘটনা : ২

রোজিনা ও বেলাল নিজেদের পছন্দে বিয়ে করে জীবন শুরু করে। রোজিনার ৩টি মেয়ে হয়, যা তার স্বামী একদমই পছন্দ করেনি, কেননা সে আশা করেছিল ছেলে হবে। যদিও তারা দু'জনেই কাজ করত, কিন্তু তাদের জন্য ঘরের খরচ চালানো মুশকিল ছিল, কারণ বেলাল তার উপার্জিত আয় বাইরে খরচ করত। এমনকি সে প্রতিবেশীর কাছ থেকে ধার নিয়ে পুরোটাই খরচ করে ফেলেছিল। তারপর রোজিনাকে চাপ দিত তার আয় থেকে ধার শোধ করে দেবার জন্য। এই অবস্থায় তাদের মধ্যে প্রায়শই ঝগড়া হতো, তারপর বেলাল রোজিনাকে অর্থাভাবের কথা বলে গ্রামের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। ইতোমধ্যে সে বিয়ে না করেই আরেকজন নারীর সাথে থাকা শুরু করে। এ কথা জানতে পেরে রোজিনা গ্রাম থেকে ফিরে আসে এবং স্বামীকে এই ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। সে মহিলা চলে যায় আর বেলাল অনিয়মিতভাবে বাড়ি ফিরতে থাকে। এমতাবস্থায় ঋণদাতারা বাড়িতে আসে এবং রোজিনাকে বেলালের ঋণ শোধ করতে চাপ দেয়। এর কিছুদিন পরে বেলাল রোজিনা ও তাদের মেয়েদের ছেড়ে চলে গিয়ে অন্য জায়গায় থাকতে শুরু করে। রোজিনা তার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়, কারণ বেলাল তার ফোন ধরে না। রোজিনা তখন অন্য নাম্বার থেকে ফোন করে। বেলাল যখন বুঝতে পারে যে রোজিনা তাকে খুঁজছে, সে লাইন কেটে দেয়। রোজিনা বর্তমানে অসহনীয় জীবনযাপন করছে তিনটি বাচ্চা নিয়ে এবং তৈরি পোশাক কারখানার কাজ থেকে তার যৎসামান্য আয় দিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে।

এসব গল্পে ছদ্মনাম ব্যবহৃত হয়েছে, সত্য ঘটনাগুলো ঢাকার ৫টি বস্তিতে পরিচালিত পার্টিসিপেটরি অ্যাকশন রিসার্চ (পিএআর) বা গণগবেষণা-এর আওতায় কিশোরী-কিশোরদের দৈনিক জীবনে প্রচলিত রীতি ও জেন্ডার বৈষম্যের অভিজ্ঞতার তথ্য সংগ্রহকালে সংগৃহীত হয়েছে (রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ ২০১৭)।

অধিবেশন ৪.২.২ নারীর প্রতি সহিংসতা : নারী ও মেয়েদের প্রতি যৌন সহিংসতা

উদ্দেশ্য

- বিভিন্ন ধরনের যৌন সহিংসতা এবং ফলাফল সম্পর্কে জানা
- যৌন সহিংসতায় আক্রান্ত বা নির্যাতিতাদের জন্য যে সকল সেবা রয়েছে তা সম্পর্কে জানা

পদ্ধতি

আলোচনা, দলীয় কাজ

উপকরণ

বিভিন্ন ধরনের যৌন সহিংসতার ওপর ছক বা তালিকা (পোস্টার ৯), ফ্লিপ কাগজ, মার্কার

সময়

৪৫ মিনিট

প্রক্রিয়া

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন আজকে নারী ও মেয়েদের প্রতি যৌন সহিংসতা বিষয়ে আলোচনা হবে। তোমরা সবাই গত সেশনে নারী ও মেয়েদের প্রতি বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা সম্পর্কে জেনেছ। যৌন সহিংসতা নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতার মধ্যে ব্যাপক। এ ধরনের যৌন সহিংসতায় আক্রমণকারী বা নির্যাতনকারী আক্রান্তকে চাপ দেয় বা জোর করে যৌনকর্ম করতে বাধ্য করে কিংবা কোনো যৌন মন্তব্য করে যেন আক্রান্ত নারী বা মেয়ে অপমানবোধ করে, ভয় পায় বা অস্বস্তিবোধ করে
- পোস্টার-৯ দেখান যেখানে অংশগ্রহণকারীরা যৌন সহিংসতা বিষয়ক একটি তালিকা দেখতে পাবে। অংশগ্রহণকারীদের অনুরোধ করুন এই তালিকা বা ছকটি পূর্ণ করতে, বিবরণগুলোর পাশের কলামে মন্তব্য করতে।

পোস্টার-৯

বিবরণ	যৌন সহিংসতা			যৌন সহিংসতার ধরন/রূপ
	হ্যাঁ	না	জানি না	
বাসের মধ্যে একটি ছেলে একটি মেয়েকে ধাক্কা দিতে বা স্পর্শ করতে চেষ্টা করে বিনা কারণে				
এক নারীকে তার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বলে যে তাকে পদোন্নতি দেবে যদি সে তার সাথে একরাত কাটায়				
স্কুলে যাবার পথে একটি মেয়ের ওড়না মোটর সাইকেলে করে যাওয়া একটি ছেলে টান দেয়				
স্কুলের একদল ছেলে একটি মেয়ের শরীর নিয়ে সবসময় বাজে মন্তব্য করে এবং তাকে একজন পর্নো তারকার নামে ডাকে				
কিছু ছেলে-মেয়েদের শৌচাগারে অশ্লীল ছবি এঁকে রাখে				

বিবরণ	যৌন সহিংসতা			যৌন সহিংসতার ধরন/রূপ
	হ্যাঁ	না	জানি না	
ভাড়াটে নারী চারতলার ওপরে যেতে গেলে দেখেন যে বাড়িওয়ালা দোতলার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার দিকে বাজেভাবে তাকিয়ে থাকে				
১২ বছরের এক মেয়ে দোকানের পেছনে একটি নির্জন স্থানে ধর্ষিত হয় যখন সে মুদির জিনিস কিনতে গিয়েছিল				
টিফিনের সময় একটি ছেলে একটি মেয়েকে মোবাইলে পর্নো ছবি দেখানোর চেষ্টা করছিল				
বস্তিতে যখন নারীরা স্বল্পবসনা হয়ে স্নান করে তখন একটি লোক সবসময় বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখে				
একদিন কলেজের একটি মেয়ে তার একটি ভুয়া অ্যাকাউন্ট দেখতে পায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে, যেখানে তার পরিচয় লেখা যে সে একজন পতিতা। মেয়েটি জানতে পারে যে ছেলেকে সে প্রত্যাখ্যান করেছিল, সে এই কাজ করেছে				
একজন পুরুষ শিক্ষক সবসময় মেয়ে শিক্ষার্থীদের সংবেদনশীল স্থানে স্পর্শ করতে চায়				
একজন স্বামী তার স্ত্রীকে যৌনমিলনে জোর করে রাতে যদিও অসুস্থতার জন্য সে রাজি হয় না				
একটি মেয়েকে তার প্রেমিক খুব জোরে মারে কারণ সে যৌনমিলনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল				
একটি লোক নিজের প্রেমিকাকে পতিতালয়ে বিক্রি করে দেয় যে তার সাথে বিয়ের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে পালিয়ে এসেছিল				

- প্রথমে তালিকাটি সম্পূর্ণ করুন অংশগ্রহণকারীদের সহায়তায়। তারপর আলোচনা করুন ও পরিষ্কার করুন বিভিন্ন যৌন সহিংসতা বিষয়ে যদি তারা আলাদা মতামত দেয় বা যদি বুঝতে না পারে কোন বিবরণ কোন ধরনের যৌন সহিংসতার মধ্যে পড়ে।
- অংশগ্রহণকারীদের বলুন প্রতিটি সমাজেই নারী ও মেয়েরা বাড়িতে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, বাজারে, সিনেমা হলে, পার্কে, রাস্তায়, পর্যটন স্থানে, বৈঠকে, মিছিলে, গণপরিবহনে এবং কর্মস্থলে বিভিন্ন ধরনের যৌন সহিংসতার শিকার হয়। নারী ও মেয়েরা সহিংসতামুক্ত জীবনযাপন করতে পারে না যদিও এটি জাতীয় সংবিধান এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সনদের দ্বারা স্বীকৃত একটি অধিকার যা সমস্ত মানুষের জন্য প্রযোজ্য। যে কোনো শ্রেণি বা সমাজের যে কোনো নারী/মেয়ে যৌন সহিংসতায় আক্রান্ত হতে পারে যে কোনো সময় বা স্থানে
- অংশগ্রহণকারীদেরকে বলুন যে, এখন বিভিন্ন ধরনের যৌন সহিংসতা সম্পর্কে তারা জানে। তাদেরকে ৪ ভাগে ভাগ হতে বলুন। প্রতিটি দল নিচের বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করবে:
  - যৌন সহিংসতার অন্তর্নিহিত কারণ
  - যৌন সহিংসতার ফল
  - কীভাবে যৌন সহিংসতা প্রতিরোধ করা যায়
  - যৌন সহিংসতার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে কী কী সেবা রয়েছে

- দলীয় কাজ শেষ হয়ে গেলে প্রতিটি দলকে বলুন তাদের কাজ উপস্থাপন ও আলোচনা করতে। অন্যদের বলুন মতামত দিতে এবং চাইলে কিছু যোগ করতে

- প্রতিটি দলকে ধন্যবাদ দিন তাদের কাজ ও সহযোগিতার জন্য। আরও আলোচনা করুন দলীয় কাজের ৪টি বিষয় নিয়ে সহায়কের জন্য তথ্যের ভিত্তিতে। তাদের বলুন যে যৌন সহিংসতা অন্য অনেক সহিংসতার মতোই একটি অপরাধ এবং বাংলাদেশের বর্তমান আইনে তার বিচারও হয়। যৌন সহিংসতা আক্রান্তকারীকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে আক্রান্ত করে। এর ফলে শুধু যে আক্রান্তের জীবন নষ্ট হয় তাই নয়, তার পরিবারও অনেক সময় অসহায় হয়ে পড়ে, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে আক্রমণ/নির্যাতনকারীর পরিবারও ভোগে। যেমন- যদি কোনো সহিংসতার বিরুদ্ধে মামলা হয় এবং আক্রমণকারীর জেল হয় তবে তার পরিবারকে মামলা চালাবার জন্য অর্থ ব্যয় করতে হয় এবং সমাজে তাদের মানসম্মানের হানি হয়

- যৌন এবং সবরকমের সহিংসতার ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত কারণগুলো দূর করতে হলে, আমাদেরকে সংঘটিত হওয়ার কারণ সম্পর্কে জানতে হবে। যদিও সহিংসতা নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে হয়, কিন্তু এটি শুধু নারীদের বিষয় নয়। এটি মানবাধিকার এর বিষয়। তাই সবারই অন্য মানুষের মানবাধিকারকে সম্মান করতে হবে। নারী ও মেয়েদের দরকার আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানবোধ থাকা মানুষ হিসেবে জীবনযাপনের জন্য। তাদের দরকার নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া, ক্ষমতায়িত হওয়া ও সক্ষমতার উন্নয়ন ঘটিয়ে পরিবার ও সমাজে তাদের অধস্তন অবস্থার পরিবর্তন করা। তাদের আরও প্রয়োজন প্রচলিত রীতিকে চ্যালেঞ্জ করা, যা বিশেষ করে কর্তৃত্বকারী ও ক্ষমতাশীল পুরুষদেরকে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতায় সহায়তা করে। তাদের বিরুদ্ধে যেকোনো সহিংসতা ঘটলে তাদের চুপ করে থাকা উচিত নয়। কারণ তাদের চুপ করে থাকা মানে মেনে নেওয়া এবং এটি আক্রমণকারীদের আরও সহিংসতা ঘটাতে উৎসাহিত করে। তাদের মনে রাখতে হবে যে, এই সহিংসতার জন্য তারা দায়ী নয়, বরং এটি একটি অপরাধ এবং আক্রমণকারীর ক্ষমতা, অবস্থান ও পদ যা-ই হোক না কেন, তার শাস্তি হওয়া উচিত। কারোই অধিকার নেই অন্যের যৌনতা এবং শরীরের ওপর সম্মতি ছাড়াই নিয়ন্ত্রণের চর্চা এবং চেষ্টা করা। এ ধরনের কাজের ফলে অন্যের প্রতি অপমান ও অসম্মান হয় এবং তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। নারী ও মেয়েদের জানতে হবে কী কী ধরনের সেবা তারা পেতে পারে যৌন বা অন্য যে কোনো সহিংসতার ক্ষেত্রে। মনে রাখতে হবে যে, দেশে আইন আছে এবং প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব হচ্ছে আইনের সাহায্য নিয়ে উপকৃত হওয়া। গ্রাম ও শহরে অনেক সংস্থা আছে যারা সহিংসতায় আক্রান্তদের সহায়তা দেয়, অনেক সময় বিনামূল্যেই। আক্রমণকারীরা সবসময় ক্ষমতাশালী হয় এবং তারা তাদের ক্ষমতা ব্যবহার করে পরিস্থিতি তাদের অনুকূলে নিয়ে আসার জন্য। তাই আক্রমণকারীকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসা খুবই জরুরি।

- পুরুষ এবং ছেলেদের মনে রাখা উচিত তাদের ক্ষমতা দৈব নয়, বরং এটি সমাজ তৈরি করেছে সামাজিক রীতির মধ্য দিয়ে নারীদের অধিকার এবং ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে বিনষ্ট করা ও তাদের সবক্ষেত্রে অবদমিত রাখার জন্য। যদি কোনো পুরুষ সহিংসতার মুখোমুখি হয় তবে সে আঘাত পায়, তেমনিভাবে কোনো নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার ক্ষেত্রে তারও এমন আঘাত লাগে। এমন ভাবা উচিত নয় যে নারী বলেই তাদের সহিংসতার শিকার হতে হবে। সবার জন্য একটি সমতাভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে হলে পুরুষ ও ছেলেদের ভাবতে শুরু করা উচিত যে, নারী ও মেয়েরা তাদের মতোই মানুষ, যাদের একটি সহিংসতামুক্ত জীবনযাপনের অধিকার রয়েছে। পুরুষ ও ছেলেদের ক্ষমতা ব্যবহার করতে হবে নারী ও পুরুষের মধ্যে ক্ষমতার সমান সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করার জন্য

- অংশগ্রহণকারীদের ক্র্যাপ খাতা ব্যবহার করে বাড়ির একটি কাজ করতে বলুন, নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে তাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব কী হবে তার ওপর। তারা যদি যৌন সহিংসতা এবং সহায়ক সেবা সম্পর্কে আরও জানতে চায়, তবে তাদের প্রশ্ন লিখে নামহীন বাক্সে ফেলতে বলুন। পরের সেশনে সে সম্পর্কে তথ্য জানিয়ে দেওয়া হবে। অংশগ্রহণকারীদের বলুন যে, যদি কেউ সহিংসতার শিকার হয় বা কাউকে শিকার হতে দেখে, তবে তারা সেটা লিখে রাখতে পারে এবং যদি দরকার হয় সাহায্য চাইতে পারে। আরও বলুন যে, এক্ষেত্রে অবশ্যই গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।

বিভিন্ন ধরনের যৌন সহিংসতার তালিকা

বিবরণ	যৌন সহিংসতার রকম
বাসের মধ্যে একটি ছেলে একটি মেয়েকে ধাক্কা দিতে বা স্পর্শ করতে চেষ্টা করে বিনা কারণে	যৌন হয়রানি, কারণ যদিও সে তাকে শারীরিকভাবে ক্ষতি করতে পারছে না, কিন্তু তার উদ্দেশ্য ছিল মেয়েটির ক্ষতি করা বা তাকে অপমান করা
এক নারীকে তার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বলে যে তাকে পদোন্নতি দেবে যদি সে তার সাথে একরাত কাটায়	যৌন হয়রানি। এমন যৌন আচরণের মাধ্যমে পুরুষ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তার খারাপ উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছে নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে কোনো অধস্তন নারীর যৌনতার ওপর নিয়ন্ত্রণ করার জন্য
স্কুলে যাবার পথে একটি মেয়ের ওড়না মোটর সাইকেলে করে যাওয়া একটি ছেলে টান দেয়	এটি একটি যৌন হয়রানিমূলক আচরণ। মেয়েটি ভীত ও আতঙ্কিত হয়েছে কারণ এটি শুধু তাকে অপমানই করেনি, সে পড়ে গিয়ে ব্যথা বা আঘাত পেতে পারত
স্কুলের একদল ছেলে একটি মেয়ের শরীর নিয়ে সবসময় বাজে মন্তব্য করে এবং তাকে একজন পর্নো তারকার নামে ডাকে	ছেলেগুলোর এমন আচরণ যৌন হয়রানিমূলক, কারণ তারা এগুলো মজা করার জন্য করে এবং তাদের এমন আচরণের জন্য মেয়েরা অপমানিত হয়। পরিস্থিতিটা মেয়েটির জন্য ভীতিকর
কিছু ছেলে মেয়েদের শৌচাগারে অশ্লীল ছবি এঁকে রাখে	
ভাড়াটে নারী চারতলার ওপরে যেতে গেলে দেখেন যে বাড়িওয়ালা দোতলার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার দিকে বাজেভাবে তাকিয়ে থাকে	যৌন হয়রানিমূলক, কারণ সে এ বিষয়ের সাথে জড়িত আর তার নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত
বারো বছরের এক মেয়ে দোকানের পেছনে একটি নির্জন স্থানে ধর্ষিত হয় যখন সে মুদির জিনিস কিনতে গিয়েছিল	এটি ধর্ষণ এবং অবশ্যই যৌন সহিংসতা। কারণ মেয়েটি তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যৌনমিলনে বলপূর্বক বাধ্য হয়েছে তার সম্মতি ছাড়াই। তার যৌন অধিকারও সম্পূর্ণভাবে ভঙ্গ হয়েছে। এটি তার মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে এবং তার জীবন ধ্বংস করে দিয়েছে নিরাপত্তাহীন করে তুলেছে
টিফিনের সময় একটি ছেলে একটি মেয়েকে মোবাইলে পর্নো ছবি দেখানোর চেষ্টা করছিল	যৌন হয়রানিমূলক, কারণ ছেলেটির উদ্দেশ্য ছিল মেয়েটার সম্মতি ছাড়াই যৌন আনন্দ লাভ আর এতে মেয়েটির জন্য অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।
বস্তিতে যখন নারীরা স্বল্পবসনা হয়ে স্নান করে তখন একটি লোক সবসময় বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখে	যৌন হয়রানি। যদিও নারীরা এটা জানতে পারে না, তারপরও এটা সহিংসতা কারণ এটি নারীর গোপনীয়তার অধিকার বাধাগ্রস্ত করছে। লোকটি তার বিকৃত যৌন আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে এমন করছে অন্যের অধিকার ভঙ্গ করে
একদিন কলেজের একটি মেয়ে তার একটি ভুয়া অ্যাকাউন্ট দেখতে পায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে, যেখানে তার পরিচয় লেখা যে সে একজন পতিতা। মেয়েটি জানতে পারে যে ছেলেকে সে প্রত্যাখ্যান করেছিল, সে এই কাজ করেছে	যৌন হয়রানি। কারণ ছেলেটি মেয়েটির ওপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে আর ক্ষতি করতে চেয়েছে
একজন পুরুষ শিক্ষক সবসময় মেয়ে শিক্ষার্থীদের সংবেদনশীল স্থানে স্পর্শ করতে চায়	যৌন নিগ্রহ, কারণ শিক্ষকটি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে শিশুদের শারীরিক সংস্পর্শে আসতে চেয়েছে

বিবরণ	যৌন সহিংসতার রকম
একজন স্বামী তার স্ত্রীকে যৌনমিলনে জোর করে। যদিও অসুস্থতার জন্য সে রাজি হয় না	এটি বৈবাহিক ধর্ষণ। যদিও আমাদের দেশে বৈবাহিক ধর্ষণ অনেক বেশি স্বীকৃত নয় সহিংসতা হিসেবে, কিন্তু এটি ধর্ষণ কারণ স্বামী স্ত্রীকে যৌন শোষণ করেছে, তার সম্মতি ব্যতিরেকে জোর করেছে স্বামী হিসেবে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে
একটি মেয়েকে তার প্রেমিক খুব জোরে মারে কারণ সে যৌনমিলনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল	যৌন আক্রমণ, কারণ ছেলেটি যেহেতু মেয়েটির সাথে যৌন মিলনের ইচ্ছেপূরণ করতে পারেনি। মেয়েটির কাছে থেকে 'না' শোনা পছন্দ করেনি অন্য ছেলেদের মতোই
একটি লোক নিজের প্রেমিকাকে পতিতালয়ে বিক্রি করে দেয়, যে তার সাথে বিয়ের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে পালিয়ে এসেছিল	যৌন শোষণ, কারণ লোকটি মেয়েটির সম্পর্ক বা বিশ্বাসের ফায়দা নিয়েছে তাকে যৌন কার্যকলাপ/পতিতাবৃত্তিতে জড়িত করে।

যৌন সহিংসতার অন্তর্নিহিত কারণ

- সমাজের গভীরে নিহিত রীতিগুলো পুরুষদেরকে অনেক ক্ষমতাশীল একটি স্থানে রেখেছে নারীর তুলনায়। পুরুষ ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ এবং আধিপত্যের প্রদর্শন করে সহিংসতার মাধ্যমে
- যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে মানুষ এখনও মনে করে না এটি অপরাধ এবং শাস্তিযোগ্য। উত্ত্যক্ত করাকে পুরুষ ও ছেলেরা ভাবে মজা করা, তারাও এটিকে যৌন সহিংসতা মনে করে না। অনেক সময় মেয়েরাই অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত হয় তাদের অঙ্গভঙ্গি এবং পোশাকের জন্য বলা হয় এসব পুরুষ ও ছেলেদের আমন্ত্রণ জানায় তাদের উত্ত্যক্ত করতে। যেসব ছেলে মেয়েদেরকে পথে, স্কুলে যাবার সময় উত্ত্যক্ত করে তাদের কাছে এটি স্বাভাবিক, যেহেতু তারা মনে করে একটা বয়সে এমন সবারই হয়
- যৌন আকাঙ্ক্ষা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু কোনো কোনো পুরুষ ও ছেলে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তাছাড়া, যৌনতা সম্পর্কে বিকৃত এবং অযথার্থ জ্ঞান কাউকে মেয়ে ও নারীদের ওপর যৌন সহিংসতায় এগিয়ে নিয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে যেসব নারী ও মেয়ে অসহায় এবং অনিরাপদ অবস্থায় আছে [যেমন- যারা বস্তিতে থাকে, অনাথ/অভিভাবকহীন, রাস্তায় থাকে, শিশু এবং কিশোরী, শারীরিকভাবে অক্ষম, যৌনকর্মী] তাদের যৌন সহিংসতার শিকার হবার সুযোগ অনেক বেশি
- বেশিরভাগ সময় ধর্ষণ, জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তি এবং পাচার করার ঘটনা গোপন রাখা হয় পারিবারিক মানসম্মান হারাবার ভয় ও লজ্জায়। প্রকৃতপক্ষে, প্রচলিত সামাজিক রীতিতে কোনো মেয়ে বা নারী যদি সহিংসতার শিকার হয় তার বিয়ে দিতে সমস্যা হয়। একদিকে সমাজ তাকে 'খারাপ মেয়ে বা নারী' আখ্যা দেয়, অন্যদিকে আক্রমণকারী স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। অপরাধ করার পরেও জীবন চালিয়ে যায় সে। সবকিছু তার জন্য ঠিক থাকে। আক্রমণকারী এমন রীতির সুযোগ নেয় এবং আরও অপরাধ করার ক্ষমতা পায়
- যদিও আইন আছে কিন্তু তার প্রয়োগ নেই, সেই সাথে বিচার বিভাগ অনেক সময় নেয় রায় দিতে এবং অনেক সময় আক্রমণকারীকে জামিন নিয়ে বের হতে সাহায্য করে। সচ্ছল এবং ক্ষমতাবান আক্রমণকারীরা প্রশাসন এবং কর্তৃপক্ষের ওপর প্রভাব বিস্তার করে পরিস্থিতি তার দিকে ঘুরিয়ে দিতে ও মামলা দায়ের না করতে। আমাদের দেশে অনেক সময় স্থানীয় নেতৃত্বে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যৌন সহিংসতা ঘটায়। আক্রান্ত ও তার পরিবার বিচার চাইতে পারে না নিরাপত্তাহীনতার কারণে, প্রভাবশালী আক্রমণকারীদের দেওয়া জীবনের ওপর হুমকির জন্য। তাছাড়া, বিচার বিভাগ ও প্রশাসনে পুরুষরা সিদ্ধান্ত নেবার অবস্থানে থাকে। স্থানীয় নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের কোনো কর্তৃত্ব বা চর্চা করার ক্ষমতা থাকে না এমন ঘটনায় পুরুষদের বিরুদ্ধে কিছু করার। গ্রামাঞ্চলে নারীর প্রতি সহিংসতার সালিশের (ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের পরিচালিত অপ্রাতিষ্ঠানিক বিচার) সদস্যরা সব পুরুষ হয়। তারা তাদের রায় অনেক সময় আক্রান্তের বিরুদ্ধে এবং আক্রমণকারীর পক্ষে দেয়।

নারী বা মেয়েদের জন্য ফলাফল :

- আক্রান্ত/নির্যাতিতা অনিরাপদ ও অপমানিত বোধ করে, সন্ত্রস্ত এবং বিপর্যস্ত হয়, মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে, বেঁচে থাকার সব আশা আর ইচ্ছে শেষ হয়ে যায়
- হীনমন্যতা, আত্মবিশ্বাসহীনতা ও আত্মসম্মানহীনতায় ভোগে
- আক্রান্তকে অনেক সময় পরিবার ও সমাজ দোষারোপ করতে থাকে। এটি তার চলাফেরা ও কথা বলার স্বাধীনতাকে বিঘ্নিত করে
- ঘটনার সাথে জড়িত লজ্জা, ঘৃণা, অপমান, দোষারোপ, বঞ্চনার সাথে পেরে না উঠে আত্মহত্যা করে।
- স্বাস্থ্যে গুরুতর আঘাত : ধর্ষণের ঘটনায় আক্রান্তের প্রজনন অঙ্গ অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অনেক সময় উর্বরতা নষ্ট হয়ে যায়
- অনেক বেশি সম্ভবনা থাকে যৌনবাহিত রোগ এবং সংক্রমণের শিকার হওয়ার
- অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ এবং জোরপূর্বক গর্ভপাত
- অর্থনৈতিক ক্ষতি কেননা চিকিৎসা এবং মামলা চালানোর ব্যয়
- 'স্বাভাবিক' জীবন চালানোর ইচ্ছা ও ক্ষমতা, ভবিষ্যতের ইচ্ছা, আরও ভালো জীবনের স্বপ্ন দেখা এবং একটা সম্মানজনক ও আনন্দময় যৌন সম্পর্কের ইচ্ছা শেষ হয়ে যায়
- শিক্ষা ও কর্মে ছেদ পড়ে
- সামাজিক পুঁজি বা বিশ্বাস গঠনের ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়, কারণ আক্রান্ত তার জীবনে আর কাউকে ভরসা, বিশ্বাস এবং সম্মান করতে পারে না।

প্রতিরোধ বা পদক্ষেপ নেওয়া

ব্যক্তিগত পর্যায়ে

- নারী ও পুরুষ উভয়কেই সচেতন হতে হবে বর্তমান ক্ষমতার সম্পর্ক নিয়ে এবং এর অন্তর্নিহিত কারণগুলোর ব্যাপারে। পুরুষ ও ছেলেদেরকে নারীর অধিকারের বিষয়ে সচেতন হতে হবে এবং সেগুলোকে মানবাধিকার বলে স্বীকার করে নিতে হবে। তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করা উচিত নয় নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে। তাদের মনে রাখতে হবে যে অন্যের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো অধিকার নেই এবং মেয়েদের মতামত ও সিদ্ধান্তকে সম্মান করতে হবে। তাদের নিজের ইচ্ছেপূরণ করার জন্য নিজের ক্ষমতা ও ইচ্ছেকে ব্যবহার করা উচিত হবে না
- নারী ও মেয়েদের অধিকার সম্পর্কে জানতে হবে।
- নারী ও পুরুষ উভয়কেই সহিংসতাকে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচনা করতে হবে এবং যে কোনো রকম সহিংসতা প্রতিরোধে সবার মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে
- পুরুষ ও ছেলেদের সম্মানবোধ থাকতে হবে এবং নিজেদের যৌন আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার ওপরে নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে, তাদের স্ত্রী ও প্রেমিকা ও মেয়েদের প্রত্যাশার প্রতি সম্মান দেখাতে হবে
- নারী ও মেয়েদের মনে সাহস রাখতে হবে সব প্রকাশ করার, যখন তারা যৌন সহিংসতাসহ অন্য সহিংসতার শিকার হবে
- নারী ও মেয়েদের যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হতে হবে ও আত্মসম্মানবোধ থাকতে হবে। তাদের মনে রাখতে হবে যে, তারা সহিংসতার শিকার হতে পারে না নারী ও মেয়ে বলে। তাদের চুপ করে থাকা উচিত হবে না সহিংসতার শিকার হলে। সহিংসতার শিকার হওয়া কোনো নারী ও মেয়ের অপরাধ নয় বরং আক্রমণকারীরা হচ্ছে অপরাধী যারা খারাপ কাজ করেছে এবং তাদের শাস্তি হওয়া উচিত, কারণ আক্রমণকারীদের তাদের আঘাত বা ক্ষতি করার কোনো অধিকার নেই। একজন মানুষের সেক্স যা-ই হোক না কেন সবার

জীবনই গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান। তাই কারোরই অন্যের জীবন নষ্ট করার অধিকার নেই। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, আক্রমণকারী সবসময় আক্রান্তকে হুমকি দেবে ভবিষ্যতে তার আবার ক্ষতি করার কথা বলে এবং আক্রান্তকে চুপ করে থাকতে বলবে। কিন্তু আক্রান্তকে মনে রাখতে হবে যে, এটা না বলে দিলে বা প্রতিবাদ না করলে আবার সহিংসতা করতে পারে ভবিষ্যতে এবং আরও ভয়ানকভাবে। তাই খুব দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে যেন আক্রমণকারী আবার একটি সুবিধাজনক অবস্থানে না পৌঁছে যায়। প্রতিটি নারী ও মেয়েকে 'না' বলা শিখতে হবে তাদের সম্মতি ছাড়া কোনো রকম যৌনকর্মে

- নারী ও মেয়েদের অপরিচিতদের সাথে সাবধানে কথা বলা উচিত, হঠাৎ বিশ্বাস করে যাওয়া উচিত নয়। কারণ এতে পাচারের আশঙ্কা থেকে যায়। তাদেরকে যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে কর্মস্থল বা যে কোনো বিষয়ে এবং সে সংক্রান্ত কাগজপত্র নিতে হবে প্রস্তাবিত কাজের সত্যতা যাচাই করার জন্য

- নারী ও মেয়েদেরকে চিহ্নিত করতে হবে স্থান এবং মানুষ যারা তাদের ক্ষতি করতে পারে, সে যেই হোক না কেন, পরিচিত বা অপরিচিত, এমনকি তাদের বাবা, ভাই বা অন্য যে কোনো আত্মীয়। নারী ও মেয়েদের সাহসী হতে হবে এবং একটি নিরাপদ আশ্রয় নিতে হবে তাদের নিজস্ব সামাজিক যোগাযোগ থেকে এবং আশেপাশে যে সেবা পাওয়া যায় সেখান থেকে [উদাহরণ- যদি কোনো কিশোরী তার বোনের পরিবারের সাথে থাকে এবং যদি তার দুলাভাইয়ের দ্বারা কোনো যৌন হয়রানির শিকার হয় তবে কোনোরকম দেরি না করে বোন, অন্য বড়দের সব জানানো উচিত বা শিক্ষকদের সাথে কথা বলতে হবে বিকল্প ব্যবস্থার জন্য যেমন- আশ্রয়কেন্দ্র, যদি তার অন্য কোনো আত্মীয় দায়িত্ব নিতে না পারে]।

সামাজিক পর্যায়

- সবাইকে প্রচলিত আইন, অনুমোদন এবং প্রাপ্ত সহায়ক সেবার ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে

- প্রতিটি কমিউনিটিতে একটি সক্রিয় কমিউনিটি সুরক্ষা কমিটি থাকতে হবে নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধে

- পরিবার হচ্ছে শিশুর প্রথম শিক্ষালয়। ছেলে ও মেয়েদের সমানভাবে দেখা উচিত, কোনো বৈষম্য না করে এবং একে অপরের ক্ষতি না করে। শিশুদের শেখানো উচিত ক্ষমতা ব্যবহার করে মানুষের ক্ষতি করা বা অন্যের জীবন ধ্বংস করা নয়, বরং মানুষ, পরিবার, কমিউনিটি এবং রাষ্ট্রের উপকার করা

- গণমাধ্যমের উচিত নয় নারীর যৌনতাকে ব্যবহার করে তাকে পণ্যরূপে উপস্থাপন করা। যেগুলো নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতাকে উস্কে দেয় এমন কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠান বা বিজ্ঞাপন বানাতে হবে। তাদের উচিত দর্শকদের চিন্তাকে গঠন করা সামতাভিত্তিক ক্ষমতার সম্পর্কের দিকে, এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করা যেখানে নারী ও পুরুষ একই অবস্থান, মর্যাদা এবং একই ভূমিকা পালন করে। তাদের শুধু নারীর সৌন্দর্যের ওপর জোর দেওয়া নয় বরং যোগ্যতা, সক্ষমতা এবং তাদের পরিবার কমিউনিটি ও জাতি গঠনে যে ক্ষমতা আছে তাতে জোর দেওয়া

- রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে শ্রেণি, জেন্ডার এবং ধর্মনির্বিশেষে সব নাগরিকের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। ভিএডব্লিউ ও জি সংক্রান্ত মামলায় আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে ও বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে এবং যথার্থ বিচার ও শাস্তি হতে হবে আক্রমণকারীদের। বিচার পক্ষপাতদুষ্ট এবং আক্রান্তের বিরুদ্ধে হওয়া উচিত নয়। নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধ করতে ও সুরক্ষা দিতে নির্বাচিত প্রতিনিধি, প্রশাসন এবং কর্তৃপক্ষকে নিজ নিজ ভূমিকা ও দায়িত্বপালন করতে হবে।

প্রাপ্ত সেবাসমূহ

- বাংলাদেশে নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) দ্বারা নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার মামলার বিচার করা হয়। আইনটিতে নির্দিষ্ট সহিংস কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আইনের কথা বলা আছে। (অংশগ্রহণকারীরা যদি আরও বেশি জানতে চায়, তাহলে অনুগ্রহ করে লিখতে বলুন তাদের প্রশ্ন এবং পরের সেশনে যথাযথ তথ্য দিন)
- একটি জাতীয় শিশু হেল্প লাইন আছে এবং আছে নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা হেল্পলাইন (শিশু হেল্প লাইন নম্বর ১০৯৮ এবং নারী ১০৯)। যে কেউ সহিংসতার ক্ষেত্রে এই হেল্প লাইনে সহায়তা চাইতে পারে
- নিকটস্থ থানায় সহিংসতার বিরুদ্ধে মামলা করা সম্ভব
- সহিংসতা আক্রান্ত বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণ, সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলরদের কাছে সহায়তা চাইতে পারে
- তারা বিদ্যমান কমিউনিটিভিত্তিক সুরক্ষা কমিটি, যদি থেকে থাকে তবে তার কাছে যেতে পারে
- আইনগত সেবা বা সহায়তা দেবার জন্য কিছু সংস্থা আছে- আইন ও সালিশ কেন্দ্র, মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, জাতীয় মহিলা আইনজীবী সংস্থা, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস ট্রাস্ট, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। যারা বিনা পারিশ্রমিক বা নামমাত্র মূল্যে আইনি সহায়তা দিয়ে থাকে।

অধিবেশন ৪.২.৩ নারীর প্রতি সহিংসতা : নারী ও মেয়েদের প্রতি পারিবারিক সহিংসতা

উদ্দেশ্য

- পারিবারিক সহিংসতা সম্পর্কে জানা

পদ্ধতি

আলোচনা, ভূমিকাভিনয়

উপকরণ

ফ্লিপ কাগজ, মার্কার

সময়

৪৫ মিনিট

প্রক্রিয়া

- সেশন শুরু করুন অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে, যদি থাকে (যদি কারো সহিংসতার বিরুদ্ধে সহায়তা লাগে তাহলে বলুন সেশন শেষে আপনার সাথে কথা বলতে বা নির্দিষ্ট একটা সময় দিন সেশনের পরে)। তাদের অনুরোধ করুন নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধে তাদের কী ভূমিকা হবে তা বলতে। বিশেষ করে ছেলেদের বলতে দিন
- তাদের বলুন, তোমরা সবাই জানো যে নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতা যে কোনো স্থানে হতে পারে। এমনকি তারা নিজেদের ঘরেও সুরক্ষিত নয়। অনেক নারী/পুরুষ, মেয়ে/ছেলে বাড়িতে পরিবারের সদস্যদের হাতে সহিংসতায় আক্রান্ত হয়। আমাদের দেশে নারী ও মেয়েরা ঘরে পরিবারের সদস্যদের হাতে সহিংসতার মুখোমুখি হয় ছেলেদের চাইতে বেশি, কারণ হলো বৈষম্যমূলক রীতি ও চর্চা
- আলোচনা করুন যে পারিবারিক সহিংসতা হলো এমন এক ধরনের সহিংসতা বা আগ্রাসী আচরণ যা পরিবারের নারী ও শিশুর ওপর পরিবারের সদস্য, সঙ্গী বা স্বামী দ্বারা সংঘটিত হয়। পারিবারিক সহিংসতায় নারীরাও অন্য নারীর ওপর সহিংসতা ঘটাতে পারে
- অংশগ্রহণকারীদের ৩ ভাগে ভাগ হতে বলুন। তাদের ৫ মিনিট সময় দিন কোনো একটি পারিবারিক সহিংসতার দৃশ্য ঠিক করে তার ওপর অভিনয় করার জন্য। তারপর তাদের নির্বাচিত বিষয়টি বলতে বলুন বিভিন্ন দলে পুনরাবৃত্তি এড়ানোর জন্য। তাদের ১০ মিনিট সময় দিন তৈরি হতে
- নাটিকা শেষে বিভিন্ন ভূমিকাভিনয় নিয়ে আলোচনা করুন নিচের প্রশ্নগুলো করে :
  - নাটিকায় কী ধরনের সহিংসতা দেখান হয়েছে?
  - কে সহিংসতা করেছে কার ওপর?
  - সহিংসতার কারণ কী কী?
- অংশগ্রহণকারীদের বলতে বলুন কেন নারী ও মেয়েরা পারিবারিক সহিংসতার মুখোমুখি হয়, সেইসাথে আক্রান্ত ও তার পরিবারের ওপর পারিবারিক সহিংসতার ফল আলোচনা করতে বলুন। একটি ফ্লিপ কাগজে সব কারণ এবং ফলাফল লিখে রাখুন।

- বলতে থাকুন আজকে নারী ও মেয়েদের ওপর পারিবারিক সহিংসতার অন্যতম কারণ যৌতুক নিয়ে আলোচনা হবে। তাদের জিজ্ঞস করুন তারা যৌতুকের কারণে ঘটেছে এমন কোনো সহিংসতার ঘটনা জানে কিনা
- তাদের বলার পরে যৌতুক এবং তার কারণ ও ফলাফল আলোচনা করুন (সহায়কের জন্য তথ্য অংশের, সামাজিকীকরণের অংশে যৌতুক আলোচনার সাহায্য নিন)। আরও আলোচনা করুন বাংলাদেশের যৌতুক প্রতিরোধে বর্তমান আইন এবং কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

বাংলাদেশে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০-এর অধীনে পারিবারিক সহিংসতার মামলার বিচার করা হয়।

সহায়কের জন্য তথ্য

যৌতুক কী

যৌতুক হচ্ছে সম্পত্তি, নগদ অর্থ বা জিনিসপত্র যা বরকে দেওয়া হয় বিয়ের ক্ষেত্রে। আইনের ধারায় (যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০, সংশোধিত ১৯৮৬) এভাবে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে যে, বিবাহকালে কোনো একপক্ষ আরেকপক্ষকে বিয়ের আগে বা পরে যে কোনো সময় বিয়েতে রাজি হবার জন্য কোনো সম্পত্তি বা মূল্যবান দ্রব্য নিরাপত্তা হিসেবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেওয়া বা দিতে সম্মত হওয়া। সাধারণত কনের পরিবার বরের পরিবারকে যৌতুক দেয় বিয়ের সময়। যৌতুক হচ্ছে আমাদের সমাজের অন্যতম খারাপ একটি চর্চা।

বর্তমান আইন

যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০ (সংশোধিত ১৯৮৬) হচ্ছে বাংলাদেশে যৌতুক নিয়ে প্রাথমিক আইন। এটিতে যৌতুককে একটি অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে, সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড, জরিমানা বা উভয় বিধান রেখে।

যৌতুকের কারণ

- ছেলেকে পড়ানো বাবদ মা-বাবার যা ব্যয় হয়েছে তা ফেরত আসা নিশ্চিত হয়
- মা-বাবারা একজন সুপাত্রের জন্য আকর্ষণীয় উদ্দীপক হিসেবে যৌতুক দেয় যেন মেয়ের ভবিষ্যত নিশ্চিত হয়
- টাকা আয় করার জন্য পাত্রপক্ষের একরকম উপায়
- ঘাড় থেকে বোঝা নামানো : নারীকে অনুৎপাদনশীল বোঝা বলে মনে করা হয়
- মেয়েদের বয়স বাড়ার আগেই বিদায় করা, না হলে পরে সুপাত্র পাওয়া মুশকিল হয়– এই রকম চিন্তা করা
- যৌতুক দেওয়া ও নেওয়াকে অপরাধ বলে মনে না করা
- বর্তমান আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন না হওয়া।

যৌতুকের ফলাফল

- নারী ও মেয়েরা শারীরিক ও মানসিক সহিংসতার শিকার হয় স্বামী বা শ্বশুরের পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে। অনেক সময় স্ত্রীকে হত্যা করা হয়, আক্রান্ত অ্যাসিডে দগ্ধ হয় বা চিরতরে শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে যায়। নারীরা আত্মহত্যা করে সহিংসতা সহ্য করতে না পেরে। একবার দিলে আরও যৌতুকের জন্য চাহিদা বাড়তে থাকে। যত বেশি চাহিদা, তত বেশি স্ত্রী নির্যাতন হয়
- কনের পরিবার সহায় সম্পত্তিহীন হয়ে পড়ার ঝুঁকিতে পড়ে যৌতুক দেবার পরে

  শিশুরা, বিশেষ করে ছেলেরা শেখে কীভাবে সহিংস হয়ে উঠতে হয় যখন মা'কে সহিংসতার শিকার হতে দেখে
- এর ফলে সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে এবং মানুষ অন্যের সম্পত্তি পাবার জন্য লালায়িত হয়ে পড়ে বা কোনো কাজ না করেই টাকা আয় করতে চায়। অনেক বেকার পুরুষ বিয়ে করতে চায় বিপুল যৌতুকের বিনিময়ে এই ভেবে যে, সেই যৌতুক দিয়ে ব্যবসা করবে। এমনকি তারা বিয়ের পরে কোনো কাজও করে না। বিবাহ-পরবর্তী সময়ে সহিংসতা চালায় স্ত্রীর প্রতি তার পরিবার থেকে আরও টাকা বা সম্পত্তি এনে দেবার জন্য।

যৌতুক প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থা

- সমাজে অসম ক্ষমতার সম্পর্ক এবং জেন্ডার বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ করা
- পরিবারে মেয়েদের বোঝা হিসেবে বিবেচনা না করে তাকে সমানভাবে সব সুযোগ দেওয়া এবং মেয়ে ও ছেলেদের প্রতি ন্যায্য আচরণ করা
- মেয়েদের শিক্ষায় অধিক ব্যয় করা যেন তারা ভবিষ্যতে আয় করতে পারে
- নারীর জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা
- যুবাদের মধ্যে উচ্চাশার সৃষ্টি করা যেন তারা নিজে ভবিষ্যতের জন্য কিছু করে, নিজেদের যোগ্যতা বিচার করে
- সমাজের সবাইকে সচেতন হতে হবে এটি চিন্তা করে যে যৌতুক একটি অপরাধ এবং ক্ষতিকর চর্চা যা নির্মূল হওয়া উচিত
- নারী ও মেয়ের নিজেদের প্রতি সম্মান রাখতে হবে এবং যৌতুক না দেবার জন্য কঠোর হওয়া শিখতে হবে। নিজেদের মানুষ হিসেবে ভাবতে হবে, বাজারে কেনাবেচার জিনিস হিসেবে নয়
- স্ত্রীর পরিবার থেকে দেওয়া সম্পত্তি বা অর্থ নেওয়ার বদলে ছেলেদেরকে আত্মবিশ্বাস এবং নিজেদের যোগ্যতার ওপরে আস্থা রাখতে হবে
- মা-বাবাদের মেয়ের দক্ষতা ও যোগ্যতার ওপর আস্থা রাখতে হবে, স্বামীর ওপর নির্ভরশীল এবং সহিংসতার শিকার না হয়ে তারা যেন স্বাধীন জীবনযাপন করতে পারে
- বর্তমান আইনের যাচাই প্রয়োজন একে সমসাময়িক বা প্রয়োগযোগ্য করতে এবং আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে।

অনুগ্রহ করে দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত নারী ও মেয়েদের প্রতি যৌতুকসংক্রান্ত সহিংসতার খবরগুলো পড়ে শোনান যেন অংশগ্রহণকারীরা জানতে পারে এর ফলাফল এবং এর সাথে আলোচনার সংযোগ ঘটাতে পারে।

অধিবেশন ৪.৩ আর নয় শিশু কনে : রীতিকে চ্যালেঞ্জ করার এইতো সময়

উদ্দেশ্য

- বাল্যবিবাহের ফলাফল এবং কারণ সম্পর্কে সচেতন হওয়া
- যেসব রীতি বাল্যবিবাহ ঘটায় সেগুলোকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষেত্রগুলোকে চিহ্নিত করা।

পদ্ধতি

আলোচনা, দলীয় কাজ, গল্প বিশ্লেষণ

উপকরণ

ফ্লিপ কাগজ, মার্কার

সময়

৪৫ মিনিট

প্রক্রিয়া

- অংশগ্রহণকারীদের জানান যে, বাল্যবিবাহ বাংলাদেশের একটি সাধারণ সমস্যা, কারণ বাল্যবিবাহের প্রাদুর্ভাব অনেক বেশি। তাদের বলুন তারা হয়তো জানে কখন কোন বিয়েকে বাল্যবিবাহ বলা হয়। তারপর তাদের জিজ্ঞেস করুন তারা বাল্যবিবাহ সম্পর্কে কী জানে।
- অংশগ্রহণকারীদের তিনভাগে ভাগ হতে বলুন। তাদের ফ্লিপ কাগজ ও মার্কার দিন এবং তারা যা ভাবছে সেটা আঁকতে বলুন
  - দল ১ : বহু শিকড় ও বিস্তৃত শাখার একটি গাছ আঁকবে এবং তারা বাল্যবিবাহের কারণগুলো লিখবে শিকড়ে এবং ফলাফল লিখবে শাখায়
  - দল ২ : লিখবে বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে কে কে ভূমিকা রাখে
  - দল ৩ : কাজ করবে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে করণীয় কী তা নিয়ে।

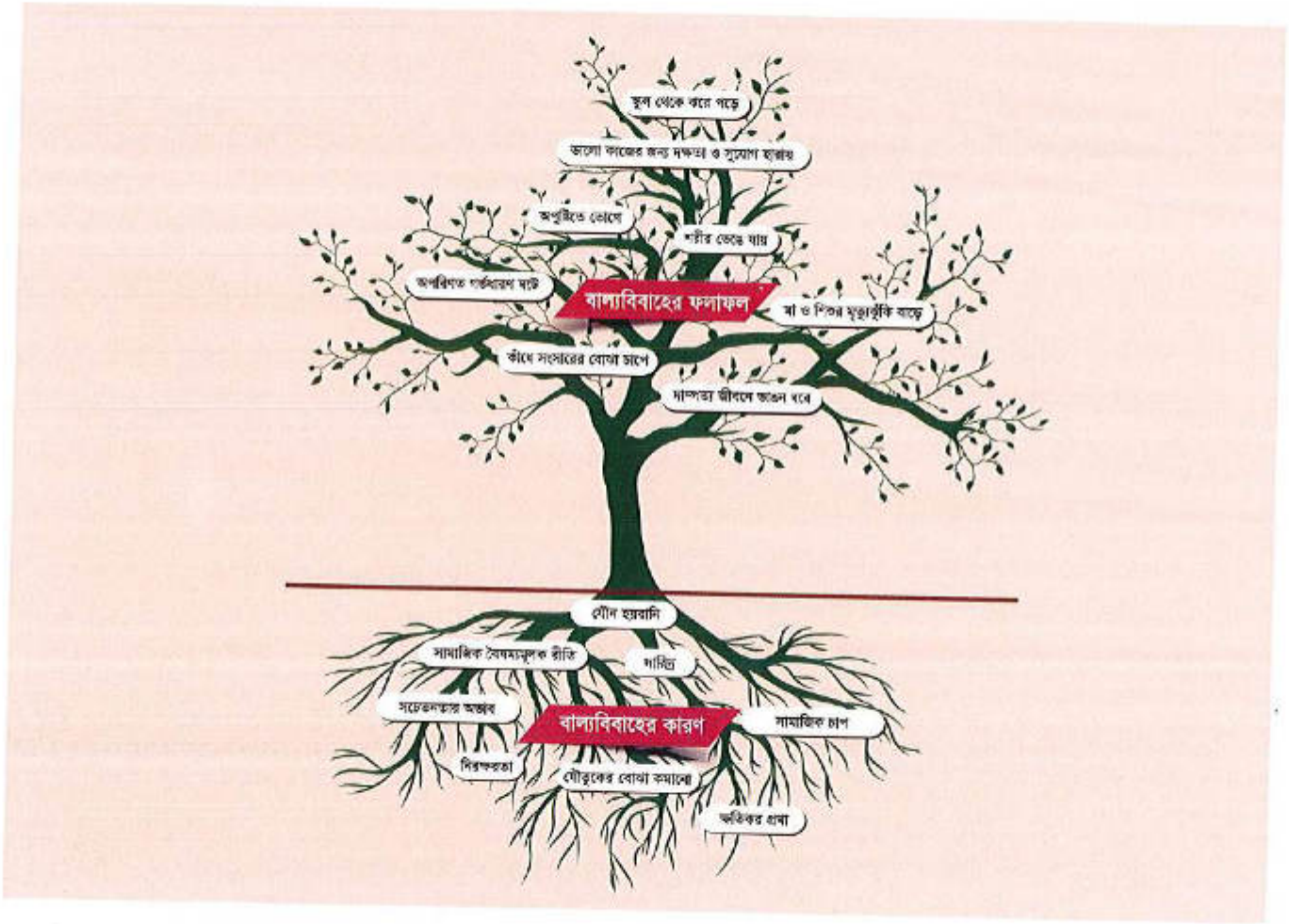

- দলীয় কাজ হয়ে যাবার পরে তিনটি দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। প্রতিটি দলের কাজের ওপর অন্য দল সাথে নিয়ে আলোচনা করুন

- একটি সত্যিকারের ঘটনা বলুন অংশগ্রহণকারীদের এবং আলোচনা করুন কীভাবে ও কেন একটি বাল্যবিবাহ হয়, কে ভূমিকা পালন করে এবং কীভাবে এই বিয়ে মেয়েটির জীবনে প্রভাব ফেলে। আরও আলোচনা করুন কীভাবে মেয়েটির জীবন আবার মোড় নেয় নতুন করে জীবন শুরু করার আশা নিয়ে

- বাল্যবিবাহ শিশু অধিকারের স্পষ্ট লঙ্ঘন, কারণ বিয়ের ফলে মেয়েশিশু তার পড়া চালিয়ে যেতে পারে না, তার শৈশব হারিয়ে যায় সেই সাথে তার স্বপ্ন উধাও হয়। বাল্যবিবাহের শিকার মেয়েরা একটা ভালো কাজের ও নিজেদের এবং পরিবারকে সাহায্য করার জন্য দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনের সুযোগ হারায়। তারা অল্পবয়সে গর্ভধারণের ঝুঁকিতে থাকে এবং নেতিবাচক স্বাস্থ্যগত, সামাজিক ফল ভোগ করে। পরিবারে ছোট হবার কারণে তাদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, চলাফেরার সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা থাকে না এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও তথ্যে তাদের প্রবেশ থাকে না। গর্ভধারণ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হয়, প্রসবকালে সন্তানের মা যে কিনা এখনও নিজেই একটা শিশু তার বিরাট ঝুঁকি থাকে জটিলতার কারণে প্রতিবন্ধী হয়ে পড়ার। যেমন- প্রসবজনিত ফিস্টুলা। সে ও তার শিশুটি দু'জনেই মারা যেতে পারে। মেয়েটির অসহায়ত্ব বাড়ে যখন সে নানান সহিংসতার শিকার হয় এবং শ্বশুরবাড়িতে প্রচুর কাজের চাপ সামলাতে হয়। স্বামীর সাথে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায় কারণ তার শারীরিক সৌন্দর্য চলে যায়। সে শ্বশুরবাড়িতে সম্পর্ক যা অনেক সময় জটিল হয় তা সামলাতে পারে না অপরিপক্কতার দরুণ। একজন বাল্যবিবাহিতার পক্ষে সবাইকে সমানভাবে যত্ন করা ঝামেলার; সে দিশাহারা থাকে কাকে যত্ন করবে তা নিয়ে; তার নিজের না যে শিশুটির জন্ম দিয়েছে তার?

- কিন্তু এমন কি হওয়া উচিত? যখন একটি মেয়েকে বিয়ে দেওয়া হয়, তখন আশা করা হয় যে সে বৈবাহিক সবসম্পর্ক ও দায়িত্ব চালিয়ে যাবে, কিন্তু একটি শিশু কী করে বড়দের মতো আচরণ করবে? একটি মেয়েকে তার স্বপ্নকে ধরে রেখে শক্তভাবে 'না' বলতে হবে বাল্যবিবাহকে। তাকে বুঝতে হবে কীভাবে নিজের জীবনের উন্নতি করা যায়। যদি তার কোনো ছেলের সাথে সম্পর্ক থাকে তবে তারা দু'জনে সম্পর্ক চালিয়ে যেতে পারে। পড়ালেখা চালিয়ে যখন এমন একটা সময় আসবে যে নিজেরাই রোজগার করতে পারবে, প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে তখন বিয়ে করতে পারে। ছেলেদের উচিত মেয়েদের পরিস্থিতি বোঝা এবং বিয়ে বাতিল না করে তারা একে অন্যকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারে যতদিন না তারা বিয়ের বৈধ বয়সে পৌঁছাচ্ছে। মেয়ে ও ছেলে উভয়কেই বাল্যবিবাহের মূল কারণ যে প্রচলিত রীতি সেগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে এবং সেগুলোকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে। যেমন মা-বাবারা তাদের মেয়েকে সহায়তা করে না লেখাপড়া চালিয়ে যেতে, বরং তারা মেয়েকে সুপাত্রে দান করতে চায় যে তার সমস্ত দায়িত্ব নেবে। তারপর একটি মেয়ের ওপর বাবার পরে স্বামীর আধিপত্যের কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়। কিন্তু কোনো মেয়েকে যদি লেখাপড়া চালিয়ে যাবার জন্য সহায়তা করা হয়, তার কর্মযোগ্যতা বাড়ে, রোজগার করে স্বাধীন জীবনযাপন করতে পারে। নিজের, মা-বাবা এবং পরিবারের ভালোর জন্য খরচ করতে পারে। বাল্যবিবাহ একটি অনেক বড় চাপ, কেননা এটি একটি মেয়ের লেখাপড়া আর ভবিষ্যতে অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই মেয়েদেরই দায়িত্ব জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা, স্বপ্ন দেখা বন্ধ না করা, বাল্যবিয়েকে 'না' বলা বা যদি বিয়ে হয়েই যায় তবে লেখাপড়া আর দক্ষতাকে আরও লালন করা

- সবারই জানা উচিত যে বাল্যবিবাহ একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন- ২০১৭ রয়েছে এবং এ আইন মোতাবেক মেয়েদের বৈধ বিয়ের বয়স ১৮ এবং ছেলেদের ২১। এই আইনে বাল্যবিবাহের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের (অভিভাবক থেকে শুরু করে কাজী পর্যন্ত) জন্য শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। তাদের অনধিক দুই বছর সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন ৬ মাসের জেল অথবা ৫০০০০ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে। জন্মের সময় জন্মনিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা উচিত। প্রতিটি মা-বাবার বাল্যবিবাহের খারাপ দিক সম্পর্কে জানা উচিত এবং মেয়ে সন্তানকে অবহেলা করা থেকে সরে আসা উচিত। তাদেরকে অন্যভাবে ভাবতে হবে। দারিদ্র্য এবং মেয়েদের অনিরাপত্তা বৈধ বয়সের আগে বিয়ে দেবার কারণ হতে পারে না। মা-বাবাদের উচিত ছেলেদের মতো করে মেয়েদেরও দেখা এবং স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষা দিয়ে বেড়ে ওঠার সুযোগ ও রোজগারে কোনোরকম বৈষম্য না করা। কমিউনিটিকে সক্রিয়ভাবে ব্যবস্থা নিতে হবে নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা বন্ধ করতে। সরকারের উচিত আইন বাস্তবায়নে নজর দিতে এবং আইনকে মেয়েদের জন্য সুবিধাজনক করতে। বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি ও প্রশাসনের দায়িত্বের ওপর তত্ত্বাবধান জোরদার ও প্রয়োগ করতে হবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে ভর্তুকি বাড়াতে হবে এবং আশ্রয়কেন্দ্র বানাতে হবে (বিশেষ করে অনাথ বা যাদের কোনো বৈধ অভিভাবক নেই তাদের জন্য) মেয়েদের বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করার জন্য।

কেস স্টোরি

প্রাইমারি স্কুলের পড়াশুনা শেষে আমি (জাহানারা- ছদ্মনাম) হাইস্কুলে ভর্তি হলাম। আমার অভিশপ্ত জীবনের সেই শুরু। আমি তখন ভালোবাসা কী জানতাম না। আমি ভাবতাম দুজন মানুষ যদি বাইরে ঘোরে বা অনেকক্ষণ কথা বলে তাহলে সেটাই প্রেম। ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময়ই এক ছেলের সাথে পরিচয় হয়। আমরা কথা বলতাম। আমার মা-বাবা তা জানতে পেরে আমার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। ষষ্ঠ শ্রেণির পর আমার পড়া বন্ধ হয়ে যায়। অনেক অনুরোধের পর আমি পরের বছর আরেকটি স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হই। আমি সপ্তম শ্রেণি শেষ করি এবং অষ্টম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হই। আমার বান্ধবী একটা ছেলেকে পছন্দ করত, আমরা সবাই বন্ধুর মতোই কথা বলতাম, হাসাহাসি আর মজা করতাম। একদিন ছেলেটা হঠাৎ আমাকে বলে- আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমিও তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ি। আমরা রোজ কথা বলতাম। আমরা একজন আরেকজনকে চিঠি লিখতাম, যা এখন আর কেউ লেখে না। আমি যখনকার কথা বলছি সেটা ছিল ২০১১ সাল।

আমার মা-বাবা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমাকে বকাবকি ও মারধর করে। এক ঈদের দিনে ওর সাথে ঘুরতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার ছোটভাই আমাদের একসাথে দেখে ফেলে এবং মা-বাবাকে বলে দেয়। মা-বাবা অনেক রেগে গিয়েছিলেন। বাসায় ফেরার পর আমাকে তারা অনেক মারে, সেই ঈদের দিনেও। এমনকি ব্লেড নিয়ে এসেছিলো আমার গাল কেটে দিতে, বটি নিয়েছিলো কোপ

দেওয়ার জন্য। এরপর থেকে তা নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। সেই ছেলেটির জন্য আমি জীবনে প্রচুর মার খেয়েছি। এমনকি মাথা ও পায়ে দুবার কোপও খেয়েছি। তবুও আমি তার সাথে কথা বলতাম। সত্যি কথা বলতে কি আমার পরিবারের কেউ আমায় ভালোবাসে না। আমার ভাইয়েরা অনেকবার আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলো।

একদিন আমরা দু'জনে পাশের বেড়িবাঁধের দিকে গিয়ে কথা বলছিলাম। এমন সময় পাশের একটি রাজনৈতিক দলের ক্লাবঘর থেকে কয়েকজন লোক আমাদের ঘিরে ধরে এবং খুবই খারাপ ব্যবহার করা শুরু করে। আমাদের গালিগালাজ করে এবং জোর করে তাদের অফিসে নিয়ে যায়। তারা খুবই রূঢ় ব্যবহার করছিল এবং এত বাজে আচরণ করছিল যা আমি বলতে পারব না। তারা আমাদের পরিচয় জানতে চায় এবং দেবার পরও বারবার অনেক টাকা চাইছিল। একপর্যায়ে আমাদের বাড়ির লোকদের খবর দেয়। আমাদের পরিবারের লোকেরা এলে তারা আবারও টাকা চাইতে থাকে এবং বলে যে টাকা না দিলে আমাদের বিয়ে পড়িয়ে দেবে। সেই ক্লাব ঘরের সামনে অনেক লোক জড়ো হয়েছিল কিন্তু কেউ কোনো প্রতিবাদ করেনি। তারপর সেখানেই আমাদেরকে বাধ্য হয়ে বিয়ে করতে হয়। আমি তখন মাত্র নবম শ্রেণিতে পড়ি। এই ঘটনার পরে আমি এক সপ্তাহ স্কুলে যাইনি। একদিন আমার এক বান্ধবী বাসায় এল এবং বলল যে, আমার শ্রেণিশিক্ষিকা ক্লাসে সবার সামনে আমাকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। বলেছেন যে আমার মতো মেয়েদের এমনই হওয়া উচিত। অনুপস্থিত সহপাঠীকে শিক্ষিকার দ্বারা এভাবে অপমানিত হতে দেখে ক্লাসের সকলে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।

এ ঘটনা শুনে আমি স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেই। আমার বাড়ির কেউ আমাকে স্কুলে যেতে বলে না আর। আমি আমার বাড়িতে থাকতাম, আর ছেলেটি তার নিজের বাড়িতে। তার মা এই বিয়ে মেনে নেননি এবং আমাকেও কোনোদিন গ্রহণ করেননি, কেননা আমাদের চাইতে তারা অর্থনৈতিকভাবে ভালো অবস্থানে ছিলেন। তাই ছেলেটি নিজের পড়া আর অন্যান্য কাজ চালিয়ে যেতে পারলেও, আমাকে ঘরে-বাইরে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছিল। আমার জীবন আর সহজ ছিল না, নিজের জীবনের নতুন বাস্তবতার সাথে খাপ খাওয়াতে এবং তার ও তার পরিবারের সাথে মানিয়ে নিতেও পারছিলাম না।

একদিন আমার সাথে বেসরকারি সংগঠন আরবান-এর এক কর্মীর দেখা হয়, আমি তাকে আমার কষ্টের কথা খুলে বলি যে, তিন বছর হলো আমার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু এখনও ছেলের পরিবার আমাকে মেনে নেয়নি। বর ও আমার পরিবার চায় আমি শ্বশুরবাড়ি গিয়ে সব দায়িত্ব নেই কিন্তু আমার শাশুড়ি একেবারেই এর বিরুদ্ধে। তারা যেহেতু আমার সাথে ছেলের বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন, তাই তারা কোনোদিনও আমাকে ছেলের বউ হিসেবে মেনে নেননি। তারা মনে করতেন তাদের পরিবারের জন্য এটি লজ্জাজনক। তাই তারা আমাকে তাদের বাড়িতে কোনোদিনই স্বাগত জানাননি, ফলে আমার জন্য তাদের বাড়ি যাওয়া ছিলো অসম্ভব। এছাড়াও, ওই সময়ে আমি এমন দায়িত্ব নেবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আমার মানসিকতাও এমন ছিল না, তাই আমিও মানতে পারিনি। আমি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চাইছিলাম পড়া শেষ করবার জন্য। আমার মা আমাকে বাড়ি থেকে বের হতে দিতেন না, তাই আমার পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটছিল। ছেলেটির সাথেও সম্পর্ক দিন দিন খারাপ হচ্ছিল আর আমি বিষণ্নতায় ডুবে যাচ্ছিলাম। এই সময় আরবান-এর একজন এনজিওকর্মী আমার পরিবারের সাথে কথা বলেন এবং তাদেরকে আমার বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কে বোঝাতে সক্ষম হন, তিনি আমার শিক্ষার ব্যাপারে তাদের অনুমতিও নিশ্চিত করেন। অনেক তর্কাতর্কির পরে আমার পরিবার সম্মত হয় এবং আমাদের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে।

মেয়েটি এখন আবার লেখাপড়া করছে সেই এনজিওর সহায়তায় এবং টিডিএইচ ইতালিয়ার কিশোরী-কিশোরদের জন্য কর্মসূচিতে মাঠপর্যায়ের গবেষণা করছে, কিশোরী-কিশোরদের জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা সেশনে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে সামান্য আয় করছে। সে বাল্যবিবাহে আক্রান্তদের কাছে পথিকৃৎ, কারণ তার কাহিনী থেকে দেখা গেছে যে যদি কোনো মেয়ে বাঁচতে চায়, তার ইচ্ছা ও আশা পূরণ করতে চায়, তাহলে তার জন্য সুযোগ আছে এমনকি অনেক অল্পবয়সে বিয়ে হলেও।

[পিএআর থেকে সংকলিত সত্য কাহিনি (রিসার্চ ইনিসিয়েটিভস বাংলাদেশ ২০১৭)]

অনুগ্রহ করে অংশগ্রহণকারীদের দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত (৮ নভেম্বর ২০১৬) শারমিনের কাহিনীটি বলুন কীভাবে সে বাল্যবিবাহ থেকে রেহাই পেয়েছিল। বলুন তার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি অর্জনের ঘটনাটি (৮ এপ্রিল ২০১৭)।

দৈনিক প্রথম আলো ৮ নভেম্বর ২০১৬

সাহসী এক শারমিনের কথা

এম জসীম উদ্দীন, বরিশাল ●

'সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়লে শিউরে উঠি। বয়স কম হলেও এটুকু বুঝতে পারছিলাম, আমার ওপর যা হচ্ছে তা পুরোপুরি অন্যায়। আমার মায়ের ইচ্ছায়, পৃষ্ঠপোষকতায় সেই অন্যায় সিদ্ধান্ত আমার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। একে তো আমার বিয়ের বয়স হয়নি। হঠাৎ মা একদিন বললেন, "এই ছেলে তোর স্বামী, এখন থেকে পড়াশোনা বন্ধ করে ওর সঙ্গে ঘর-সংসার করতে হবে তোকে।" নিছক কৌতুক করে তিনি এটা বলেননি। সত্যি সত্যিই বলেছিলেন। সে মতো কাজও করলেন। আমাকে ওই ছেলের সঙ্গে একটি ঘরে থাকার নির্দেশ দিলেন। এমনকি ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে আটকেও রাখলেন। কিন্তু আমার তো বিয়ে হয়নি। বিয়ের বয়সও হয়নি। বিয়ের আয়োজন হয়নি, কবুল বলিনি, কোনো কাগজে সইও করিনি। কীভাবে এটা হলো। এমন পরিস্থিতিতে নিজেকে খুব অসহায় লাগছিল।' কথাগুলো শারমিন আক্তারের, যার বয়স মাত্র ১৪। সে ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলার পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণির ছাত্রী।

৭ নভেম্বর যখন কথা হচ্ছিল শারমিনের সঙ্গে, তখন তার এই অভিজ্ঞতার কথা যেন থামে না। সে বলে, 'আমি বিয়ের ব্যাপারে শুরুতেই মাকে না করে দিই। কিন্তু মা কিছুতেই এটা মানেননি বরং চাপ প্রয়োগ করেছেন। শারীরিক নির্যাতন করেছেন। এমন পরিস্থিতিতে আমি কী করব, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। বাবা বিদেশে থাকেন। কার কাছে যাব, কী করব, সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। একবার চিন্তা করি আত্মহনন করে এই নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্ত হব। আবার ভাবি, এটাও হবে হেরে যাওয়া।'

কিন্তু হেরে গেলে তো চলবে না। তাই এই চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে শারমিন। 'সিদ্ধান্ত নিই, যে করেই হোক আমাকে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। এরপর নিজে থেকেই সাহসী হলাম। একদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে এক সহপাঠীকে বিষয়টি জানাই। এরপর চলে যাই সরাসরি থানায়। মা আর ওই ছেলের বিরুদ্ধে মামলা করি।'

ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলার সত্যনগর গ্রামের কবির হোসেনের মেয়ে শারমিন। মা গোলেনুর বেগম। কবির হোসেন সৌদিপ্রবাসী হওয়ায় শারমিনকে নিয়ে তার মা গোলেনুর রাজাপুর শহরের থানা সড়কে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন।

২০১৫ সালের জুলাই মাসের কথা। শারমিন তখন রাজাপুর পাইলট বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী। মা গোলেনুর এই বয়সেই শারমিনের বিয়ে ঠিক করেন প্রতিবেশী স্বপন খলিফার (৩২) সঙ্গে। শারমিন মায়ের এই সিদ্ধান্তে রাজি না হওয়ায় নানাভাবে চাপ প্রয়োগ করেন। এতেও টলেনি সে। পরে শুরু হয় শারীরিক নির্যাতন। এতেও রাজি না হওয়ায় একদিন ওই ছেলেকে (স্বপন) বাড়িতে এনে শারমিনকে তার মা বলে দেন, 'এই ছেলে তোর স্বামী। ওর সঙ্গে তোর বিয়ে হয়েছে। এখন ওর সঙ্গে ঘর-সংসার করতে হবে।' মায়ের কথা শুনে শারমিনের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। ক্ষুলে আসা বন্ধ করে বাসার মধ্যে আটকে রাখা হলো তাকে। বাইরে গেলেও ছিল কড়া নজরদারি।

নিজের বাল্যবিবাহ নিজেই ঠেকিয়েছে শারমিন আক্তার ● ছবি : প্রথম আলো

২০১৫ সালের ৬ আগস্ট। শারমিনকে চিকিৎসা করানোর কথা বলে তার মা খুলনায় নিয়ে যান। সেখানে গিয়ে দূর সম্পর্কের এক মামার বাড়িতে তোলেন। সেখানে আগে থেকেই ছিলেন স্বপন। রাতে শারমিনকে ওই বাসায় স্বপন খলিফার সঙ্গে এক কক্ষে থাকার জন্য তার মা চাপ দিচ্ছিলেন। তাতে সম্মত না হওয়ায় মারধর করে তাকে (শারমিন) জোর করে স্বপনের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা আটকে দেন। ৭ আগস্ট সকালে শারমিন ওই বাসা থেকে কৌশলে পালিয়ে রাজাপুরের উদ্দেশে রওনা দেয়। স্বপন ও তাঁর লোকজন শারমিনের পিছু নেন। পিরোজপুরে এসে কথিত স্বামী স্বপন ও তাঁর লোকজন শারমিনকে ধরে ফেলেন এবং বাস থেকে নামিয়ে রাজাপুরে নিয়ে যান। এখানে এনে শারমিনদের থানা সড়কের বাড়িতে আটকে রাখেন।

১৬ আগস্ট এই বন্দিদশা থেকে পালিয়ে সহপাঠী নাদিরা আক্তারের বাড়িতে যায় এবং সব খুলে বলে। এরপর দুজনে মিলে স্থানীয় সাংবাদিকদের সহায়তায় সরাসরি ওই দিন রাতে রাজাপুর থানায় হাজির হয়। মা ও কথিত স্বামীর বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করে। পরে পুলিশ শারমিনের মা গোলেনুর বেগম ও কথিত স্বামী স্বপন খলিফাকে গ্রেপ্তার করে। আর তাকে ঝালকাঠির জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল-১-এর বিচারক মো. শফিকুল করিম তার দাদি দেলোয়ারা বেগমের জিম্মায় দেন। এরপর থেকে সে দাদির কাছে থেকেই পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে। শারমিনের এই সাহসিকতার জন্য স্বর্ণকিশোরী ফাউন্ডেশন ২০১৫ সালে তাকে স্বর্ণকিশোরী পুরস্কার দেয়।

এখন লক্ষ্য কী? শারমিন দৃঢ়তার সঙ্গে বলে, 'আমি পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চাই। আইনজীবী হওয়ার ইচ্ছা আছে। আর বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রচার-প্রচারণা এবং সচেতনতা বাড়ানোর জন্য কাজ করতে চাই।'

তার দাদি দেলোয়ারা বেগম এখন শারমিনকে নিয়ে এই বাড়িতেই থাকেন। সবুজ ছায়াঘেরা সত্যনগর গ্রামে তাদের বাড়িটা বেশ নির্জন-নিরিবিলি। দেলোয়ারা বেগম বললেন, 'ওরে নিয়া খুব চিন্তা আমার। প্রতিদিন স্কুলে নিয়া যাই, আবার সঙ্গে নিয়া আসি। বাইরে কোথাও গেলে সঙ্গে যাই। ওর জীবনটা ধ্বংসের মুখে ফেলে দিয়েছিল ওর মা। খুব সাহস করে একাই এর প্রতিবাদ করেছে। শত বাধা-বিপত্তির মধ্যেও নিজের সিদ্ধান্ত পাল্টায়নি। এখন সবাই ওকে নিয়ে গর্ব করে। আমরাও গর্বিত।'

শারমিনকে সাহায্য করেছিল সহপাঠী নাদিরা আক্তার। সে বলল, 'ভালো লাগছে ওর দুঃসময়ে আমি পাশে ছিলাম।'

সত্যনগর গ্রামের ছোট খালের পাড় ধরে ফেরার সময় পশ্চিমাকাশে গোধূলির রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়ছিল। কুয়াশায় ধূসর হয়ে উঠছিল সবুজ গ্রাম। তখনো কানে বাজছিল শারমিনের সাহসিকতার গল্প।

দৈনিক প্রথম আলো ৮ এপ্রিল ২০১৭

পুরস্কার দেশের সব মেয়ের জন্য

যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারন্যাশনাল উইমেন অব কারেজ পুরস্কার পেয়ে শারমিন

জিয়াবুল করিম ●

বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ পদ্ধতিও যেন না থাকে—এই প্রত্যয় বালিকা শারমিনের। নিজের বাল্যবিবাহ ঠেকিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ইন্টারন্যাশনাল উইমেন অব কারেজ (আইডব্লিউওসি) ২০১৭' পুরস্কার পাওয়া বাংলাদেশের ঝালকাঠির মেয়ে শারমিন বলেছে, এই পুরস্কার শুধু তার নিজের নয়, পুরস্কারটি দেশের সব মেয়ের জন্য। সে চায়, অন্য মেয়েরাও তার মতো বাল্যবিবাহের প্রতিবাদ করুক।

বাংলাদেশ সময় গত ২৯ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পের হাত থেকে পুরস্কারটি গ্রহণ করে এসএসসির ফলের অপেক্ষায় থাকা শারমিন। গত বৃহস্পতিবার সে দেশে ফেরে। গতকাল শুক্রবার রাজধানীর উত্তরার একটি রেস্তোরাঁয় কথা হয় শারমিনের সঙ্গে। তখন সে বলেছে পুরস্কার পাওয়ার পর নিজের অনুভূতি, চাওয়া, ভবিষ্যৎ চিন্তাভাবনাসহ নানা কিছু। শারমিন বলে, তার এই পুরস্কার পাওয়ার বিষয়ে প্রথম আলোর প্রতিবেদন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

গত বছর ৮ নভেম্বর প্রথম আলোর নারীমঞ্চ পাতায় 'সাহসী এক শারমিনের কথা' শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এতে শারমিনের বাল্যবিবাহ ঠেকিয়ে দেওয়ার ঘটনা তুলে ধরা হয়েছিল। এরপর গত বছর প্রথম আলোর ১৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে 'অভিনায়ক ও নায়কেরা' নামে একটি প্রামাণ্যচিত্রে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজার প্রিয় চার নায়কের সংগ্রামী জীবনের ঘটনা তুলে ধরা হয়। এই চার নায়কের একজন ছিল শারমিন। রেদওয়ান রনি এই প্রামাণ্যচিত্রটি নির্মাণ করেন। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রামাণ্যচিত্রটি দেখানো হয়। পরে প্রামাণ্যচিত্রটি বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং টেলিভিশন চ্যানেলে দেখানো হয়।

রাজধানীর উত্তরার একটি রেস্তোরাঁয় গতকাল কথা হয় শারমিন আক্তারের সঙ্গে ● আবদুস সালাম

শারমিন আক্তার ২০১৫ সালে নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় তার মা তাকে জোর করে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। বিয়ে বন্ধ করে সে থানায় গিয়ে পুলিশের সহযোগিতায় মা এবং যার সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে মামলা করে। এবার শারমিন এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। যখন মায়ের বিরুদ্ধে মামলা করতে যাচ্ছিল, তখন পুরস্কার, স্বীকৃতি, পরিচিতি—এসব কোনো কিছুই ছোট্ট শারমিনের মাথায় ছিল না। ভালো করে বুঝেও উঠতে পারেনি, আসলে সে কত বড় সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে। তখন শুধু মনে হচ্ছিল, তার প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে। এখনই সে বিয়ে করতে চায় না। পড়ালেখা চালিয়ে যেতে চায়।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পের হাত থেকে গত ২৯ মার্চ পুরস্কার নেয় বাংলাদেশের শারমিন আক্তার ● ছবি : সংগৃহীত

পুরস্কার দেশের সব মেয়ের জন্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পুরস্কার পাওয়ার অনুভূতি জানাতে গিয়ে শারমিন প্রথম আলোকে বলে, 'এটা শুধু আমার জন্য না, আমার দেশের সব মেয়ের জন্য। আমি চাই ওরা আমার মতো কিছু করুক, প্রতিবাদ করুক।'

শারমিন কল্পনাও করতে পারেনি এ ধরনের একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাবে। সে চায় তার এই ঘটনা সবাই জানুক। তবে এটি আত্মপ্রচারের জন্য নয়। প্রতিরোধ শক্তিশালী করার জন্য। যেন বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে মেয়েরাই এগিয়ে আসে। শারমিনের চাওয়া—বাল্যবিবাহ শব্দটিও বাংলাদেশে যেন না থাকে। সে প্রথম আলোকে বলছিল, 'বাংলাদেশের মেয়েদের জন্য আমার একটাই মেসেজ—ওরা যেন নিজেদের অসহায় মনে না করে, নিজের প্রতি বিশ্বাস থাকে, সাহস থাকে। তাহলে তারা নিজেদের বাল্যবিবাহ আটকাতে পারবে। অন্য পাঁচটি মেয়েকে সাহায্য করতে পারবে। আমি চাই, ওরা আমার মতো কিছু করুক। এ দেশে বাল্যবিবাহ শব্দটি শেষ হয়ে যাক।'

সম্প্রতি পাস হওয়া বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন বিষয়ে জানতে চাইলে শারমিন বলে, আইন হয়েছে তা সে জানে। তবে এই আইনের বিষয়ে কিছু বলতে চায় না।

শারমিন তার লেখাপড়া চালিয়ে যেতে চায়। স্বপ্ন—বড় হয়ে আইনজীবী হবে। সে সব সময় চেষ্টা করবে মেয়েদের সাহায্য করতে। বিশেষ করে বাল্যবিবাহ ঠেকানোর ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। এখন এসএসসি পরীক্ষার ফলের অপেক্ষায় আছে। আশা করছে জিপিএ-৫ পাবে। ফল ভালো হলে ঢাকায় এসে কলেজে পড়তে চায়।

শারমিন জানায়, যুক্তরাষ্ট্র তাকে বলেছে, যেকোনো ধরনের সহায়তা তারা তাকে করবে। শারমিন যদি বাংলাদেশে থাকতে নিরাপদবোধ না করে, তাহলে সে যুক্তরাষ্ট্রেও থাকতে পারে। জবাবে শারমিন বলেছে, বাংলাদেশেই থাকবে। বাংলাদেশে থেকে পড়ালেখা করবে।

শারমিন বলে, যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে যখন সে দেশের ফার্স্ট লেডির হাত থেকে পুরস্কারটি নেয়, তখন তার অনেক ভয় করছিল। কিন্তু ফার্স্ট লেডি তার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করেছেন। সাহস দিয়েছেন। পরে সে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন দর্শনীয় জায়গা ঘুরেছে। একটি বিদ্যালয়েও তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে। বিদ্যালয়ের মেয়েরা তার কাছে জানতে চেয়েছে, সে যুক্তরাষ্ট্রের মেয়েদের বিপদ হলে সাহায্য করবে কি না। সে বলেছে, করবে।

এখন আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও পরিচিত ঝালকাঠির এক অখ্যাত এক বালিকা শারমিন। কিন্তু এখনো সে শিউরে ওঠে ওই দিনগুলোর কথা মনে হলে। ২০১৫ সালের নিজের বাল্যবিবাহ ঠেকানোর ঘটনা বর্ণনা করে শারমিন জানায়, এখনো তার মায়ের বিরুদ্ধে করা মামলাটি চলছে। মায়ের সঙ্গে এখন তার কোনো সম্পর্ক নেই। তার বাবা, দাদি, ফুফু—সবাই তার সঙ্গে আছেন। এখন সে ঢাকায় ফুফুর বাসায় আছেন।

শারমিন বলে, পুরস্কার ঘোষণার পরও সে বুঝতে পারছিল না এর গুরুত্ব। যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পর অন্য আরও ১২টি দেশের মেয়েদের সঙ্গে যখন আন্তর্জাতিক এই পুরস্কারটি নেয়, তখন মনের ভেতর গর্ব অনুভব হচ্ছিল।

ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলার সাতুরিয়া গ্রামের সৌদিপ্রবাসী কবির হোসেনের মেয়ে শারমিন। তার মায়ের নাম সোহেলনুর বেগম। শারমিন তখন রাজাপুর পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী। শারমিনকে কিছু না জানিয়েই মা তার বিয়ে ঠিক করেন প্রতিবেশী স্বপন খলিফার (৩২) সঙ্গে। এই বিয়েতে রাজি না হওয়ায় নানাভাবে চাপ ও শারীরিক নির্যাতন নেমে এসেছিল তার ওপর। এক রাতে স্বপনকে ঘরে এনে শারমিনকে তার মা বলেন, স্বপন শারমিনের স্বামী। শারমিন গতকাল সে ঘটনার বর্ণনায় বলছিল, '...এই ছেলে তোর হাসব্যান্ড। আমি বলি, আমি তো জানি না। ওই রাতে ওই ছেলে আর আমার আম্মু আমাকে অনেক মারধর করে।'

প্রসঙ্গত, ২০০৭ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিশ্বের ৬০টির বেশি দেশের ১০০ জনের বেশি নারীকে উইমেন অব কারেজ সম্মানে ভূষিত করে। যাঁরা শান্তি, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার, জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে ব্যতিক্রমী সাহসিকতা এবং অনেক সময়ই জীবনের ঝুঁকি প্রদর্শন করে, তাঁদের এই পুরস্কার দেওয়া হয়। বাংলাদেশ ছাড়াও এ বছর বতসোয়ানা, কলম্বিয়া, কঙ্গো, ইরাক, লাইবেরিয়া, পাপুয়া নিউগিনি, পেরু, শ্রীলঙ্কা, সিরিয়া, তুরস্ক, ভিয়েতনাম ও ইয়েমেনের ১২ জন নারী নিজ নিজ কাজের জন্য ইন্টারন্যাশনাল উইমেন অব কারেজ পুরস্কার পেয়েছেন।

শারমিন জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার নেওয়ার কথা ছিল। তিনি দেশের বাইরে থাকায় ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প পুরস্কার তুলে দেন।

অধিবেশন ৪.৪ নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতার চক্র

উদ্দেশ্য

- কীভাবে মেয়েরা তাদের সারাজীবনে সহিংসতার শিকার হয় বৈষম্যমূলক সামাজিক রীতির কারণে তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা
- আগের অধিবেশনগুলোর সংক্ষিপ্ত পুনঃউপস্থাপন

পদ্ধতি

আলোচনা, দলীয় কাজ

উপকরণ

ফ্লিপ কাগজ, মার্কার

সময়

৪৫ মিনিট

প্রক্রিয়া

- অংশগ্রহণকারীদের বলুন আমরা সেশনের প্রায় শেষপ্রান্তে এসে গেছি। আজকে অংশগ্রহণকারীরা একটি মেয়ে বা নারীর জীবনচক্র আঁকবে এবং দেখাবে যে কীভাবে সে সারাজীবন ধরে সহিংসতার মুখোমুখি হয়; তাদের ছবির ওপর ভিত্তি করে তারা একটি মেয়ে বা নারীর জীবন নিয়ে বলবে গল্পের মতো করে। এজন্য তাদের চারটি দলে ভাগ হতে হবে। প্রতিটি দলকে কাগজ এবং কলম দেওয়া হবে ছবি আঁকার জন্য। তারা কাজ করার জন্য ১৫ মিনিট সময় পাবে

(তাদের আভাস দিন পারিবারিক সহিংসতা এবং ঘরে ও বাইরের সহিংসতাকে তাদের কাজে যোগ করতে। তারা সব ধরনের সহিংসতাকে বিবেচনা করবে- কন্যাভ্রূণ হত্যা থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত, কন্যাশিশুর গর্ভে থাকা থেকে শুরু করে তাদের সমগ্র জীবন। গল্পে তারা সব চরিত্রই রাখবে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহিংসতা ঘটায়, ব্যক্তি স্তর থেকে রাষ্ট্র।)

- দলীয় কাজের পরে প্রতিটি দল সকলের সামনে উপস্থাপনা করবে। উপস্থাপনায় সহায়তা করুন যেন শিক্ষণ সকলের মধ্যে বিনিময় হয় এবং প্রতিটি দল বলার জন্য সমান সময় পায়

- শেষে তাদের বলুন সব নারী বা মেয়ে একই রকম বা একই বয়সে সব ধরনের সহিংসতার মধ্য দিয়ে যায় না। প্রতিটি মানুষ তার জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রকম সহিংসতার মুখোমুখি হয়। এর মানে এই নয় যে, পুরুষ ও ছেলেরা সহিংসতার মুখোমুখি হয় না কোনোদিন কোনো মেয়ে বা নারীর দ্বারা। তবে, ছেলেদের সহিংসতার ঘটনা এবং জীবনের অভিজ্ঞতা নারী ও মেয়েদের অভিজ্ঞতার চাইতে অনেক ভিন্ন। নারীবিরোধী সামাজিক নিয়ম বেশিরভাগই সৃষ্ট, রক্ষিত এবং নিয়ন্ত্রিত পুরুষের দ্বারা। এসব জেন্ডার রীতি নারীদের ব্যক্তিগত ও জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সহিংসতার চক্রে ঘোরে। সবাই, বিশেষ করে ছেলে ও পুরুষদের চিন্তা করতে হবে যে রীতিগুলো তাদের আচরণের এমন রূপ দিয়েছে সেগুলো নিয়ে; সহিংসতা বন্ধ করতে তাদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে, বদলাতে হবে চিরাচরিত অচরণগুলো, তাদেরকে শিখতে হবে যে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার, ক্ষমতা ও স্বাধীনতা রয়েছে

- প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকে স্ক্র্যাপ খাতায় বাড়িতে সহিংসতামুক্ত একটি জীবনের ছবি আঁকতে বলুন এবং তার একটি নাম দিতে বলুন।

অধিবেশন ৪.৫ জীবনের যাত্রায় একে-অপরের সহায়তা করা (উপসংহার)

উদ্দেশ্য

- জীবনের প্রত্যাশা সম্পর্কে জানা
- একে অপরের প্রত্যাশা সম্পর্কে জানা
- কীভাবে একজন আরেকজনকে জীবনযাত্রায় সহায়তা করতে পারে তা চিহ্নিত করা।

পদ্ধতি

খেলা, দলীয় কাজ

উপকরণ

ফ্লিপ কাগজ, মার্কার, ভিপ কার্ড

সময়

৪৫ মিনিট

প্রক্রিয়া

- অংগ্রহণকারীদের বলুন আমরা অধিবেশনের শেষপর্যায়ে পৌঁছে গেছি। তাদের ধন্যবাদ দিন সমস্ত কার্যক্রমে সহযোগিতা, সময় এবং সাহায্যের জন্য। তাদের নিচের নির্দেশগুলো দিয়ে আজকের কাজের সূচনা করুন

কাজ ১ : গোল হয়ে দাঁড়াতে হবে। বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে প্রতিটি অংশগ্রহণকারী তার জীবনের প্রত্যাশা বলবে (মাত্র একটি)। সহায়ক থেকে শুরু হয়ে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরবে

- সবার ঘোরা হয়ে গেলে তাদের বলুন যে সেক্স, সংস্কৃতি, শ্রেণি নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিরই জীবনে প্রত্যাশা আছে এবং কেউই অন্যের সাহায্য ছাড়া বাঁচতে পারে না। আমরা যদি নিজের প্রত্যাশার দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে প্রত্যাশা পূরণ করার জন্য অন্য মানুষের সাহায্য আমাদের দরকার। সহায়তা ও সহযোগিতা পেতে হলে ব্যক্তিকে অন্যের প্রতি সহিংস আচরণ থেকে দূরে থাকতে হবে

কাজ ২ : অংশগ্রহণকারীদের দু'টি ভাগে ভাগ করুন, একটি মেয়ে এবং আরেকটি ছেলেদের। তাদেরকে ফ্লিপ কাগজ এবং কলম/মার্কার দিন। মেয়েদের দলকে বলুন কাগজে লিখতে তারা ছেলে/পুরুষদের কাছে তাদের প্রত্যাশা পূরণে সহায়তার জন্য কী ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি আশা করে। ছেলেরাও একই জিনিস লিখবে মেয়েদের উদ্দেশ্য করে। দলীয় কাজ শেষ হয়ে গেলে তা বৃহত্তর দলে উপস্থাপন করা হবে

- দলীয় কাজ শেষ হবার পরে তাদের বলুন যখন পারস্পরিক প্রত্যাশাকে সম্মান করা হবে এবং মূল্য দেওয়া হবে তখন মেয়ে/নারী এবং ছেলে/পুরুষরা একে অপরের জন্য সহায়ক হতে পারবে। আরও বলুন যে যারা জেন্ডার রীতির কারণে জীবনে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে তাদের জন্য সহায়তা ও পরামর্শ সেবার ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে সমাজের সবাই উপকৃত হবে। মনে রাখতে হবে সহিংসতা কোনো ইতিবাচক বা শান্তিপূর্ণ সমাধান দিতে পারবে না। সহিংসতা ও বৈষম্য সবসময়ই একটি উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে এবং এর পরিণতি হয় ভাঙার, গড়ার নয়।

কাজ ৩ : প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকে একটি করে কার্ড দিন। তারা ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে নিচের প্রশ্ন তিনটির উত্তর দেবে-

১. জেন্ডার শিক্ষণ সেশনগুলো থেকে কী শিখেছে? (অন্তত একটি)

২. কোন বিশেষ জেন্ডার রীতিকে তার দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে?

৩. জেন্ডার রীতিকে চ্যালেঞ্জ করায় তার ভূমিকা কী হবে? সে কীভাবে রীতিকে চ্যালেঞ্জ করবে?

- যখন কাজ শেষ হয়ে যাবে, কার্ডগুলো তাদের থেকে নিয়ে নিন। তাদের বলুন যে তারা এখন কিশোরী-কিশোর। যারা বড়দের কাছ থেকে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় দৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতি শিখছে এবং আত্মস্থ করছে তাই তারা এখন অবৈষম্যমূলক চিন্তার ভিত্তিতে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিকে যথাযথ জ্ঞান, বিচার-বিবেচনা এবং যুক্তি দিয়ে তৈরির ঠিক সময়টিতে আছে। তারা এখন বৈষম্যহীন চিন্তার ভিত্তিতে মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমতা, ন্যায্য এবং সুবিচারের আদর্শকে সম্মান জানিয়ে জেন্ডার রীতিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে

- তাদের মনে রাখতে বলুন যে নারী/মেয়েদের সবসময়ে নিজেদের মধ্যে নিজেদের অধিকার নিয়ে লড়াই করার শক্তির সন্ধান করতে হবে। সামাজিক অবস্থা যা-ই হোক না কেন সমাজের মূলে নিহিত রীতি ও বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ ও জয় করার জন্য তাদের নিজেদের পথ বের করতে হবে। তাদেরকে সবসময় তৈরি থাকতে হবে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়াতে হবে নিজেদের মধ্যে প্রতিদিনকার বৈষম্যকে মোকাবেলা করার এবং সমাজে নিজেদের স্থান করে নেওয়ার জন্য। এই যুদ্ধে কেউই জয়ী হবে না যদি না নিজেদের প্রতি বিশ্বাস না থাকে এবং নিজেকে না মূল্য দেয়। মানুষ হিসেবে তাদের অধিকারগুলোকে না জানে। অন্য কেউ তার হয়ে লড়াই করতে পারবে না। তাদেরকেই যুদ্ধক্ষেত্রে নামতে হবে। পথ যত দীর্ঘই হোক না কেন, তারা বন্ধু খুঁজে পাবে। যদি কোনো মেয়ে নিজের ভেতর থেকে সাহস না পায় তবে এমন কারো থেকে সাহায্য নিতে পারে যাকে সে বিশ্বাস করে। তাদের যেমন সহায়তা দরকার, তেমনটি অনেক মানুষ, সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থা ও পেশাজীবী রয়েছে যারা সহায়তা দেয়। যদিও বস্তির কিশোরী-কিশোররা তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হয়, তবে অনেক সংস্থা আছে যারা এসব এলাকায় কাজ করে, যারা কিশোরী-কিশোর ও শিশুসহ বস্তির মানুষদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে থাকে

- তাদের ধন্যবাদ দিন এই যাত্রায় আপনার সাথে থাকবার জন্য। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন এবং আশা প্রকাশ করুন এই বলে যে, তাদের ভবিষ্যতে ক্ষমতা ও সমতা প্রতিষ্ঠা করতে, নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মগঠনে তারা এই শিক্ষণ প্রয়োগ করবে।

তথ্যনির্দেশ

Akhter, N. & Sondhya, YF. (2013) "Nutritional status of adolescents in Bangladesh: Comparison of severe thinness status of a low–income family's adolescents between urban and rural Bangladesh", Journal of education and health promotion, vol, 2, no. 27 [Online], Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24083277 [Accessed: 11 August, 2016]

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) & Ministry of Planning. (2015) Labour Force Survey- Bangladesh 2013, BBS & Ministry of Planning, Dhaka

CORO for Literacy. (2008) "Sakhi Saheli" – Promoting Gender Equity and Empowering Young Women, A Training Manual", CORO for Literacy [Online], Available: http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/horizons/India_SakhiSaheli_Eng.pdf [Accessed: 19 April 2017]

Countrymeters. (2017) Bangladesh Population, Countrymeters [Online], Available: http://countrymeters.info/en/Bangladesh[Accessed: 2 April, 2017]

Del Franco, N. (2012) Negotiating Adolescence in Rural Bangladesh, A journey through school, love and marriage, Zubaan Books, New Delhi

EngenderHealth. (2006) Engaging Men as Partners to Reduce Gender Based Violence: Manual for community workers, EngenderHealth [Online], Available: https://www.engenderhealth.org/files/pubs/localized/india/gbv_manual.pdf [Accessed: 19 April 2017]

Government of Bangladesh (GoB), Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) and United Nations Children's Fund (UNICEF) (2015) Multiple Indicator Cluster Survey 2012-2013: Progotir Pathey, GoB, BBS and UNICEF, Bangladesh

Haq, M. N. (2007) "Adolescents of Bangladesh" in International Encyclopedia of Adolescents, J. J. Arnett (ed), Routledge Taylor and Francis, London [Online], Available: http://www.tdi-bd.org/aricles_presentations/Adolescents%20of%20Bangladesh.pdf [Accessed: 11 August 2016]

Krug, E. G., Dahlberg, L. L., Mercy, J. A., Zwi, A. B. & Lozano, (eds) (2002) World Report on Violence and Health [Online], Available: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42495/1/9241545615_eng.pdf [Accessed: 19 April 2017]

Medland, D. (2016) "Today's Gender Reality in Statistics, Or Making Leadership Attractive to Women", Forbes [Online], Available: http://www.forbes.com/sites/dinamedland/2016/03/07/todays-gender-reality-in-statistics-or-making-leadership-attractive-to-women/#272f1b346255 [Accessed: 28 September 2016]

Ministry of Gender and Family Promotion, Republic of Rwanda. (2011) Gender Based Violence Training Module, Ministry of Gender and Family Promotion, Republic of Rwanda.

Parker, R. G. (2007) "Sexuality, Health, and Human Rights", American Journal of Public Health, vol. 97 no. 6, [Online], Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1874191/ [Accessed: 10 April 2017]

Parsons, T. (2005) "The learning of social role expectations and the mechanism of socialization of motivation" in The Social System, B. S. Tuner (eds), Routledge, London, p. 138

Population Reference Bureau. (2016) 2016 World Population Data Sheet With A Special Focus on Human Needs and Sustainable Resources, Population Reference Bureau [Online], Available: http://www.prb.org/pdf16/prb-wpds 2016-web-2016.pdf [Accessed: 2 April 2017]

Research Initiatives Bangladesh. (2017) Participatory Action Research (PAR) on Gender Issues in 5 Dhaka Slums, Dhaka.

Save the Children. (2013) Choices: Empowering boys and girls to transform gender norms: A curriculum for very young adolescents in Bolivia, Save the Children [Online], Available: http://www.savethechildren.org/atf/cf/% 7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/CHOICES%20ENGLISH.PDF [Accessed: 19 April 2017]

Sultana, A. (2010) "Patriarchy and Women's Subordination: A Theoretical Analysis", Arts Faculty Journal, Vol. 4, University of Dhaka (Online), Available http://www.banglajol.info/index.php/AFJ/article/view/12929 [Accessed: 20 April 2016]

দৈনিক প্রথম আলো (২০১৪) "দেশের নারী - বৈষম্যের করুণ চিত্র জাতিসংঘে", দৈনিক প্রথম আলো [বাংলাদেশ], ৩ সেপ্টেম্বর, পৃষ্ঠা ১

দৈনিক প্রথম আলো (২০১৫) "অর্থনীতিতে নারীর অবদান বাড়ছে", দৈনিক প্রথম আলো [বাংলাদেশ], ৮ মার্চ, পৃষ্ঠা ১

দৈনিক প্রথম আলো (২০১৫) "উচ্চশিক্ষা ও চাকরিতে নারী এখনো পিছিয়ে", দৈনিক প্রথম আলো [বাংলাদেশ], ৭ মার্চ, পৃষ্ঠা ১

দৈনিক প্রথম আলো (২০১৬) "বিবাহিত নারীদের ৮০ শতাংশ নির্যাতনের শিকার", দৈনিক প্রথম আলো [বাংলাদেশ], ৩ অক্টোবর, পৃষ্ঠা ১

দৈনিক প্রথম আলো (২০১৬) "কিশোর-কিশোরীর স্বাস্থ্যের জন্য বছরে মাথাপিছু ব্যয় ৮৬ পয়সা", দৈনিক প্রথম আলো [বাংলাদেশ], ১২ জুলাই, পৃষ্ঠা ২০

দৈনিক প্রথম আলো (২০১৬) "নারীর গড় মজুরি কমেছে", দৈনিক প্রথম আলো [বাংলাদেশ], ৩ মে, পৃষ্ঠা ১

দৈনিক প্রথম আলো (২০১৭) "যৌন নির্যাতনের পাশবিকতার ভয়াবহতা উদ্বেগজনক", দৈনিক প্রথম আলো [বাংলাদেশ], ১০ জানুয়ারি, পৃষ্ঠা ১৪

The Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada. (2017) Sexual Reproduction, The Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada [Online], Available: http://www.sexandu.ca/your-body/sexual-reproduction/#tc2 [Accessed: 28 September 2016]

United Nations Children's Fund (UNICEF). (2011) A perspective on gender equality in Bangladesh, from young girl to adolescent: what is lost in transition? Analysis based on selected results of the Multiple Indicator Cluster Survey 2009, UNICEF, Bangladesh

UNICEF. (2016) The State of The World's Children 2016: A Fair Chance for Every Child, UNICEF [Online], Available: https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_SOWC_2016.pdf [Accessed: 10 April 2017]

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women). (n.d.) Women and Poverty, The Beijing Platform For Action Turns 20, UN Women [Online], Available: http://beijing20.unwomen.org/en/in-focus/poverty [Accessed: 11 August 2016]

UN Women. (n.d.) Facts & Figures, UN Women [Online], Available: http:/www.unwomen.org/en/news/in-focus/commission-on-the-status-of-women-2012/facts-and-figures [Accessed: 28 September 2016]

UN Women. (2016), Facts and Figures: Ending Violence against Women, UN Women [Online], Available: http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures, [Accessed: 10 April 2017]

United Nations General Assembly. (1993) Declaration on the Elimination of Violence against Women, United Nations General Assembly [Online], Available: http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm [Accessed: 19 April 2017]

United Nations Population Fund (UNFPA).(2014) Programme of Action, International Conference on Population and Development, Cairo, 5–13 September 1994 [Online], Available: http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf [Accessed: 10 May 2017]

Vlassoff, M., Hossain, A., Maddow-Zimet, I., Singh S. & Bhuiyan, H. U. (2012) "Menstrual Regulation and Postabortion Care in Bangladesh: Factors Associated with Access to and Quality of Services", Guttmacher Institute [Online], Available: http://www.guttmacher.org/pubs/Bangladesh-MR.pdf [Accessed: 19 April 2017]

Wikipedia. (n.d.) Gender and Development, Wikipedia [Online], Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_and_development [Accessed: 2 November, 2016]

Wikipedia. (n.d.) Reproductive Rights, Wikipedia [Online], Available: https://en.wikipedia.org/wiki/ Reproductive_rights [Accessed: 20 April 2017]

World Bank. (2012) World Development Report 2012: Gender Equality and Development, World Bank [Online], Available: https://siteresources.worldbank.org/INTWDR2012/Resources/7778105-1299699968583/7786210-1315936222006/Complete-Report.pdf [Accessed: 9 August 2016]

World Health Organization (WHO), UNICEF, United Nations Population Fund (UNFPA), World Bank Group, and United Nations Population Division Maternal Mortality Estimation Inter-Agency Group. (n.d.) Maternal Mortality in 1990-2015, Bangladesh, WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group, and United Nations Population Division Maternal Mortality Estimation Inter-Agency Group [Online], Available: http://www.who.int/gho/maternal_health/countries/bgd.pdf [Accessed: 2 April 2017]

WHO. (2017) Reproductive health, WHO [Online], Available: http://www.who.int/topics/reproductive_health/en/ [Accessed: 10 April 2017]

World Vision International. (2008) Gender training toolkit, World Vision International, USA

Your Article Library (n.d.). Essay on man: as a Social Animal, Your Article Library [Online], Available: http://www.yourarticlelibrary.com/man/essay-on-man-as-a-social-animal-1623-words/6260/ [Accessed: 11 August 2016]

এই ম্যানুয়ালটি ইতালিয়ান ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেশন-এর সহায়তায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশনাটির বিষয়বস্তুগত সকল দায়ভার টেরে ডেস হোমস ইতালিয়ার, ইতালিয়ান ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেশন/পররাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ক সহযোগিতা মন্ত্রণালয়-এর কোনো দৃষ্টিভঙ্গি এখানে প্রতিফলিত হয়নি।